বাঙলার লোকবৃত্ত : আধুনিক ভাবনা

শঙ্কর সেনগুপ্ত

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-৯॥কলিকাতা-২৯

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৫৮

প্রকাশক
শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন্স প্রা. লি.
১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পরিবেশক
জিজ্ঞাসা এজেন্সীজ লি.
১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০২৯

মুদ্রক
শ্রী গোপালচন্দ্র দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৫/১এ কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুখবন্ধ

শ্রদ্ধেয় ড. অতুল সুরের অনুরোধে পুস্তিকাটি রচিত হয়েছিল বছর চারেক আগে। পাণ্ডুলিপি ছরকট হয়ে কোথায় নিমগ্ন জানি না। পাঁচটি পরিচ্ছেদ ছিল। নকল ছিল না। তিনটি পরিচ্ছেদের কিছু টুকরো লেখা ছিল। তার সাহায্যে এই পুস্তিকাটি পুনরায় লিখতে গিয়ে অনেক অদল-বদল করেছি। যতদূর স্মরণ হয়, তাতে চিন্তার কোন হেরফের হয়নি। হলেও পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাবার আগে বলতে পারবো না। কিন্তু সে পাণ্ডুলিপি কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

লোকবৃত্ত বা 'ফোকলোর' এখন অনেকের উৎসাহের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিষযটি এখন সমাজবিজ্ঞানের আওতায়। কিন্তু বিষয়কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এগিয়ে নেয়া যায় নি বাঙলায়। বরং যে উদ্দীপনা নিয়ে এ শতকের শুরুতে কাজ আরম্ভ হয়েছিল তা থিতিয়ে গেছে, অধ্যয়ন-অনুশীলনের মানও নেমে গেছে বলে অনেকের ধারণা। লোকবৃত্তের চর্চা যে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে হওয়া উচিত, তার খণ্ডচিত্র এখানে উপস্থাপিত করতে গিয়ে ক্ষেত্র-নিরীক্ষার ব্যাপারে আলোচনা করি নি। পূর্বপ্রকাশিত 'লোকবৃত্ত: ক্ষেত্র-নিরীক্ষার মূলসূত্র' গ্রন্থে সবিস্তারে তার আলোচনা করেছি। লোকবৃত্ত চর্চার আধুনিক ভাবনার যে ইঙ্গিত এখানে আছে তার বিস্তারিত আলোচনা আছে কিছু পূর্বে প্রকাশিত 'লোকবৃত্তের অন্তদিগন্ত' গ্রন্থে। সাহিত্য ও লোকবৃত্ত সম্পর্কিত আলোচনা করেছি 'লোকবৃত্ত ও সাহিত্য' গ্রন্থে। কোন আলোচনাই নিখুঁত সে দাবির স্পর্ধা নেই। গ্রন্থ রচনা অবধি আমার জ্ঞানের আলোকে যা বলেছি জ্ঞানের সীমা বর্ধিত হলে ও দরকার হলে তার সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হবো না। নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবো না। একথা কবুল করে রাখছি।

রীতি অনুযায়ী বর্তমান গ্রন্থের কাঠামো সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই স্পষ্ট করতে হয়, তিনটি পরিচ্ছেদে ও সীমাবদ্ধ পরিসরে লোকবৃত্ত চর্চার আধুনিক চিন্তার সবকিছু তুলে ধরা সম্ভব নয়। মোটামুটি একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছি। তা করতে গিয়ে নানা পণ্ডিত ও গবেষকদের উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়েছি। গ্রন্থের শেষে সাহায্যকারী গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার নাম উল্লেখ করেছি, পাতায় পাতায় 'ফুটনোট' দিইনি। তাতে

সাধারণ পাঠক বিব্রত হবেন না। বিশেষজ্ঞ পাঠকদের সবই জানা, তাঁদের কাছে হয়ত কোন নতুন কথা বলতে পারি নি, বরং তাঁদের জ্ঞাত বহু বিষয় হয়ত অনুচ্চারিত থেকে গেছে, তাই তাঁদেরও 'ফুটনোটের' অভাবে অসুবিধা হবে না। লোকবৃত্ত চর্চায় রত কোন ব্যক্তিকে বিষয় ও বিজ্ঞান সচেতন করতে গ্রন্থটি বিন্দুমাত্র সাহায্য করলে কৃতার্থ হওয়া যাবে। এর বেশী কোন দাবি নেই।

শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ডুর সহৃদয়তায় এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। গ্রন্থটিকে তিনি 'বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা'-র অন্তর্ভূক্ত করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। সামান্য কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেছে, যার অধিকাংশের দায়িত্ব আমার। 'জিজ্ঞাসা' প্রতিষ্ঠানের বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রী অরবিন্দ ভট্টাচার্যের এবং প্রেসের সহযোগিতার কথা স্মরণ করি। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাই। যাঁদের রচনার উদ্ধৃতি তুলেছি এবং যাঁদের রচনা পাঠে উপকৃত হয়েছি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। গ্রন্থের যাবতীয় ত্রুটির দায়িত্ব আমার, প্রশংসনীয় কিছু থাকলে তার একমাত্র দাবিদার প্রকাশক।

শঙ্কর সেনগুপ্ত

১.

লোক, লৌকিক, লোকবৃত্ত ও লোকবৃত্তশাস্ত্র

সংজ্ঞা ও অর্থ প্রসঙ্গে

অ্যাংলো-স্যাক্সন 'ফোক-লোর' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোকবৃত্ত' গ্রহণ করেছি। 'ফোক'-কে লোক, 'লোর'-কে লৌকিক, 'ফোকলোর'-কে লোকবৃত্ত এবং লোকবৃত্ত চর্চাকে লোকবৃত্তশাস্ত্র হিসাবে উল্লেখ করেছি। লোকবৃত্তের ধারক হচ্ছে লোকসমাজ।

লোকসমাজকে বৃত্ত করে যে জ্ঞান, যা ঐতিহ্যানুসারী সৃষ্টি এবং কালের প্রবাহকে অতিক্রম করে জীবিত, সাহিত্যে-শিল্পে-ধর্মেকর্মে ও জীবনাভ্যাসে প্রতিরূপিত তা লোকবৃত্ত। আহার-বিহার, বসতি, বিধি-নিষেধ, সংস্কার, শিল্পকলা, গার্হস্থ্যচিত্র, জীবন-ঘনিষ্ঠ গাথা নৃত্য-নাটক-গীতাদি, সচেতন বা অবচেতনভাবে রক্ষিত ধ্যান-ধারণা, অদ্বৈত প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমস্বত্বশ্রেণীর পরম্পরাগত ঐতিহ্য-বিশ্বাস ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান, সামাজিক রীতি-নীতি, বসন-ভূষণের আকার-আকৃতি-ব্যবহারপ্রণালী প্রভৃতির যেখানেই সমষ্টি সৃষ্টির স্পর্শ আছে, সমষ্টিজীবনকে উদ্বেলিত করার প্রেরণা আছে, কালকে অতিক্রম করে লোকজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার শক্তি আছে তাকেই লোকবৃত্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। লোকবৃত্তের যে অংশ সাহিত্যঘেঁষা তা লোকসাহিত্য। যে অংশ বস্তুঘেঁষা তা লোকসংস্কৃতি। আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে প্রাণরস আহরণ করে। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি আদিমসমাজ, উপজাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়সমূহের নিকট থেকে প্রাণবায়ু নেয়। সকলেই দেয়া-নেয়া করে এগোয়।

লোকবৃত্ত মানে লোকসাহিত্য, লোকসাহিত্য মানে 'অশিক্ষিত' সমাজের মৌখিক সাহিত্য, এরকমের একটা ধারণা যাঁদের মধ্যে আছে তাঁরা 'নিরক্ষর' এবং 'অশিক্ষিত' এই শব্দ দুটিকে সমার্থক মনে করে এই ভ্রমের শিকার হয়েছেন। আসলে যে নিরক্ষর সে-ই অশিক্ষিত এ ধারণা অযথার্থ। আরেকটি ভুল ধারণা লোকবৃত্ত শুধুমাত্র নিরক্ষর লোকের সৃষ্টি। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের বহু সৃষ্টিও লোকবৃত্ত হতে পারে। মনে রাখতে হবে লোকবৃত্ত গড়ে ওঠে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, টিকে যায় সমস্বত্বশ্রেণী বা দলের মধ্যে। এই শ্রেণী, দল বা গোষ্ঠী জাতি, ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল ও বৃত্তি অনুযায়ী, নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী গঠিত হয়, তথাকথিত সভ্য বা শিক্ষিত সংস্কৃতি থেকে দূরে অবস্থান করে। পরিবর্তনের দোলায় বিবর্তিত বা পরিবর্তিত হয়। কিন্তু পরম্পরাগত ঐতিহ্য ভোলে না। পিতৃপুরুষের জীবনচর্যাকে উপেক্ষা করে না।

লোকবৃত্ত এবং লোকজীবনের স্বভাবজাত প্রকৃতি বিশ্লেষণ লোকবৃত্তবিদদের অন্যতম কাজ। এই কাজ লোকবৃত্ত শাস্ত্রের অন্তর্গত।

লোকবৃত্তের সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে লোকবৃত্তবিদেরা যে-সব তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন তার একটি সারা বিশ্বের লোকসমাজ চিন্তা ও ভাবনার দিক থেকে এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে, চলায়-বলায়-কথায়-ভাষায়-ধর্মে, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণে শত পার্থক্য থাকলেও মানুষের মন একই ভাবে কাজ করে যেতে পারে। ব্যক্তি মনের চেয়ে বিশ্বজনীন মনই সারা পৃথিবীর মানুষকে এক মঞ্চে এনে দাঁড় করিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। মানুষের মনের ঐক্য দেখনে লোকবৃত্তের কি ভূমিকা তা "দেশবিদেশের লোকগল্প আলোচনা ও সংকলন" গ্রন্থে পর্যালোচনা করেছি। অবশ্য একথাও ঠিক যে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির জীবনচর্যার একটা স্বকীয় ও অর্থবহ ভিত্তি আছে। এই ভিত্তির কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ জীবনচর্যার প্রতি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রতি অংশের স্বকীয় অর্থ বিদ্যমান। লোকবৃত্তবিদেরা তা উন্মোচন করেন লোকবৃত্তের বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের দ্বারা।

সাধারণভাবে লোকবৃত্ত বলতে লৌকিক উপকরণ ও চর্চা উভয়কেই বোঝায়। উপকরণ ও চর্চাকে আলাদা পরিভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে মার্কিন পণ্ডিত আলান ডাণ্ডিস লৌকিক উপকরণকে 'ফোকলোর' বা লোকবৃত্ত এবং চর্চা বা অধ্যয়ন-অনুশীলনকে 'ফোকলোরিস্টিক্স্' বা লোকবৃত্তশাস্ত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন ১৯৬৫ সনে তাঁর "স্টাডি অব ফোকলোর" গ্রন্থে। লিঙ্গুয়িস্টিক্স্-এর অনুসরণে 'ফোকলোরিস্টিক্স্' শব্দটি আগেও ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু আমাদের অনুমোদন পায় নি। আমরা অ্যানথ্রোপোলজি, স্যোসিওলজি, আরকিওলজি, সাইকোলজি প্রভৃতি সমগোত্রীয় বিজ্ঞান শাখা সমূহের নামের অনুসরণে ১৯৪৪ সনে "ফোকলোর রিসার্চ ইন ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে 'ফোকলোরোলজি' শব্দটি প্রস্তাব করি। আমাদের প্রস্তাবিত 'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে যেমন লোকবৃত্ত, তেমনি 'ফোকলোরোলজি' শব্দটিও বহু বিদ্বানের বিবেচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অধ্যাপক সত্যপ্রকাশ আর্য ১৯৪৪ সনের একটি আলোচনায় এবং ১৯৪৪ সনের আগস্ট সংখ্যা 'ফোকলোর' সাময়িকে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন "In fact, the term 'folkloristics' apparently s an impression about the genesis of various genres of folklore .

and may broadly and more appropriately fall in close association with 'linguistics', 'etymology', 'philology' etc. It may have a more literary approach. Again the term 'folklorology' evidently speaks of scientific treatment to the whole of the items covered within 'folklore' including all types and varieties, oral folklore and action folklore, folk-arts and crafts etc. The collection and analysis of all these components of folklore by scientific techniques may assign it the status of 'folklorology'. সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. আর্য 'ফোক স্যোসিওলজি' অথবা 'স্যোসিওলজি অব ফোকলোর' শব্দ দুটিকে বিবেচনা করার কথাও বলেছেন। তিনি বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী ডবলু. এইচ গুডএনাফের "ফোকলাইফ স্টাডি অ্যাণ্ড স্যোসাল চেঞ্জ" (১৯৪৪) অনুসরণ করেই বোধ হয় প্রস্তাব রেখেছেন। গুডএনাফ আবেগপ্রধান 'লোক' শব্দটি বাদ দিয়ে 'ফোক-লাইফ' বা লোকজীবনকে 'স্যোসাল কম্যুনিটি' অথবা 'স্যোসাল গ্রুপ' হিসাবে লক্ষ্য করতে চেয়েছেন। লোকবৃত্তবিদেরা 'ফোক' বা লোক শব্দ বাদ দিতে আগ্রহী নন, বর্তমান আলোচনায় লোক, লৌকিক, লোকবৃত্ত, লোকজীবন এবং লোকবৃত্তশাস্ত্র এই শব্দ কয়টি বিশেষ বিশেষ অর্থবহ। পরবর্তী আলোচনায় এদের অর্থ পরিষ্কার করা যাবে।

লোকবৃত্তশাস্ত্র

লোকবৃত্ত মানুষের আজীবন সঙ্গী হলেও শাস্ত্র হিসাবে অথবা অধ্যয়ন ও চর্চার বিষয় হিসাবে দেখা দেয় ১৮৪০ সনে। অর্থাৎ লোকবৃত্তের আত্মপ্রকাশ গত শতকের মধ্যপাদে। বিষয়কে শৃঙ্খলাযুক্ত, পদ্ধতি-প্রকরণ ও তত্ত্ব-সম্পুটক করতে বিদ্বানেরা সংজ্ঞা রচনা করেছেন, নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। মূল যে চারটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন তা (১) 'অ্যাকসন' বা ভঙ্গিপ্রধান, (২) 'সায়ান্স' বা বিজ্ঞান বিষয়ক, (৩) 'লিঙ্গুয়িস্টিক্স্' বা বাক্ বিষয়ক এবং (৪) 'লিটারেচার' বা সাহিত্য বিষয়ক উপাদান। প্রথম বিভাগে অনুকরণ, অঙ্গভঙ্গি, নাচগান, নাটক, আকার-ইঙ্গিত, বিরক্তি বা হাস্যপরিহাসের উদ্দেশ্যে কৃত তামাসা, খেলাধুলা, চারু-দারু-কারুশিল্পের কাজ, কাঁথা, আলপনা, পটচিত্র, হিরালী-শিরালী, ঝাড়ফুক, মূকাভিনয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ভঙ্গিমা

প্রভৃতি ; দ্বিতীয় বিভাগে লোকসংস্কার, বিশ্বাস, লোকপুরাণ, আচার-আচরণ-ব্যবহার, প্রবাদ-প্রবচন-হেঁয়ালী-ধাঁধা, কিম্বদন্তী, যাদু, মন্ত্রতন্ত্র, জ্যোতিষ, ভবিষ্যদ্বাণী, আরোগ্য বিধান ও প্রতিকার এবং লোকজীবন চর্চাকে ধরা হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে বাক্‌রীতি ও বিন্যাস, আঞ্চলিক উপভাষা বি-ভাষা ও শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা, স্বরানুযায়ী ভাষা বিশ্লেষণ, হারানো-খোযানো শব্দের অর্থোদ্ধার, তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা সিদ্ধান্তে আসা, লৌকিক ছন্দ, মাত্রা, বাক্‌রীতির পরিচয়, ধ্বনিভঙ্গি ও বাক্য ব্যবহারের রূপ, রীতি ও স্টাইল প্রভৃতি এবং চতুর্থ বিভাগে লোকসাহিত্যের যাবতীয় উপকরণ—লোকগল্প, ব্রতকথা, রূপকথা, উপকথা, গান, গীতিকা, কিম্বদন্তী, লোকছড়া, অতিকথা, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, মেলা ও অনুষ্ঠান বিবরণী, প্রাচীন ও পরম্পরাগত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিভিন্ন রচনা বিবেচনা করা হয়। বিদ্বানেরা আরও নানাভাবে শ্রেণীচিহ্নিত করেছেন লোকবৃত্তকে। লোকধর্মকে দর্শন বা 'ফিলজফি' এবং ধর্মীয় বিজ্ঞান বা 'রিলিজিয়াস সায়ান্স-এর সঙ্গে মেলানো হচ্ছে। লোকপুবাণকে মিথোলজির সঙ্গে, অতীন্দ্রিযবাদ, কান্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, জাতিবিদ্যা প্রভৃতির সঙ্গে, লোকসাহিত্যকে সমাজবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃ-উদ্ভিদ-দৃশ্যবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা, উপধারা ও পদ্ধতির দর্পণে দেখা হচ্ছে। লৌকিক শিল্প-কলা-উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ, বস্তু-উপকরণকে আধুনিক বাস্তব্য বিজ্ঞানেব আধারে বিবেচনা করা হচ্ছে। কোন অংশ বা কোন উপকরণই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয। অর্থাৎ কোন একটি অংশ, বস্তু বা উপকরণকে একা বোঝা যায না। প্রত্যেককেই প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠতে হয। যেমন গান, গীতিকা, ছড়া, ধর্মাচার, মেলা বিবরণী প্রভৃতি ভাষা বা সাহিত্যের সাহায্য ব্যতীত অগ্রসর হতে পারে না, তেমনি সাহিত্য বিষযক লোকবৃত্ত ভাষা ও বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। সকলকেই সকলের উপর নির্ভর করতে হয়, বহুমুখী এর চেতনা। বহুদিকে এর বিকাশ।

লোকবৃত্তের বহুমুখী চেতনার জন্যই কোন একটি বিশেষ মত, শৃঙ্খলা অথবা পদ্ধতি প্রকরণের দ্বারাও বিষযকে শাসন করা যাচ্ছে না। লোকবৃত্ত এখন সাহিত্য, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, নৃত্য-নাটক-সঙ্গীতকলা, প্রচার এবং জনযোগাযোগ প্রভৃতি নানা শৃঙ্খলায় শিক্ষিতদের, আঞ্চলিক ও জাতীয চেতনাপুষ্ট স্থানীয় কর্মী ও গবেষকদের অনুশীলনের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

যে যাঁর উৎসাহ ও সুযোগসুবিধা মত অথবা খেয়ালখুশিমত লোকবৃত্তের অধ্যয়ন করে চলেছেন। শিক্ষিত গবেষকেরা নিজ নিজ শৃঙ্খলার ব্যাপারে যত আগ্রহী তত আগ্রহী নন লোকবৃত্তের ব্যাপারে। অনেকের কাছেই লোকবৃত্ত আংশিক সময়ের চর্চার বা খেযালী চর্চার বিষয। অনেকের কাছেই লোকবৃত্ত দ্বিতীয বা তৃতীয বিষয়, প্রথম স্ব-স্ব শৃঙ্খলা। অর্থাৎ সাহিত্য বা নৃবিজ্ঞানের ছাত্র ও গবেষকদের প্রথম অধ্যয়ন ও অনুশীলনের বিষয় সাহিত্য বা নৃবিজ্ঞান, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিষয লোকবৃত্ত। তাও যাঁরা লোকবৃত্ত ব্যাপারে উৎসাহ দেখান তাঁদের মধ্যে। যাঁরা উৎসাহ দেখান না তাঁরা বিষয়টাকে এড়িয়ে চলেন।

সকলেরই এখানে কাজ করার অধিকার আছে, কথা বলার হক আছে, লোকবৃত্ত খোলামাঠ। যাঁর যেমন যেভাবে খুশি গোল দিচ্ছেন, 'বিশেষজ্ঞের' তকমা লাগাচ্ছেন। অতিব্যাপ্ত নামের আড়ালে ইতিহাস, অশিষ্ট গবেষণা প্রকাশ করে কালিদাস হচ্ছেন, ডাক্তার বনছেন, কিন্তু মর্যাদা পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন না সেই সমস্ত যার জন্য গলদঘর্ম। বিষযও আধুনিক মানে সমুন্নত হতে পারছে না। পারবেও না ততদিন যতদিন পর্যন্ত না লোকবৃত্ত স্বাধীনশাস্ত্র হিসাবে গৃহীত হচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত প্রকৃত দরদী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেব আগমন হচ্ছে এবং যতদিন পর্যন্ত তথাকথিত বিশেষজ্ঞ ঠিকাদারদের উৎপাতের হাত থেকে বিষয়কে উদ্ধার করা যাচ্ছে।

এই অবস্থাযও লোকবৃত্ত শাস্ত্রের মর্যাদা পাবার দিকে পা বাড়িযেছে। বাড়িয়েছে বহু আত্মত্যাগী কর্মী ও গবেষকের নিরলস কর্ম, শ্রম ও সাধনার দ্বারা, আন্তর্জাতিক জগতে লোকবৃত্তের মূল্য স্বীকৃতির দ্বারা, আধুনিক জীবনে লোকবৃত্তের প্রভাব বিশ্লেষণের, প্রচার মাধ্যম হিসাবে লোকবৃত্ত ব্যবহারের কার্যকারিতা উপলব্ধির দ্বারা। শিক্ষা-জগতের সঙ্গে যুক্ত 'লোকবৃত্ত বিশেষজ্ঞদের' অনেকেই অহেতুক আত্মম্ভরী। অনেকেই অসম্ভবরকম স্বার্থচিন্তার দ্বারা আবৃত থাকায বিষযকে যথাযোগ্য মানে নিযে যাবার জ্ঞান ও বোধের দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করতে পারেন নি। তাঁদের চলনবলন, ঢং ইত্যাদি তাঁদের কাজের মতই বুদ্ধিজীবী চেতনায় সস্তা ও মতলবী। অনেকেরই বিষয়কে ভালবাসতে না-পারার দরুন বোধ ও বুদ্ধি দানা বাঁধে নি, তাঁদের সরল সহজ সস্তা কাজ ও আচরণের জন্যই বিষয়ও সস্তা হিসাবে গৃহীত হচ্ছে বৃহত্তর বুদ্ধিজীবীদের কাছে। তবুও যে বিষয়টা এগিয়ে যেতে পারছে তারজন্য উপরে উল্লিখিত কারণের সঙ্গে যা যোগ করতে হবে তা হচ্ছে বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিতশ্রেণীর বৃহৎঅংশের কাছে

লোকবৃত্ত যে চরিত্র নিয়েই উপস্থিত হোক না কেন, লোকসমাজ ও সাধারণ মানুষ লোকবৃত্তকে বিশেষ মর্যাদা দেয়। লোকবৃত্তকে ভালবাসে, লোকবৃত্ত তাদের শাসন করে। লোকবৃত্ত তাদের মনের খোরাক জোগায়।

লোকবৃত্ত কোন একজন লোকের বিজ্ঞান নয়, এটা হচ্ছে পরম্পরাগত ঐতিহ্যের বিজ্ঞান ও কাব্য। ঘুমপাড়ানি ছড়া, জ্ঞানোৎপাদক ধাঁধা-প্রবাদ, নার্শারি ও প্রাইমারি বিদ্যালয়ের সুরেলা ধ্বনি, নানা ধরনের লোকগল্প, গান, গাথা, বারোমাসি, কিম্বদন্তী, ব্রতকথা, অতিকথা, কৃষি-জলবায়ু-আবহাওয়া সম্পর্কিত জ্ঞান, বৃক্ষলতাপাতা-পশুপক্ষী সম্পর্কিত জ্ঞান, তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র, আরোগ্য বিষয়ক চিন্তা লোকসমাজকে শাসন করে। ব্রত, পূজা-অনুষ্ঠান ও দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রেরণা জোগায়। লোকশিল্পকলা, সাজগোজ, বসনভূষণ, ঘরবাড়ি, আসবাব, যন্ত্রপাতি জীবনকে চালনা করে। এই লোকবৃত্ত 'টাইম' ও 'স্পেসের' সঙ্গে বিবর্তিত হয়। লোকসমাজকে জানতে হলে তাই লোকবৃত্তকে জানতে হয়ই। তার জন্যই লোকবৃত্তশাস্ত্র।

অধ্যয়ন-অনুশীলনের ক্ষেত্র

অধ্যয়ন-অনুশীলনের ক্ষেত্রে লোকবৃত্ত আন্তর্বিদ্যা বিষয়ক বিষয়। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক পটভূমিতে যেমন এর পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দরকার হয়, তেমন দরকার হয়, নৃবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, কান্তিবিদ্যা, চারু-দারু-কারু শিল্পকলা, নাচ-গান-সঙ্গীত-নাটক ও নানা শিল্পকলার পটভূমিতে এর ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। প্রচার ও জনযোগাযোগের ব্যাপারে এর ভূমিকা জানারও দরকার হয়। বিভিন্ন বিষয়ের ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত জ্ঞানের আলোকে বিষয়কে তুলে ধরতে হয় লোকজীবন ও তার আদি সংস্কৃতি জানতে ও বুঝতে, সাংস্কৃতিক তথ্য অবগত হতে। জীবনধারণের প্রাণশক্তি জানতে।

সাহিত্যের ছাত্রেরা ছাড়া নৃবিজ্ঞান ও আঞ্চলিক ইতিহাসের ছাত্রেরা লোকবৃত্ত ব্যাপারে অধিক উৎসাহী। নৃবিজ্ঞানীরা লোকবৃত্তের অধ্যয়নে লোকসংস্কৃতি ও সমাজ সংগঠনকে লক্ষ্য করেন। তাঁরা বলেন মৌখিক সাহিত্য যোগাযোগ রক্ষা করার একটি ফর্ম বা আকৃতি যা বাক্‌রীতির নিজস্ব কৌশলপুষ্ট এবং বিশিষ্ট স্টাইল ও শিল্পরীতি মান্য করে এগোয়। যদিও শব্দের শৈল্পিক ব্যবহার ও সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক ব্যবহারকে

তফাৎ বা নির্দিষ্ট করা সহজ নয়। তার জন্য বিশেষ শিক্ষার দরকার হয়। সাধারণত একেকটি সংস্কৃতিগোষ্ঠীর ভাষা বা বাক্‌রীতির অনুশীলনের দ্বারা লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের চরিত্র অবগত হওয়া যায়। এর দ্বারা সংস্কৃতির ধাপ বা 'স্ট্রাকচারকে'ও জানা যায়। যে লোকসাহিত্য যত বেশি—'highly organised' তত 'expressive end of a continuum between a stylistic and referential dimension.' ড হিমস মনে করেন এই মাত্রা ব্যবহার করলে লোকসাহিত্য চেনা সহজ হয়। নানা বিদ্বান নানাভাবে লোকসাহিত্য চেনার কথা বলেছেন। তবে লোকসাহিত্য চেনার জন্য যাঁরা একে 'as a set of speech genres constituting part of the linguistic resources of a speech-community' হিসাবে দেখেছেন তাঁরা নৃবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানী। এইভাবে লোকসাহিত্য চিহ্নিতকরণের সুবিধা "it sharply delineates the place of oral literary research within a broader theoritical domain of understanding the relationship between language and social life."

ভাষা হচ্ছে মনোভাব প্রকাশের বাক্-বাহন। এই ভাষার মধ্যে ভাষাতত্ত্বের নিরিখে প্রধান-অপ্রধান ভেদ স্বীকৃত নয়। তবু সামাজিক ক্ষেত্রে ভাষা এবং উপভাষা ও বি-ভাষার ভেদ স্বীকৃতি পেয়েছে। বিধিগতভাবে এদের চরিত্রের তারতম্যও নির্ধারিত হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন ভাষা "মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোনও বিশেষ সমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত অর্থাৎ বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টি।" প্রত্যেক ভাষার মধ্যেই আছে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত উপভাষা ও বি-ভাষা। এরা কতগুলো নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ। সেই নিয়মগুলো অভ্যাস করে স্বাভাবিকভাবে একেকটি জাতি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী পরস্পরকে চেনে, জানে ও বোঝে। কিন্তু কোনো উপভাষা বা বি-ভাষার সরকারি স্বীকৃতি নেই। আঞ্চলিক ও লৌকিক স্বীকৃতি আছে। এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান এ কথাটা বুঝতে হবে।

সাংস্কৃতিক স্তরভেদের ন্যায় ভাষারও স্তরভেদ আছে। সাহিত্যের ভাষা, ভদ্র ও শিক্ষিত জনের কথ্য ভাষা, লোক সমাজের আঞ্চলিক ভাষা, একেক স্তরীয়। সাহিত্যের ভাষা লেখ্যভাষা, তার মধ্যেও আবার সাধুভাষা, চলতি ভাষার প্রভেদ আছে। লেখ্যভাষা কথ্যভাষা রূপে গৃহীত হয় না। কথ্যভাষার ব্যবহারেও শিক্ষিত

নাগরিক বুদ্ধিজীবীদের ভাষার সঙ্গে, তাঁদের বাক্‌রীতির সঙ্গে গ্রামের নিরক্ষর জনদের, চাষাভূষাদের ভাষার বা বাক্‌রীতির তারতম্য আছে। স্বরধ্বনির ব্যবধান আছে। শিক্ষিত নাগরিক শ্রেণীর বিপরীত লোকশ্রেণীর কথ্য বা মৌখিক ভাষা হচ্ছে লোকভাষা, তা লোক সমাজের ভাবপ্রকাশের বাহন। এ ভাষায় কোন কৃত্রিমতা নেই। স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ। মুখে মুখে এ ভাষার প্রসার ঘটে। বাচক খেয়ালখুশিমত শব্দ প্রয়োগ করেন। শ্লীল-অশ্লীল নিয়ে মাথা ঘামান না। পরিবর্তন ও বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ও সংস্কৃতির যেমন বিবর্তন ঘটে, ভাষারও তেমনি বিবর্তন ঘটে। নতুন নতুন শব্দ ও প্রতীক সংযোজিত হয়। কিন্তু বাচনভঙ্গি বা স্টাইল প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। তাই লোকভাষা নিজস্ব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে থাকে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শহীদুল্লাহ, সুকুমার সেন, আবদুল হাই, মুহম্মদ এনামুল হক, প্রবোধচন্দ্র সেন, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, পুণ্যশ্লোক রায়, নীলরতন সেন প্রভৃতি ভাষা, উপভাষা বি-ভাষা, কথ্যভাষা, লেখ্যভাষা, ছন্দ ইত্যাদির আলোচনায় লোকভাষার বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র সম্পর্কে আমাদিগকে অবহিত করিয়েছেন। এ ভাষায় শিষ্ট সাহিত্য রচিত হয় না, কিন্তু এ ভাষা শিষ্ট সাহিত্যকে অন্ন জোগায় বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও কবিরা কথোপকথন, সংলাপ এবং লোকজীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে লোকভাষার প্রয়োগ করেন। এই ভাষা তাঁদের কাছে আসে বিভিন্ন লোকসাহিত্যের সংকলন গ্রন্থ থেকে, নিজ নিজ দেখা জগৎ ও জীবন থেকে, অথবা ক্ষেত্র-নিরীক্ষা থেকে। মধুসূদন, দীনবন্ধু থেকে মীর মোশাররফ হোসেন, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, প্রভৃতি মুন্সীয়ানার সঙ্গে লোকভাষা ব্যবহার করেছেন। জীবনানন্দ, জসীমউদ্দীন, বিষ্ণু দে প্রভৃতি বাঙলা লোকশব্দ ব্যবহারেরও লৌকিক মেজাজ সৃষ্টির অতুলনীয় উদাহরণ তুলে ধরেছেন। সদ্য প্রকাশিত "লোকবৃত্ত ও সাহিত্য" গ্রন্থে পাস্টারনাক, ব্রেশট ও অডেন কিভাবে লোকবৃত্তের ব্যবহার করেছেন তা দেখিয়েছি।

লোকভাষার সঙ্গে আন্তরিক, ঘনিষ্ঠ ও সরাসরি যোগ না থাকলে লোকসাহিত্যের ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। লোকজীবনকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বাক্‌রীতি, বাচনভঙ্গি বা স্টাইল অনুসরণ করা যায় না। তাই ভাষাবিজ্ঞানীর মেজাজ নিয়ে নৃবিজ্ঞানী ও লোকবিজ্ঞানীরা লোকভাষার চর্চায় আগ্রহ দেখান। এর চর্চার দ্বারা বিভিন্ন ভাষার ঐতিহাসিক সম্পর্ক, লোকভাষার বিবর্তন ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়,

"the borrowing of linguistic traits and diffusional oral patterns" এবং "communicative conditions that are necessary for speakers of genetically unrelated or distantly related lauguages of pickup features of language or ways of speaking from one another"-কে জানা যায়। বাক্‌রীতির চর্চায় জানা যায় "patterns and functions that organise the use of language in the conduct of social life...the understanding that speaking, like other systems of cultural behavior—kinship, politics, economics, religion, or any other—is patterned within each society in culture-specific, cross-culturally variable ways". বাক্‌রীতির ঢং, সমাজ-সাংস্কৃতিক মূল্য, ভঙ্গিমা, কথাবলার তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য, শব্দচয়ন ও বাক্য গঠনের কায়দা বিশ্লেষণের দ্বারা লোকবৃত্তবিদেরা "are particularly well-equipped to clarify those problem situations which stem from convert conflicts between different ways of speaking. Conflicts which may be obscured to others by a failure to see beyond the referential functions of speech and abstract grammatical patterns." লোকবৃত্তের আলোচনায় লোকভাষার পর্যালোচনা তাই একটি জরুরি কাজ। লোকভাষার আলোচনায় সংগ্রহ অকৃত্রিম ও সুষ্ঠু না হলে চলে না। কানে শুনে হাতে লিখে নিতে গেলে প্রায়শই ভুলের শিকার হতে হয়। বিশেষত সংগ্রাহক যদি অন্য অঞ্চলের লোক হন, স্থানীয় উচ্চারণ, ঢং, রীতিনীতি ব্যাপারে অনভিজ্ঞ থাকেন, তবে তিনি একরকম শুনবেন, নিজস্ব বোধ ও বিবেচনা অনুযায়ী অন্যরকমভাবে টুকবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি! সংবাদদাতাও সবসময় সঠিক বিবরণ সঠিক উচ্চারণ ও বাক্‌ভঙ্গি বাৎলাতে পারেন না। এইভাবে গলদধর্ম ক্ষেত্র-সংগ্রহের কোন মূল্য থাকে না। ভুল সংগ্রহের ভুল ব্যাখ্যায় লোকবৃত্ত মর্যাদা পায় না। মনে রাখতে হবে লোকবৃত্তের সংগ্রহের দ্বারা যদি সেখানকার সংগ্রহ সেখানকার লোকদের মাতানো না যায় তবে বুঝতে হবে সে সংগ্রহের কোথাও ফাঁক থেকে গেছে। সে সংগ্রহ মৌল বা যথার্থ নয়।

লোকবৃত্ত চর্চার প্রসারিত দিক

লোকবৃত্ত যেদিন থেকে অধ্যয়ন-অনুশীলনের বিষযে পরিণত হয সেদিন থেকেই বিভিন্ন পণ্ডিত, গবেষক ও বিদ্বান বিষয়কে নিযে তাত্ত্বিক আলোচনায়, মত ও পথ বিষয়ক আলোচনায ব্যাপৃত হন। পদ্ধতি-প্রকরণগত আলোচনা, রীতি-শৃঙ্খলাগত আলোচনা, সংজ্ঞারচনা, ভিত্তি প্রভৃতি নিযেও আলোচনা চলে। গ্রীমভাইদের আমল থেকে যে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি লোকবৃত্তবিদদের আকৃষ্ট করতে থাকে ক্রমে তা ফিনল্যাণ্ডের কার্লে ক্রোন, অস্ট্রিযার আলবার্ট উইসিলস্কী, সুইডেনের কার্ল ভন সিডো, নরওযের এল বোদকার,আমেরিকার ওযারেন রবার্টস্, থেলমা জেমস্ প্রভৃতির চেষ্টায একটি বিশিষ্ট আধুনিক পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হয। এই পদ্ধতির স্বপক্ষের ও বিপক্ষের দুটো যুক্তিই শক্তিশালী। মারকিন পণ্ডিত অধ্যাপক ডরসন এই পদ্ধতিকে সমালোচনা করে বলেছেন "it ignores some of the questions that most interest scholars. Consideration of style and artistry, of the mysterious processes of creation and alterations, of the influences of national cultures, the social context, the individual genius, are out of order among percentage tables and plot summeries." দোষগুণ সত্ত্বেও এই পদ্ধতি এখনও বহু বিদ্বানের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয। বর্তমান পুস্তিকার আলোচনায সে কথা জানা যাবে।

ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির ন্যায ইতিহাস পুনর্নির্মাণ পদ্ধতিও বহু বিদ্বানের বিবেচনার বিষয। লোকবৃত্তের সহাযতায় ইতিহাসের খেইহারানো সূত্র খুঁজে পাবার চেষ্টাই ইতিহাস পুনর্নির্মাণ পদ্ধতি হিসাবে খ্যাত। গ্রীমভায়েরা বিশেষ করে জ্যাকব গ্রীমকে এই পদ্ধতির স্রষ্টা বলা যেতে পারে। ব্রিটেনের লোকবৃত্তবিদেরা জ্যাকব গ্রীমের দ্বারা ভীষণভাবে অনুপ্রেরিত। ১৮৫৯ সনে ডারউইনের "দি অরিজিন অব স্পিসেস" প্রকাশের পর এই পদ্ধতি "added a preamble of prehistory to its chronology and looked back to a primitive savage rather than to a civilized pagan". জর্জ লরেন্স গুমে এই পদ্ধতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। জাপানের কুনীও ইযানাগীতা, কেই-গো-সিকী, ব্রিটেনের অ্যানড্রু ল্যাঙ, লর্ড র‍্যাগলান, মার্কিন পণ্ডিত লর্ড লোয়াই, হেক্টর ও নোরা চাদউইক প্রভৃতি এই পদ্ধতির সেবক। বিদেশি বাতাস এদেশে এসে পৌঁছলে বিনয়কুমার সরকার,

দীনেশচন্দ্র সেন, নীহাররঞ্জন রায় প্রভৃতিও এই পদ্ধতি অনুসরণে গ্রন্থাদি রচনা করেন। আমেরিকার আধুনিক পণ্ডিত উইলিয়ম লাইনউড, মনটেল, গ্লাডিস মেরী ফ্রাই প্রভৃতি নতুন করে এই পদ্ধতিতে লোকবৃত্ত চর্চা করে চলেছেন।

লোকবৃত্তের ভাববাদী বিশ্লেষণ আরম্ভ হয় জার্মান পণ্ডিত ও কবি জোহান গটফ্রাইড ভন হার্ডারের আমলে। হার্ডার লোকবৃত্তের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সত্তাকে তুলে ধরলেন। ইউরোপের বহু বিদ্বান হার্ডারকে অনুসরণ করে জাতীয়তা মণ্ডিতচেতনা খোঁজার কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রাখলেন। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যেমন লোকগল্প, ছড়া, সঙ্গীত, গীতিকা, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদির মধ্যে তারা লোকআত্মা খোঁজ করতে থাকেন। জাতীয় বীরদের উদ্ধার করতে থাকেন, জাতীয়চেতনাকে মহিমান্বিত করতে থাকেন। জার্মানীর গ্রীমভায়েরা, নরওয়ের অ্যাসব.জোরনসেন ও মো, ফিনল্যাণ্ডের লোনরট ও ক্রোনস, আয়ার্ল্যাণ্ডের ডগলাস হাইড, বাঙলার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুসদয় দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতিও লোকবৃত্তের এই রসে ডুব দিলেন। নাৎসী-জার্মানী ও জারের রাশিয়ায় এই চর্চা সমধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেখানে অক্টোবর বিপ্লব ও হিটলারের পতনের পর লোকবৃত্ত চর্চার মোড় ঘুরে যায়। ভ্লাডিমির প্রপ, সোকোলভ প্রভৃতি পুরাতন ধারায় যেসব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা অস্বীকৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রপ তাঁর মরফোলজিকে অস্বীকার করলেন। সোকোলভ ১৯৫০ সনে নতুন করে "রাশিয়ান ফোকলোর" রচনা করলেন ১৯৩৪ সনে ম্যাক্সিম গোর্কীর দেয়া লাইনে। গবেষক লিখেছেন "Under the Soviet regime a new genre of popular tradition has come to the fore, the 'national revolutionary song.' Older forms are adopted to revolutionary heroes." সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রচারে সোকোলভ ও অন্যান্য বিদ্বানেরা সরব হলেন। জার্মান বিদ্বান হানস নৌম্যানের তত্ত্ব লোকবৃত্ত সভ্য ও শিক্ষিত সমাজ থেকে লোকসমাজে যায়, জারের রাশিয়ায় জনপ্রিয় ছিল। অক্টোবর বিপ্লবের পরে 'এ ভ্রান্ত মতবাদ'-কে বর্জন করা হলো। বলা হলো ব্যাপারটা হবে উল্টো। লোকবৃত্ত হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামী চেতনার সৃষ্টিশীল প্রয়াস। শিষ্ট সমাজ থেকে তা নীচে যায় না, বরং শিষ্ট সমাজ সাধারণ মানুষের সংগ্রামী চেতনা স্তব্ধ করার কায়দা হিসাবে লোকবৃত্ত নিজেদের মধ্যে নিয়ে দরিদ্র-নিপীড়িত শ্রেণীকে শাসন ও শোষণ করে চলে। পার্টি লাইনে চলতে গিয়ে প্রপের আঙ্গিকবাদ

এবং অ্যাণ্ড্রিয়েভের ফিনীশীয় পদ্ধতির পুস্তক বুর্জোয়া চেতনা সমন্বিত পুস্তক হিসাবে অস্বীকৃত হয়। জিরমুনস্কী ও সোকোলভ হানস্ নৌম্যানের বুর্জোয়া সমাজবৈজ্ঞানিক চিন্তাকে সমালোচনা করে নতুন গ্রন্থ রচনা করলেন। তাতে বলা হলো লোকবৃত্ত অতীত এবং ঐতিহ্যমুখী ঠিকই, কিন্তু তাতে বর্তমানও প্রতিধ্বনিত। লোকবৃত্ত হচ্ছে লোকসমাজের সংগ্রামের হাতিয়ার। এবং সেভাবেই একে দেখতে হবে।

লেনিন এবং ট্রটস্কীর মধ্যে মার্কসবাদের প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে যে আদর্শগত বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়েছিল, অর্থাৎ দুটি পরস্পরবিরোধী ধারা আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা সোভিয়েৎ লোকবৃত্তবিদদেরও স্পর্শ করে। সামাজিক বিপ্লব করতে এসে শহর ও গ্রামের বৈপরীত্য অবসান ঘটাবার জন্য যাঁরা পার্টি লাইনে লোকবৃত্ত অনুশীলনে এগিয়ে এলেন তাঁরা সরকারি দাক্ষিণ্যও লাভ করলেন। চেতনা আগে না বস্তু আগে, অথবা হাঁস আগে না ডিম আগে, তা নিয়ে যে তাত্ত্বিক আলোচনা আরম্ভ হয় তা থেকেই লোকবৃত্ত শিক্ষিত ও সভ্যসমাজ থেকে নীচে যায়, না নিরক্ষর বর্বর সমাজ থেকে উপরে আসে, তা নিয়েও আলোচনা চলতে থাকে। লেনিন ধারার বিদ্বানীদের প্রলেতারীয়-মানস বা শ্রেণীচেতনা জানার ব্যাপারে লোকবৃত্ত চর্চাকে কাজে লাগাতে বলা হয়। লোকবৃত্তকে সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্পের মর্যাদায় বসানো হয়। প্রলেতারীয়-মানস ও আদর্শ খোঁজার জন্য নতুন সামাজিক আইন কার্যকরী করা হয়। দাসত্ব বন্ধন থেকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ও নিজেদের মুক্ত করতে যে নীতি গ্রহণ করা হয় তাতে লোকজ্ঞানকে ব্যবহার করা হতে থাকে। লোকজ্ঞান জানিয়ে দিল অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত সমাজে সমাজের বিবিধশক্তি যেমন এক ভাবে কাজ করে না তেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত সমাজেও একভাবে কাজ করে না। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতিই সামাজিক উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি নয়। এঙ্গেলস বললেন সমাজের বিবিধ শক্তিগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন একটি সামাজিক আইন বা 'স্যোসাল অ্যাক্ট'। এই 'স্যোসাল অ্যাক্টে'র প্রেরণা লোকজ্ঞান। লৌকজ্ঞান ভিত্তিক সামাজিক আইনকে ভিত্তি করেই রচিত হয় শ্রেণীহীন সমাজ।

লেনিন বললেন লোকবৃত্তকে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে হবে। তার ভিতর যে অতীতদিনের প্রলেতারীয়-মানসের আশা-আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত থাকে তাকেও জানতে হবে। শেষ অবধি সোভিয়েতে **"Folklore is recognised as a fighting ground, not only over conflicting**

reactionary and socialistic interpretations, but also between classes pre-empting the traditions of the woikers. The kulaks, or the petty bourgeoisie, or criminal elements, had in the past appropriated the people's folklore, a process explaining the appearance of similar traditions among different social classes." বলা হলো রাশিয়ার লোকবৃত্ত শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রকেই সেবা করবে না, সেবা করবে জাতীয়তাবুদ্ধির সাধনাকেও। বিবিধশ্রেণীব মানুষের মধ্যে আদর্শপুষ্ট শ্রমিক গাথা, কথা, গান, বীর কাহিনী প্রভৃতি ছড়িয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীকে শ্রমের ঐকতানের দ্বারা মাতাতে হবে। গোর্কির নির্দেশ—"oral poetry depended for its powerful generalizing images upon laboring activity. Examples are seen in such heroic laborers as Hercules, Prometheus, Mikula Seljaninovic and Svjatogor" তিনি 'অশিক্ষিত' গায়ক সুলেজমনকে বিশশতকের হোমার বলে ঘোষণা করলেন। লোকবৃত্ত কর্মীর কাজ নির্দিষ্ট হলো সংগৃহীত লোকবৃত্ত থেকে প্রোলেতারীয় মানস খোঁজা। তার ফলে আই. জি. প্রিজভ সেইসব লোকবৃত্তকে অকৃত্রিম লোকবৃত্ত বলে চিহ্নিত করলেন যা জারের বিরুদ্ধে, সামন্ত জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জীবনঘনিষ্ঠ বিবরণ সমৃদ্ধ। এবং যার পর্যালোচনায় জনজীবনের সংগ্রাম ফুটে ওঠে। ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে রচিত সাহিত্য-কাব্যকেও সঠিক ও অকৃত্রিম লোকবৃত্তের ছাপ মারা হলো। এ ক্ষুদ্রজাকভ সামাজিক প্রতিবাদ এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বমূলক কেরিকেচারকে জনপ্রিয় লোকগল্পের এবং ঐতিহাসিক লোকসঙ্গীতের মানে উন্নীত করলেন। ভি. পি বীরজুকভ খনির মালিক, ফোরম্যানদের বিরুদ্ধে রচিত গান, ছড়া, কবিতা, কিম্বদন্তী, শ্লোগান প্রভৃতিকে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে এমনভাবে মেলালেন এবং লোকঅভিপ্রায় বা ফোক-মোটিফের ব্যাখ্যা করলেন যা শোষিতশ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে। এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সোভিয়েৎ এথনোগ্রাফি জার্নালে ১৯৪৪ সনে এল. জেমিলজানোভা যে প্রবন্ধ লিখলেন তাতে বললেন প্রগতিবাদী বিদ্বানদের দ্বারাই লোকবৃত্তকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। লোকবৃত্ত বৃহৎ শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব জিনিষ। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডরসন লিখেছেন "What concerns us here isnot so much Zemiljanova's obvious errors but her dogmatic assumptions about

folklore as an expression of class struggle that follow so purely the dialectic of Marx and Lenin, and that she would apply to the United States, or to any country, with the same confidence as to the Soviet Union." আমাদের দেশের প্রগতিধারার লোকবৃত্তবিদেরাও এইসব মতামতের ব্যাপারে বোধহয় অবগত নন। যদিও প্রগতি অথবা প্রগতিবিরোধী এই দুই ধারার কর্মীদেরই এসব জানা উচিত। সমস্ত তথ্য না জেনে অধ্যয়ন-অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিত নির্দিষ্ট করলে তাতে প্রযোজনীয় বোধ ও বুদ্ধির প্রতিফলন ঘটে না।

আমাদের দেশের লোকবৃত্ত আলোচনা এখনও বর্ণনামূলক। ভাব ও রসে সমৃদ্ধ। লোকবৃত্তের ফাংশনাল বা কার্মিকপদ্ধতি বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে আমেরিকায়, আমেরিকার নৃবিজ্ঞানের জনক ফ্রানজ বোয়াস ও তাঁর উত্তরসূরীদের প্রচেষ্টায়। এই পদ্ধতিকে অধিক জনপ্রিয় করেন উইলিয়ম ব্যাসকম। তিনি ব্রনিসল মলিনাউস্কীর তত্ত্বকে ধরে লোকবৃত্তের বিভিন্ন ক্রিয়াবাদের কথা জানালেন। বললেন প্রবাদ নানা ধরনের বিবাদ মেটায়, ধাঁধা বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়, লোক পুরাণ লোকাচরণকে দিশা জোগায়, হাস্যরসাত্মক গান, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ শত্রুতা ও মনোমালিন্য দূর করে। লোকবৃত্তের পরিচয় দিতে এসে অধ্যাপক জোশেফ ব্রাম বললেন—পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশের দিন থেকে মানুষ যে শুধু বেঁচে থাকার জন্যই সংগ্রাম করে চলেছে এমন নয়, সে তার জীবনচর্যা প্রণালীকেও নিয়ত পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। মানুষের এই স্বভাবজাত প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য লোকবৃত্ত একটি পথ। এ কথাও বললেন যে পৃথিবীর কোন জাতির জীবনচর্যার সঙ্গে অপর জাতির জীবনচর্যার খুব একটা মিল নেই। সকল জাতির জীবনচর্যার একটা স্বকীয় ও অর্থবহ ভিত্তি আছে। এই ভিত্তির কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। প্রত্যেক জাতির জীবনচর্যার প্রতি বিভাগের অন্তর্গত প্রতি অংশের বিশেষ অর্থ আছে। সমাজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলে যে তথ্য পাওয়া যায় তা যদি মূলের সঙ্গে প্রসঙ্গকে নিয়ে না এগোয় তবে তা মজবুত বলে গৃহীত হয় না। কেননা "A tale is not a dictated text with interlinear translation, but a living recitation delivered to a responsive audience for such cultural purposes as reinforcement of custom and taboo, release of aggressions through fantasy, pedagogical explanations of the natural world, and application of pressures for

conventional behaviour.'' আমেরিকার চেয়েও এই পদ্ধতি ইউরোপে অধিক সমাদৃত। নানা দেশেরআধুনিক লোকবৃত্তবিদদের কাছে আকর্ষণীয়। হাঙ্গেরীর বিদ্বান লিণ্ডা ডেগ এই পদ্ধতি অনুসরণ করে রচনা করেছেন একটি চমৎকার গ্রন্থ—"ফোক-টেলস অ্যাণ্ড সোসাইটি"। পিটার বোগাটিরেভ "দি ফাংশন অব ফোক কস্টিউম ইন মোরাভিয়াম শ্লোভাকিয়া"-য় যাদু, ধর্ম, আঞ্চলিক ও জাতীয় তথ্যাবলী, বয়স, অশ্লীল-শব্দ প্রভৃতির প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন ফাংশনাল পদ্ধতি কিভাবে জনজীবন অধ্যয়নকে স্পষ্ট করে। এই পদ্ধতিতে গ্রামীণ ঘরবাড়ী, চাষআবাদের যন্ত্রপাতি, বাক্‌রীতি প্রভৃতিরও প্রসঙ্গ উত্থাপন ও ব্যাখ্যা সম্ভব।

লোকবৃত্তচর্চার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক মনোবিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি। ফ্রয়েডকে নিয়ে মনোবিশ্লেণাত্মক পদ্ধতি এগিয়েছে। অবশ্য লোকবৃত্তবিদেরা ফ্রয়েডীয় প্রতীকের বদলে লৌকিক প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। তুলনামূলক লোকপুরাণের জনক অ্যাডালবার্ট কুণকে অনুসরণ করে কার্ল আব্রাহাম তাঁর "ড্রিমস অ্যাণ্ড মিথস'' গ্রন্থে স্বপ্ন ও লোকপুরাণের চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। কুণ প্রমিথিউসকে দেখেছেন অগ্নি-আহরণকারী হিসাবে। আব্রাহাম বললেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে লোক-পুরাণের বহিরঙ্গ জানা সম্ভব। কিন্তু এর দ্বারা বিভিন্ন প্রতীক যে একই ব্যক্তিকে নানাভাবে আবৃত করে রাখে তা জানা যায় না। প্রমিথিউস একদিকে অগ্নি আহরণ-কারী অন্যদিকে বিদ্ধকারী। সে পৌরুষ ও জীবনদাতা। ওডিপিয়াস মিথ-এ ফ্রয়েড লক্ষ্য করেছেন "a superlative illustration of the mythical narrative that exposes the dark, suppressed desires and drives of children grown to adults.'' আব্রাহাম বলেছেন শিশুর চেতনা অত স্পষ্ট নয়। সেখানে 'সুপার ইগো'-র পরদা থাকে। তা স্বপ্নে প্রতীকের মারফৎ জানা যায়। মনোবিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির সাহায্যে এই পরদা উন্মোচন করা সম্ভব। ফ্যানটাসিরও বিশ্লেষণ সম্ভব। এই পদ্ধতিতে সংস্কার, বিশ্বাস, আচার-আচরণ, খেলাধূলা, গল্প, ছড়া, নাটক প্রভৃতিরও বিশ্লেষণ সম্ভব। লণ্ডন ফোকলোর সোসাইটির সভাপতি আর্নেস্ট জোনস সোসাইটির পঞ্চাশবছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯২৮ সনে "দি প্যারালালস বিটুইন সারভাইভাল অব লাইফ ফ্রম দি রেসিয়াল পাস্ট অ্যাণ্ড সারভাইবালস ফ্রম দি ইনডিভিডুয়াল পাস্ট"-কে বিশ্লেষণ করেন তার "দি সিম্বলিক সিগনিফিকেন্স অব সল্ট ইন ফোকলোর অ্যাণ্ড সুপারসটিশন'' প্রবন্ধে। নুনের যাদুশক্তি, আনুষ্ঠানিক কর্মে নুনের ব্যবহার, নুনপোড়া

ইত্যাদির ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মন্তব্য "White, life-giving salt is a symbol for semen and represents the male, active fertilizing principle."

জার্মান পণ্ডিত এরিক ফ্রম ১৯৩৪ সনে আমেরিকায় চলে আসেন। সেখানে বসে "দি ফরগটেন ল্যাঙ্গুয়েজ" রচনা করে দেখালেন "the universal symbolism in such mythical relations as the story of Jonah, where Jonah successively cradled in the ship's hold, the ocean, a deep sleep, and the belley of the whale, exemplified the foetus in mother's womb, and the inner experience of protective isolation." তিনি আরো দেখালেন "the variations and subtleties possible in the interpretation of phantacies, much in the way that the celestial mythologists of the nineteenth century wrangled with each other over whether the sun or the lightning or the aurora was the symbol intended in the myth" অধ্যাপক ফ্রম ওডিপিযাস মিথ-এ যে ট্রিলজি লক্ষ্য করেন তার একদিকে ক্রীযনের পিতৃতান্ত্রিক দাপট, অন্যদিকে এন্টিগনের মাতৃতান্ত্রিক অধিকাব এবং ওডিপিয়াসের মাতৃনির্ভরতা থেকে মাতৃকাদেবীর কবরে চিরনিদ্রা। হাঙ্গেরীর গেজা রহিম এই পদ্ধতিতে লোকগল্প বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কিভাবে মৌল স্বপ্ন লোকপুরাণের বিষয় হতে পারে। তিনি বলেছেন স্বপ্নদ্রষ্টা যখন কোন হ্রদ বা গর্তে পতিত হয় তখন তা পুরুষদের স্ত্রী-যোনী প্রবেশের প্রতীক। এই ধরণের স্বপ্ন প্রথমে একজন দেখে পরে সে স্বপ্নের কথা যখন অন্যের কাছে ব্যক্ত করে তখন জানতে পাবে তার শ্রোতাও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছে। মুখে মুখে এই স্বপ্ন গল্পে পরিণত হয়। তা থেকে লোকপুরাণ রূপ পায়। বর্তমান লেখক "দেশবিদেশের লোকগল্প—সংকলন" গ্রন্থে লোকগল্পে কিভাবে জাতীয মন ও ঐক্য লক্ষ্য করা যায় তা বিশ্লেষণ করেছেন। ফ্রযেডীয পদ্ধতিতে জি লীগম্যান "রেশনালে অব দি ডার্টি জোক : অ্যান এনালেসিস অব সেক্সুযাল হিউমার" (১৯৪৪) গ্রন্থে বিবাহের আগে যৌনাচার, পাশবিক অত্যাচার, ভয় প্রভৃতির মধ্যে যে সব প্রতীক তা রসিকতা বলে উল্লেখ করেছেন। ডরসনের ভাষায "Joke, particularly the off color joke, are the major folk narrative genre in contemporary society," লীগম্যান ম্যাক্সমূলার এবং অ্যানড্রু ল্যাঙকে অনুসরণ করে অশ্লীল রসিকতা ব্যাখ্যা করেছেন।

ফ্রয়েডের সঙ্গে মতানৈক্য হলে ১৯১৩ সনে ইয়ং সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে গিয়ে ইয়ং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেও তিনি লোকবৃত্তের মনোবিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যায় নজর দেন। ইয়ং ফ্রয়েডের নাম ও লিঙ্গ প্রতীককে অস্বীকার করেন, পুরুষ- ও স্ত্রী লিঙ্গ প্রতীককে নর এবং নারী হিসাবে বোঝেন। চেতন-অবচেতন, জন্ম-মৃত্যু, ঈশ্বর-শয়তান প্রভৃতি প্রতীকের মধ্যে তাঁর বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ রাখেন। তাঁর পদ্ধতি বিমূর্তন সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে পরিণত হয়। ইয়ং-পন্থীরা লোকগল্প ও লোকপুরাণের মধ্যে লক্ষ্য করেন ছায়াচিত্র। এই ছাযাচিত্র ফ্যাণ্টাসি, যা স্বপ্নেও লক্ষ্য করা যায়। ইয়ং-পন্থীরা বললেন সাহায্যকারিনী ডাইনী বা তজ্জাতীয় চরিত্র সমষ্টিগত ছায়াচিত্র। আমেরিকার পুবলো ইণ্ডিয়ানদের লোকপুরাণের সাহায্যকারিনী ডাইনীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে এসেছেন। রক্ষণশীল লোকবৃত্তবিদেরা অন্যভাবে মনোবিশ্লেষণ আত্মক পদ্ধতির আলোচনা করেছেন। অনেকে এই পদ্ধতি অমান্য করার কথাও বলেছেন। অনেকে ওডিপিযাস কমপ্লেক্সকে অন্য দৃষ্টিতে দেখেছেন, অপশ্চিমা আদিবাসী গোষ্ঠীর মৌখিক সাহিত্য বিশ্লেষণে। হারসকোভিট্সের তত্ত্ব "Sibling jealousy for the favour of the mother, and father's fear of displacement by his son"-কে নতুন করে দেখলেন মলিনাউস্কী। তিনি ট্রোব্রিয়াণ্ডগোষ্ঠীর লোকপুরাণ ব্যাখ্যা করে দেখালেন "the father's brother who brought up the son became the object of childhood resentment."

সমকালে লোকবৃত্ত চর্চার বহুজন গৃহীত পদ্ধতি আঙ্গিকবাদ বা স্ট্রাকচারালিজম। এই পদ্ধতির জনক ভ্লাডিমির প্রপ। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের পর প্রপ এই পদ্ধতিকে অস্বীকার করলেন, এ কথা পূর্বেও বলেছি। প্রপের বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ সনে, বর্জিত হয় ১৯৩৪ সনে। হঠাৎ ১৯৬০ সনে আমেরিকা থেকে এ বই-এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চমক আসে। বইটি আমেরিকার লোকবৃত্ত-বিদদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ১৯৩০ সনে জার্মান বিদ্বান আন্দ্রে জলেস ও ১৯৩৬ সনে লর্ড র‍্যাগলনও আঙ্গিকবাদের কথা উচ্চারণ করেছিলেন তাঁদের গ্রন্থে, কিন্তু প্রপের ইংরেজি সংস্করণ এবং লেভী-স্ত্রাউসের আবির্ভাব আঙ্গিকবাদকে নতুন জীবন দেয়। ১৯৪৪ সনে প্রপকে অনুসরণ করে আলান ডাণ্ডিস রচনা করলেন "দি মরফোলজি অব নর্থ-আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান ফোকটেলস"। প্রপ আর্টি আর্নেকে মাথায় রেখেই তাঁর 'মরফোলজি' রচনা করেছিলেন।

স্টীথ থমসন আর্ন্টির পদ্ধতিকে সংস্কার করে যে 'মোটিফ-ইনডেক্স' উপহার দেন তা লোকবৃত্ত চচার ক্ষেত্রে এখনও শক্তিশালী। স্টীথ থমসন ১৯১০ সনে প্রকাশিত আর্ন্টি আর্নের পদ্ধতিকে নতুন জীবন দান করে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, প্রায় অনুরূপ কৃতিত্বের অধিকারী আলান ডাণ্ডিস প্রপের আঙ্গিকবাদকে নতুন করে তুলে ধরে। প্রপের ইংরেজি সংস্করণ "মরফোলজি অব রাশিয়ান ফোকলোর" গ্রন্থের ভূমিকাও লিখেছেন আলান। আঙ্গিকবাদের প্রসারে প্রপ ইত্যাদির নাম উচ্চারিত হলেও আসলে যে নামটি মুখে-মুখে ঘোরে তিনি লেভী-স্ত্রাউস। নৃ-বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য নৃবিজ্ঞানীরা 'পরিচিত' বিষয়বস্তুকেও রহস্যময় ও জটিল করে তোলে। তিনি ওডিপিযাস মিথ এবং কিছু উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিযানদের লোকপুরাণের আলোচনায় বিষয ও প্রসার অনুসাবে বিভিন্ন ঘটনা এমনভাবে সাজালেন যার ভিতর থেকে সাধারণ ভাবনা ও চেতনা নতুন ভাবে উঁকি দিল। তিনি দেখালেন "the denial of the autochthonous origin of man, represented in the slaying of monsters by heroic men" এবং "the persistence of the autochthonous origin of man, illustrated by lame men, like Oedipus himself, who emerge from the depths of the earth malformed" স্ত্রাউস যে ভাবে লোকপুরাণের ঘটনাবিন্যাস করলেন, অবয়ব নির্দেশ করলেন, তাতে অতি স্পষ্ট একটা আঙ্গিক বা স্ট্রাকচার পরিষ্কার হলো। প্রপ তাঁর স্ট্রাকচার সাজাতে গিয়ে গল্পের লাইনকে অনুসরণ করেছেন, স্ত্রাউস লোকপুরাণের ঘটনাবলী দিযে তা সাজিযেছেন। আমাদের দেশে আঙ্গিকবাদের উপর তেমন কিছু কাজ হয নি। সম্প্রতি ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বাঙলার লোকছড়ার আলোচনায আঙ্গিক-বাদকে রূপতত্ত্ব হিসাবে দেখেছেন। আঙ্গিকবাদের সঙ্গে বাক-রীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বাকরীতি চর্চাব গুরুত্বেব কথা আগেই বলেছি। বাকরীতি অনুশীলনের দ্বারা বা আঙ্গিকবাদের চর্চায় গবেষক "looks to the narrator and his performance for the key to the composition and structure of epic, ballad, romance and folktale" লেভী-স্ত্রাউস নৃবিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছেন। আমাদের নৃবিজ্ঞানাগত লোকবৃত্তবিদেরা স্ত্রাউসের কথা যতো বলেন তাঁর আঙ্গিক-বাদকে অবলম্বন করে ততো কাজ করেন না। বিষয়টাকে শিক্ষা দেবারও তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। তবে কোন কোন বিদ্বান বাকরীতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন।

হারভার্ডের মিলম্যান প্যারী, ডেভিড রাইনাম প্রভৃতি এদিকে নজর দিয়েছেন। বাক-রীতি অবলম্বন করে যুগশ্লাভিয়ার বীরগাথা 'দি সিংগার অব টেলস' প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সনে। নরওয়েব গীতিকা বিশ্লেষণেও ডবলু. এডসন রিচমণ্ড এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এখানে তথ্যের সঙ্গে কল্পনা মিশেছে। তথ্যের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে গীতিকায় যে নতুন কল্পচিত্র ফুটে ওঠে তাব অনবদ্য প্রকাশ দেখি ড. দীনেশচন্দ্র সেনেব ময়মনসিংহ গীতিকাব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে। ব্রুস এ. রোসেনবার্গ "দি আর্ট অব দি আমেরিকান ফোক প্রিচার" (১৯৪৪) গ্রন্থেও এ জিনিস লক্ষ্য করেছেন। লোক-সাহিত্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন "orally delivered sermon texts to possess narrative, metrical, and rhythmic elements that were manipulated by the preacher in manner offering fair analogy to Jugoslav guslar."

লোকবৃত্ত অধ্যয়নের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি রৈখিক সাংস্কৃতিক বা ক্রস কালচারাল। ব্রিটিশ নৃ-বিজ্ঞান বিদ্যাপীঠের জনক এডওয়ার্ড বি. টাইলব, অ্যানড্রু ল্যাঙ, এডুযিন সিডনী হার্টল্যাণ্ড, জে. জি ফ্রেজার প্রভৃতি এই পদ্ধতিকে এগিযে নেন। বাঙলার নৃবিজ্ঞানাগত লোকবৃত্ত গবেষকদের মধ্যেও এই পদ্ধতির জনপ্রিয়তা লক্ষণীয়। তাঁদের সঙ্গে জাতীযতাবাদী গবেষকেরাও সামিল হন। সমাজ বিজ্ঞানের আলোতে যাঁরা লোকবৃত্ত অনুশীলনে উৎসাহী তাঁরা এ পদ্ধতির বিশেষ ভক্ত। ড প্রবোধকুমার ভৌমিকের "স্যোসিও কালচারাল প্রোফাইল অব ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল" রৈখিক সাংস্কৃতিক অধ্যযন। এখানে আঞ্চলিক জীবনের বার্তা, দেযা-নেযার বার্তা, সাংস্কৃতিক বার্তা প্রকাশিত। ভোলানাথ ভট্টাচার্যের "শিল্পভাবনা" গ্রন্থে লোকশিল্প ও লোকশিল্পকলার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পাই। আমেরিকার হেনরী গ্লাসি তাঁর "প্যাটারন্‌স্ ইন দি 'দি মেটিরিয়াল ফোক-কালচার অব ইস্টার্ন ইউনাইটেড স্টেটস' গ্রন্থে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। গ্লাসি বলেছেন লোকবৃত্তের যোগ্য গবেষককে ক্ষেত্রনিরীক্ষক ও তাত্ত্বিক হতে হয়। বস্তু-সংস্কৃতির আধুনিক অধ্যযনকে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে হয। প্রত্যেক তথ্যের প্রামাণিকতা উল্লেখ করতে হয বস্তু গড়ন, ব্যবহার-বৃত্তান্ত, রৈখিক ও মনোবিশ্লেণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করে। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত, ঐতিহ্যানুগত, কান্তিবিদ্যা, আর্থ ও পরিবেশ সম্পর্কিত নানা দিকও তুলে ধরতে হয়। তারাপদ সাঁতরা দারু ভাস্কর্য ও লোকশিল্প বিষয়ক আলোচনায় এর কোন কোন দিক নিয়ে ভেবেছেন।

বিশ শতকের নাগরিক সভ্যতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা, গণসংস্কৃতি, জন-যোগাযোগ ও প্রচার ইত্যাদির দ্বারা লোকবৃত্ত আক্রান্ত। ১৯৬০ সন থেকে নতুন হাওয়া বইতে সুরু করেছে। গণ বা জনসংস্কৃতি এবং লোকসংস্কৃতির মধ্যে 'interpenetration instead of confrontation' দেখা যাচ্ছে। "The city is indeed increasingly a conglomeration of folk societies, as the middle classes flee town for the suburbs, and the ghetto takes over So to do the omnivorous mass media···absorb and engulf all kinds of folk themes and formulas, to spew them out to their giant audiences in a cultural feedback." গণসংস্কৃতি আলোচনার নিজস্ব কোন পদ্ধতি এখনও গৃহীত হয় নি।

অনেকে মনে করেন শিল্পাগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতি বিনষ্ট হয়। অনেকেই এ যুক্তি মানেন না। আমরা মনে করি যে কোন পরিবর্তনেই লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়। তাই অনুসন্ধান করা হয় শিল্পাগ্রসরতা বা অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকবৃত্ত কিভাবে বিবর্তিত হয় তার ধারা ও ফরম। বর্তমান লেখকের লোকবৃত্তের অন্তদিগন্ত গ্রন্থে বিবর্তিত লোকবৃত্তের আলোচনা পাওয়া যাবে।

লোকবৃত্ত গবেষণায় হেমিসফেরিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন রিচার্ড এস. ডরসন। এই পদ্ধতির দ্বারা নতুন দুনিয়ার লোকবৃত্ত চর্চা করা হয় "in terms of its ethnic-racial and historical ingredients" কোন গবেষকের পক্ষেই প্রাচীন সমাজের জাতীয় ঐতিহ্য নির্ধারণ সহজ নয় "with its relative stability, rootedness and long ancestry". নয়া দুনিয়ার জাতীয় ঐতিহ্য খোঁজার জন্য জাতিগত, পেশাগত, মূল সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বস্তু উপকরণের বিশ্লেষণ দরকার হয়। হেমিসফেরিক পদ্ধতি অনুসরণে এ কাজ করা যায়। এই পদ্ধতিটি আমাদের দেশে খুব পরিচিত নয়। তবে কনটেক্সচুয়াল বা প্রকরণ পদ্ধতি অনেকেরই নজরে এসেছে। ভাষা-বিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বন করে এই শ্রেণীর লোকবৃত্তবিদদের অনেকে আচার-ব্যবহার, বাকরীতি প্রভৃতির চর্চা করছেন। নৃতত্ত্বের ক্রিয়াবাদ, সমাজবিজ্ঞান নির্দিষ্ট নানা পদ্ধতি ও মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রভৃতিও এই অধ্যয়নে প্রাধান্য পাচ্ছে।

উপরে লোকবৃত্ত চর্চার আধুনিক পদ্ধতি-প্রকরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে যে-সব কথা বলা হয়েছে তা স্মরণে রেখে একথাও মনে রাখতে হবে যে, যে দিন থেকে লোকবৃত্ত স্বতন্ত্র অধ্যয়ন-অনুশীলনের বিষয়ে পরিণত হয় সেদিন থেকেই বিদ্বদ্মণ্ডলী নানা ধরনের কাজ

করে চলেছেন। এই কর্মধারার প্রতি চকিত চাহনি দিলেই দেখতে পাই গ্রীম ভাইদের আমল থেকেই ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি লোকবৃত্তবিদদের আকর্ষণ করতে থাকে। পদ্ধতিগত ভাবে এর স্বীকৃতি আসে ফিনল্যাণ্ডের বিদ্বানদের দ্বারা। এই পদ্ধতির রূপকার কার্লে ক্রোন। তিনি ১৯২৬ সনে "ফোকলোর মেথডোলোজি" গ্রন্থে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেন। এ পদ্ধতিকে আরও স্পষ্ট করলেন ডবলু. এ. উইলসন ১৯৪৪ সনে তাঁর "ফোকলোর অ্যাণ্ড ন্যাশনালিজম ইন মডার্ন ফিনল্যাণ্ড" গ্রন্থে। সকলেই জানেন বিশেষ গ্রন্থপঞ্জী রচনা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন আন্টি আর্নে। স্টীথ থমসন এই পদ্ধতিকে পুনর্যোজিত ও পুনর্মার্জিত করার পরই সারা বিশ্বে পদ্ধতিটি সমাদরে গৃহীত হয়। সমকালীন বোধ ও চেতনাসম্পন্ন বিদ্বানদের দ্বারা সমালোচিত হলেও এ পদ্ধতিটি এখনও প্রাণবন্ত। সমালোচকেরা বললেন এই পদ্ধতিতে 'exhaustive annotation' থাকলেও উদ্ধৃতি সীমাবদ্ধ এবং তা অনেকটাই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। এটি হচ্ছে "butterfly collecting : rich in description but lacking in theoretical context' অথচ তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ ব্যতীত বিষয়কে নিয়ে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সঙ্গে সমতালে এগোনো যায় না।

বস্তুবাদ ও লোকবৃত্তের ধারা

আমাদের দেশে লোকবৃত্ত চর্চায় সাহিত্যিক চেতনা যতো প্রবল ততো তীক্ষ্ণ নয় বৈজ্ঞানিক চেতনা। বিভিন্ন অঞ্চলের গবেষকেরা নিজস্ব বোধ ও বিবেচনা অনুযায়ী লোকবৃত্তের বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ করেছেন, সংকলন প্রকাশ করেছেন। ভাব, রস, আঞ্চলিক চেতনা, জাতীয় গৌরব প্রভৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য খোঁজার চেষ্টা অল্প। রৈখিক সাংস্কৃতিক, তাত্ত্বিক, আঙ্গিক ও বাকরীতি নিয়ে কাজ সীমিত। বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা প্রশ্রয় পায় নি বলেই লোকবৃত্তের খনির মধ্যে বসবাস করেও লোকবৃত্তকে যথোপযুক্ত মর্যাদায় উন্নীত করা যায় নি। মোটিফ-ইনডেক্সের উপর যথার্থ কোন কাজ এখনও প্রকাশিত হয় নি এদেশে, তবে বিষয়টি অচ্ছুৎ থাকে নি। খণ্ডিত কিছু কাজ হয়েছে ভারতের অন্যত্র, পশ্চিম বাঙলায় প্রায় কিছুই হয় নি। বাংলাদেশে ড. আশরাফ সিদ্দিকী-আদি কিছু লোকবিজ্ঞানী কিছু কাজ করেছেন।

মনোবিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিও বহু বিদ্বানকে চাঙ্গা রাখে। এই পদ্ধতির বিদ্বানেরা চেতন, অবচেতন, গোষ্ঠীচৈতন্য প্রভৃতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, "psychic war of id, ego and super ego" নিয়ে কাজ করেছেন। আমাদের লোকবৃত্তবিদদের দৃষ্টি এদিকেও পড়ে নি। আমাদের মনোবিজ্ঞানীরাও লোকবৃত্তকে খুব একটা আমল দেন না। আমেরিকার ভদ্গতিসম্পন্ন লোকবিজ্ঞানী আলান ডাণ্ডিস এই পদ্ধতিতে প্রবাদ, ধাঁধা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বহু লোকবৃত্ত, বিশেষত ফ্যাণ্টাসি হচ্ছে অবচেতন মনের ব্যাপার। লোকবৃত্তের অবচেতন সত্তা লক্ষ্য করে বিদ্বানেরা প্রশ্ন করেছেন : "whether the issue is sibling rivalry, Oeidipal or Electrical impulses, male envy female procreativity, or racism (folklore projection offers a guilt-free means of exploring the problem" এই প্রশ্ন নিয়ে কাজ করার অবকাশ থাকলেও কোন কাজ হয নি বাঙলায়, এখনও মামুলি সংগ্রহ ও মামুলি আলোচনা আমাদের বিদ্বান ও গবেষকদের অনুশীলনের বিষয। লেভী-স্ট্রাউস যখন তাঁর আঙ্গিকবাদ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন তখন তিনি লোকবৃত্তের চর্চায় অবচেতন ভাবনাকে আমল দিলেন না। তিনি ফ্রয়েডের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে বললেন "a genuine meaning lies behind the apparent one." আঙ্গিকবাদের পূর্ণ যৌবনে Speech-Community বা বাক-গোষ্ঠী তত্ত্ব নতুন চেতনা এনেছে।

মার্কসবাদীরা লোকবৃত্ত চর্চায নতুন আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা নৃতত্ত্বের কনভেনশনাল তাত্ত্বিক বিষয়কে সমালোচনা করতে গিয়ে লোকবৃত্তের রক্ষণশীল বিদ্বান এবং পদ্ধতিরও সমালোচনা করছেন। তাঁদের বস্তুবাদ বা ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বতত্ত্ব "historical materialism is not a fully articulated dogmatic grid (or structural theory) to be mechanically imposed on any problem. Rather it is a working scientific tradition, struggling to develop theoretical understanding of specific historical problems in a world dominated by class-conflict." ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হচ্ছে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের যে ভিত্তি তাতে মানবজীবনকে বৈজ্ঞানিক ধারায় গড়ে তোলার কথা আছে। এঁদের মতে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে রয়েছে যে বৈপ্লবিক রূপান্তরের সময়কাল তার একটির রূপান্তর হয অন্যটির মধ্যে। শ্রেণীহীন সমাজের প্রত্যেকে খাটবে সাধ্যমত, নেবে প্রয়োজন অনুযায়ী। তার জন্য কয়েকটি সামাজিক স্তর নির্দিষ্ট হয়েছে।

প্রত্যেকটি স্তরে যে লড়াই সে লড়াই উৎসের সঙ্গে, হেতুর সঙ্গে নয়। সেজন্যই মার্কস "abolished the false dichotomy between ideal and material and thus provided an epistemological basis for a materialist science." পার্থিব জগৎ অনবরত ও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তার ফলে তত্ত্বীয় আদর্শ ও পথের পবিবর্তন স্বাভাবিক। সুতরাং স্ট্রাকচার বা আঙ্গিক সঠিকভাবে বুঝতে হলে দ্বান্দ্বিকতত্ত্বের মধ্য দিয়েই যেতে হয় বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন। কেননা কোন বস্তু বাপদার্থেরউপরিভাগ অবলোকনকবে বাস্তবজ্ঞান লাভ করা যায় না। তাই লেভী স্ত্রাউস সমালোচিত। তাঁব অবচেতন আঙ্গিক বা "unconscious struc1ure has for some disguised the b1sic incompatibility betweeen Structuralism and Marxism." আমাদের লোকবৃত্তবিদদের চেতনায় মতাদর্শগত বক্তব্যাদি উপস্থিত থাকা দবকার। তা থাকলে এটা পরিষ্কার করা সহজ হয় কেন কতকগুলো তথ্য আমাদের প্রযোজনে আসে, কেন কতকগুলো তথ্য আমাদেব প্রযোজনে আসে না। এই বোধ ঠিক না হলে তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহকার গুদাম রক্ষকে পরিণত হন। লেভীর কথা "all contradictions are of same quality ; all are oppositions reducible in the last analysis to the universal dimensions of the order of orders" কিন্তু কার্ল মার্কস তা মনে কবেন না। মার্কসবাদীর কথা "Contradictions vary in quality with their material development in history, both in antagonism and in significance" মাওসে-তুঙও এ ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন "The metaphysical or vulgar evolutionist world outlook sees things in the universe, their forms and their species, as eternally isolated from one another and immutable. Such change as there is can only be an increase or decrease in quantity or change of place Moreover the cause of such an increase or decrease or change of place is not inside things but outside them, that is their motive force is external." ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা ও উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব মার্কসের অন্যতম মৌলতত্ত্ব। উদ্বৃত্ততত্ত্ব হচ্ছে শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত লভ্যাংশ। রাষ্ট্রগত মালিকানারও উদ্বৃত্ত মূল্য লভ্যাংশ অর্জিত হয়। মার্কসের অন্যতম তত্ত্ব উৎপাদন ব্যবস্থা গতীয় ব্যাপার, স্থিতীয় নয়। মানবসভ্যতার বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য

করতে গিয়ে মানব এবং প্রকৃতির মধ্যে সখ্যভাব ও বৈরীভাব উভয় ভাবকেই লক্ষ্য করেছেন মার্কস। তিনি মানুষের চিন্তা ভাবনাকেও মূল্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "Men can be distinguished from animals by consciousness, by religion or anything else you like. They themselves begin to distinguish themselves from animals as soon as they began to produce their means of subsistence". উৎপাদনের ব্যাপারেই জনগণ প্রকৃতির বিরূপতা সইতে থাকে। সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টনকে কেন্দ্র করেই ইতিহাস গড়ে উঠেছে। যেহেতু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব সেহেতু কোন এককই স্বশাসিত নয়। সমাজের মধ্যেই মানুষ একক হিসাবে চিহ্নিত। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সামাজিক বন্ধন ও আইন-কানুন মান্য করে চলতে হয়। সমাজ চিহ্নিত করার জন্য সামাজিক মানুষকে এবং সামাজিক রীতিনীতিকে মান্য করতে হয়। এ সকলের সামগ্রিক রূপই হচ্ছে সমাজ। সুতরাং, পদ্ধতিগতভাবে কোন জাতিগোষ্ঠীর বিশ্লেষণে সমাজের পূর্ণ ছবি পাওয়া যায় না। সেজন্য সামাজিক বন্ধন ও আত্মীয়তার ব্যাপারও লক্ষ্য করতে হয়। মার্কস সাংস্কৃতিক তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব নিয়ে ভেবেছেন। গীরতজ সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, সাধারণভাবে সংস্কৃতির কোন তত্ত্ব নেই, বিশেষ বিশেষ সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করা ছাড়া নৃবিজ্ঞানীর কোন কাজ নেই। এখানে মার্কস ও গীরতজ দুই মেরুর বাসিন্দা। মার্কসের পরিভাষায় সংস্কৃতি এবং ভাবাদর্শ দুটি আলাদা ব্যাপার। সুতরাং সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যার ব্যাপারে ঐতিহাসিক কারণে গঠিত সামাজিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা আগে দরকার। মার্কসের সামাজিক পদ্ধতি হচ্ছে "a dynamic totality composed of relations between people and between people and nature." এই সম্পর্কের বিভিন্ন মান বর্তমান। মার্কস সেইসব ব্যক্তির সমালোচনা করেছেন যাঁরা মানবের সক্রিয়তাকে প্রকৃতির নিয়মের বাইরে রেখে বিচার করেছেন। যে-সব সংস্কৃতি-বিজ্ঞানী ইতিহাসের মানে খুঁজেছেন প্রযুক্তিবিদ্যার পদ্ধতির মধ্যে তাঁদের সঙ্গে মার্কস সহমত প্রদর্শন করেন নি। মর্শাল শালীন্‌স মনে করেন "Political structures evolve from a contradiction between forces and relations of production"-এর দ্বারা। শালীন্‌সের এই চিন্তার সঙ্গে মার্কসের মতানৈক্য নেই। মার্কসীয় তত্ত্বে লোকবৃত্তের পৃথক কোন শৃঙ্খলা মানা হয় না। তাঁরা মনে করেন এমন কোন লৌকিক দর্পণ পাওয়া যায় না যার সাহায্যে সার্বজনীন মৌলিক মানুষকে দেখা যায়। কারণ, প্রত্যেক

ব্যক্তি বা একক ঐতিহাসিক ও সামাজিক সম্পর্ক শাসিত। আদিম সাম্যবাদ অথবা বুর্জোয়া সমাজের আগের সমাজকে লক্ষ্য করেও কোন ঐক্যসূত্র অবগত হওয়া যায় না— 'their similarity lies in what they are not rather than in what they are." মার্কসবাদীদের কাছে লোকবৃত্ত হচ্ছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, যা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু লোকবৃত্তবিদেরা লোকবৃত্তকে পৃথক শাস্ত্র হিসাবে দেখতে চান। পৃথক পদ্ধতি ও তত্ত্বের দ্বারা একে বিচার করতে চান।

বিজ্ঞান সর্বদাই কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর পেতে চায়। সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে মাথা ঘামায় না। লোকবৃত্তও বিজ্ঞান, তাই তারও নিজস্ব কতগুলো প্রশ্ন আছে। এবং সে-সব প্রশ্নের উত্তর সে নিজস্ব তত্ত্ব ও পদ্ধতির দ্বারাই পেতে আগ্রহী।

লোকবৃত্তের স্বাভাবিক গতিবিধি

যে-কোন দেশের লোকবৃত্তের সঙ্গে সেই দেশের মানুষের হৃদয়বৃত্তি অকুণ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বাঙলার লোকবৃত্তের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। নিপুণতাবিহীন সরল সচ্ছন্দ তানে বাঙালী জীবনের দৈনন্দিন ব্যথারঞ্জিত চিত্র বাঙলার লোকবৃত্তের মধ্যে ধরা পড়ে। লোক প্রকৃতি ও লোকসমাজ ধরা দেয় লোকবৃত্তে।

একটু আগে লোকবৃত্ত চর্চার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যে কথা বলেছি তা যে বিভিন্ন নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে তা বোধ করি সকলেই বুঝতে পেরেছেন। বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন বিদ্বান লোকবৃত্ত চর্চায় এগিয়ে এসেছেন। তাই লোকবৃত্তশাস্ত্র এখন বিভিন্ন নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছে। লোকবৃত্তের জগতে বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ও বিদ্বানদের সমাগম হওয়ায় লোকবৃত্তের বহু বিচিত্র সংজ্ঞা রচিত হয়েছে। স্ট্যাণ্ডার্ড ডিকশনারী অব ফোকলোর-এ একমাত্র মার্কিন লোকবৃত্তবিদেরাই একুশটি সংজ্ঞার নির্দেশ করেছেন। মার্কিন পণ্ডিতদের অনেকেই লোকবৃত্তকে ঐতিহ্যসম্পন্ন মৌখিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 'অশিক্ষিত' লোকের সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করেছেন। ইউরোপের পণ্ডিতেরা অন্য দৃষ্টিতে লোকবৃত্তকে লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা লোকবৃত্তের মধ্যে লোকজীবনকেও দেখতে চেয়েছেন। অর্থাৎ আমেরিকার বিদ্বানেরা যখন 'লোর' নিয়ে চিন্তিত, তখন ইউরোপের বিদ্বানেরা 'ফোক' নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন।

লোকবৃত্ত চর্চা করতে এসে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন উপকরণ সংগ্রহ,

প্রকাশ ও চর্চাই আসল কাজ। আবার কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন লোকজীবনকে জানার জন্য, লোকসমাজের সংগঠন ইত্যাদি বোঝার জন্যই লোকবৃত্তের চর্চা। আমাদের দেশের অগ্রজ গবেষকেরা ইউরোপের বিশেষত ব্রিটেনের বিদ্বানদের দ্বারা সঙ্গত কারণেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তাঁদের মতো করে বিষয়কে দেখতে চেয়েছেন।

ভারতের আধুনিক গবেষকদের চেতনার খোরাক জোগাচ্ছেন মূলত মার্কিন বিদ্বানেরা। এই মার্কিন বিদ্বানদের প্রায় কেউই মৌলিক কোন কাজ বা আবিষ্কার করেন নি। তাঁরা প্রধানত ইউরোপীয় বিদ্বানদের আবিষ্কৃত পদ্ধতি-প্রকরণকে উন্নত করেছেন। যে স্টীথ থমসন সারা বিশ্বের লোকবৃত্তবিদদের একটি স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় নাম তিনিও নতুন কিছু আবিষ্কার করেন নি। আণ্টিব পদ্ধতিকে সমুন্নত করেছেন। তবে মার্কিন বিদ্বানদের একটা অসাধারণ গুণ, তাঁরা যে কোন কারণেই হোক, সারা পৃথিবীর যে কোন মোল কাজের সন্ধান রাখেন বা রাখতে পারেন, এবং সে কাজকে সঙ্গে সঙ্গে নিজ দেশেও আমদানি করতে পারেন। তাই লোকবৃত্তশাস্ত্রের আধুনিক চিন্তা তাদের অধ্যয়নে প্রতিফলিত হয়। রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে তদীয় মানে তাঁরা সমস্ত ব্যাপারটা বিবেচনা করেন।

লোকবৃত্ত চর্চার সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির যোগ নেই। তবে সমগ্র জীবন যেখানে রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত সেখানে রাজনৈতিক, রাষ্ট্র বৈজ্ঞানিক, সমাজ বৈজ্ঞানিক চেতনা ছাড়া সমাজ সংগঠন, লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় না এ কথাও মান্য করতে হয়। অর্থনীতি, ধর্মনীতি, ভাষা, পরিবেশ, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক চেতনা না থাকলে লোকজীবনকে, লোকজীবনের চাওয়া-পাওয়াকে বোঝা বা বোঝানো কষ্টকর। দলীয় মতবাদকে পাশ কাটিয়ে গেলেও গবেষককে রাজনীতি সচেতন থাকতে হয়। রাজনীতি বুঝতে হয়। এই চেতনা নিয়েই লোকবৃত্তের 'লোক' কারা, লোকজীবন কি তা জানতে হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি অগ্রজ গবেষকদের অনেকে 'লোক' বলতে গ্রামের 'অশিক্ষিত' শ্রেণীকে বুঝেছেন এবং লোকবৃত্ত বলতে এই শ্রেণীর লোকদের মৌখিক সাহিত্যকে সনাক্ত করেছেন। আধুনিক চিন্তায় এই দুটোই ভুল। এখন 'বিধিবৎ শিক্ষা' বা ফরমাল এডুকেশন, এবং 'গ্রাম'-কে নিশানা করে লোক এবং লোকবৃত্ত চেনা হয় না। সমকালের চিন্তায় লোকসমাজ হচ্ছে সমপ্রকৃতিসম্পন্ন সমাজ। অলঙ্ঘনীয় তাদের আচার-আচরণ। এই শ্রেণীয়রা নিজেরাই নিজেদের রক্ষাকবচ। প্রধানত স্বয়ংসম্পূর্ণ,

কিন্তু আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত, স্বতন্ত্র। এদের হাবভাব, আদবকায়দা, কথা বলার ঢঙ, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার সবই শিক্ষিত ও নাগরিক সমাজ থেকে পৃথক। যদিও প্রতিনিয়ত উভয়ের মধ্যে দেয়া-নেয়া চলে। আধুনিক চিন্তায় শহরের মুটে, মজুর, হকার, রিক্সাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, ফুচকাওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ছোটদোকানী, ভেণ্ডার, কারিগর, দোকানকর্মচারী, বাইণ্ডার, কুলিকামিন, বিড়িওয়ালা, পানওয়ালা, ধোপা, নাপিত, মেথর, গোয়ালা, মুদ্রাফরাস, ছুতার, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী প্রভৃতি যাদের অধিকাংশ অক্ষরজ্ঞানহীন কিন্তু পরম্পরাগত ঐতিহ্য আঁকড়ে আছে, নিজস্ব আচার-আচরণ, ধর্মকর্ম, সংস্কার-বিশ্বাস, ঠাট্টা-হাসি, নাচ-গান, বাকরীতি অটুট রেখে চলেছে, পিতৃপুরুষের ধ্যান ধারণা ও উপলব্ধি নিয়ে দলবদ্ধ গোষ্ঠীজীবনে দিনাতিপাত করছে কোন বস্তি বা তজ্জাতীয় স্থানে, যারা নিজস্ব ঢঙে কথা বলে, ছড়া বাঁধে, গল্প বলে, নাচ, গান, নাটকে মাতে, প্রবাদ-প্রবচন ধাঁধার দ্বারা নিজেদের জীবন্ত রাখে, লৌকিক মেজাজ নিয়ে আনন্দ-বিষাদকে মানিয়ে নেয় তারা শহরে বসবাস করলেও 'লোক' সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারে। তাদের সৃষ্ট সাহিত্য, উৎপাদিত দ্রব্য বা বস্তুও লোকবৃত্ত বা লোকবৃত্তের উপকরণ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে

লোকসমাজের সমস্ত সৃষ্টিই ঐতিহ্য শাসিত। এই সৃষ্টির সঙ্গে প্রাচীনের যোগ যেমন থাকবে তেমন থাকবে স্ব-সমাজের ব্যক্তি ও সমষ্টির মান্যতা। শিক্ষিত ব্যক্তির কোন সৃষ্টি যদি লোকবৃত্তানুকারীও হয় এবং তা যদি লোকসমাজের মান্যতা না পায় তবে তা লোকবৃত্ত হয় না। তাই শহরের 'বাবু'-দের সৃষ্ট বহু সাংস্কৃতিক উপাদান—সঙ্গীত, শিল্প সৃষ্টি—লোকবৃত্ত হিসাবে গৃহীত হয় না। প্রচারের জোরে কিছু লোককে সাময়িকভাবে ঠকানো যায়, প্রচারের দৌলতে পাঁঠাকেও কুকুরে পরিণত করা যায়, কিন্তু তাতে পাঁঠার বস্তু চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয় না, পাঁঠা পাঁঠাই থাকে। লোকবৃত্তকে লজঝড়বৃত্তে পরিণত করার কৌশল অথবা লজঝড়বৃত্তকে লোকবৃত্তে পরিণত করার প্রচেষ্টায়ও কাজ হয় না। উভয়ে উভয়ের চরিত্র নিয়ে বেঁচে আছে। বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে পার্থক্য বুঝে উভয়কে উভয়ের চরিত্রে চিনতে হয়।

সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ। এ জীবন সবাক ও সক্ষম। জীবনযাত্রার নিয়মপদ্ধতি অর্থাৎ আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্মকর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান, মেলা-খেলা, শিক্ষাদীক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, রঙ্গ-রসিকতা থেকে জীবন ধারণের বিভিন্ন বস্তু ও উপকরণ সবই সংস্কৃতির বিষয়। লোকসংস্কৃতি লোকসমাজের জ্ঞানালোক প্রাপ্ত সম্পদ যা

যুক্তিসঙ্গত অথবা বিমূর্ত। মনে রাখতে হবে কোন উপাদান উপকরণ সংস্কৃতি হতে পারে না, উপাদান-উপকরণ সংস্কৃতির বিষয় হতে পারে। সাংস্কৃতিক উপাদান লোক-বৃত্তশাস্ত্রের সম্পদ। তাতে থাকে সাহিত্য বিষয়ক উপাদান ছাড়া বস্তু বিষয়ক উপাদান। বস্তু বিষয়ক উপাদান বস্তু সংস্কৃতির বিষয়। তা মানব জ্ঞানের সেই অংশ যা পরিকল্পনা ও প্রণালী শাসিত এবং যুক্তি নিয়ন্ত্রিত। যা দর্শনীয় এবং স্পর্শনীয়। বস্তু সংস্কৃতির বিষয় লোকজীবন সম্পৃক্ত এবং লোকসমাজের শক্তি ও কর্মধারার অঙ্গ। তাই এ সবই লোকবৃত্তবিদদের চর্চার বিষয়।

নানাদেশের নানা পণ্ডিত নানাভাবে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করেছেন, প্রকৃতি বিচার করেছেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতির প্রকৃতি বিচার করতে গিয়ে বস্তু সংস্কৃতি (মেটিরিয়াল কালচার), আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতি (ফাংশনাল কালচার) ও মানস সংস্কৃতি (স্পিরিচুয়াল কালচার) হিসাবে শ্রেণী চিহ্নিত করেছেন। ড. সুনীতিকুমার ই বি. টাইলরকে অনুসরণ করে এই শ্রেণীবিভাগ করেছেন। ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য নাটকের আলোচনায় সংস্কৃতি শ্রেণীচিহ্নিত করেছেন দ্রব্যসঞ্চয়, শিল্পসঞ্চয় ও সত্যসঞ্চয় হিসাবে। তিনি বলেছেন, "দ্রব্য সঞ্চয়ে মানুষের অর্থ নৈতিক চাওয়া-পাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়, শিল্প সঞ্চয়ে পাওয়া যায় তার প্রকাশ ব্যাকুলতার রূপ, আর চিন্তা বা সত্য সঞ্চয়ে পাওয়া যায় তার ভাবনা আর আর জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিচয়।" অনেকের মতানুসারে সংস্কৃতির এই প্রকৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতি ও গণ-সংস্কৃতিকেও এখন মেলাতে হয়।

লোকসংস্কৃতির কথা ইতিপূর্বে বলেছি, আরো বলবো, তার আগে গণসংস্কৃতি কি তা বুঝে নেওয়া যাক। গণসংস্কৃতির 'গণ' গভীর অর্থবহ। গুরুত্বের দিক থেকে তারা শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত। যে সংস্কৃতির মূল সুর এই শ্রেণীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আনন্দ-বেদনায় ভরপুর তা গণসংস্কৃতি। ইতিহাসের ধারায় তার প্রকাশ। শিল্পের সঙ্গে রাজনীতির ঐক্য, বিষয়বস্তু ও রূপরীতির সমন্বয়, শিল্পমূল্যের বিচারে উত্তীর্ণ। কারণ শিল্প হচ্ছে মানব জীবনের স্বস্তি। মানুষের সমগ্র জীবনাচরণে হয় সংস্কৃতির প্রতিফলন। যদিও অনেকে ক্ষুদ্রতর অর্থে এর প্রয়োগ করেন। তার ফলে অনেকের চেতনায় লঘু সংস্কৃতি, সুগম সঙ্গীত ইত্যাদি গণসংস্কৃতির বিষয়ে পরিণত হয়। কোন জাতির বা সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে হয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তার সামগ্রিক জীবনবোধ এবং সামগ্রিক চেতনার প্রতিফলন। লোক সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার আগে তাই লোকসমাজের সামগ্রিক সংস্কৃতিগত অবস্থান জেনে নিতে

হয়। কারণ নাগরিক সাংস্কৃতিক উপরিসৌধ যাদের হাতে তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারাই সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করে। তাদের হাতেই সাংস্কৃতিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এই অবক্ষয়কে রোধ করার জন্যই না কি গণসাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম হয়েছে এ দেশে। গণসাংস্কৃতিক আন্দোলনেব চরিত্র কি, তা কতটা সুস্থ সংস্কৃতি আমদানি কবতে পেরেছে তা অন্য আলোচনার বিষয়। তবে গণসংস্কৃতির নামে লঘু বা চটুল সংস্কৃতির চর্চা করে যে বেশ কিছু ব্যক্তি করেকম্মে খাচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

ঐতিহ্যের বহু উপকরণ সংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চরমান, এই সঞ্চরমান উপাদানের সব দেখা যায় না। ক্রমবিবর্তন ও ক্রমোৎকর্ষে সংস্কৃতি রূপান্তরিত হয়। তাতে সংস্কৃতির আদিরূপ সহজে চেনা যায় না। গবেষক ও বিদ্বানেরা আদিরূপের সন্ধান করেন।

সংস্কৃতির মধ্যে থাকে এগিয়ে যাবার ও পূর্ণতালাভের সচেতন কর্মপ্রয়াস। তাই সংস্কৃতি ঐতিহ্যানুসারী হলেও গতানুগতিকতা বিরোধী এবং বৈচিত্র্যময়। কিন্তু লোকসংস্কৃতি স্থূল, অমার্জিত, সরল ও গতানুগতিক এবং বৈচিত্র্যহীন। একটি বিশেষ ভূখণ্ডের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনাচার, জীবিকাপদ্ধতি ও ব্যবহারিক বস্তুর আলোকে বিকশিত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেই জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি। এরমধ্যে পারিপার্শ্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে। অনায়াসে ও উত্তরাধিকারসূত্রে তদীয় সাংস্কৃতিক উপাদান-উপকরণ ব্যবহার করে তাদের জীবনচর্যায়। লোকবৃত্তবিদেরা এইসব উপাদান-উপকরণ নিয়ে চিন্তিত। এইসব উপাদানেব বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে নিবেদিত। তাই তাদের কাজের মূল্য অসীম। দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে লোকজীবনের বিবর্তন ঘটে। বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতিও বিবর্তিত হয়। নতুন কিছু গ্রহণ করার সময় সে নতুনকে অবিকলভাবে গ্রহণ করতে পারে না। লোকসমাজ তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার সহায়তায় যতোটা গ্রহণ করতে পারে ততোটা গ্রহণ করে। যা গ্রহণ করতে পারে না তা পড়ে থাকে। একবার সমাজে স্বীকৃত হলে তা টিকেও যায়। সচল হতে গিয়েও লোকসংস্কৃতি আধুনিক বা গণসংস্কৃতির বহু উপাদান হজম করতে পারে না। তাই বলা হয়, লোকসংস্কৃতি মননশীল নয়, এর গতিশীলতা বা মোবিলিটি নেই। সরলতা এর স্বাভাবিক ভূষণ।

লোক ও লোকবৃত্ত সম্পর্কে যা বলা হলো তারই আলোকে বাঙলার লোক ও লোকবৃত্ত সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করবো পরবর্তী অধ্যায়ের বাঙালী জীবনে লোকবৃত্তের ভূমিকা পরিষ্কার করতে।

বাঙলার লোকবৃত্তের বিস্তৃত পটভূমি

বাঙলার লোকবৃত্ত বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। এতে পাই সেইসব বস্তু বা সামগ্রী যা জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। নাচ, গান, গীতিকা, সঙ্গীত, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, হেঁয়ালি, ঠাট্টা, রঙ্গরসিকতা, গল্প, কিম্বদন্তী, সৃষ্টি রহস্য, ইতিকথা, নীতিকথা, পশুকথা, যাত্রা, নাটক, মন্ত্রতন্ত্র, পূজা পার্বণ; আচার-আচরণ-ব্যবহার, বিভিন্ন মেলা ও উৎসব, খেলা, ঝাড়ফুঁক, চারু-দারু-কারু ও গার্হস্থ্য শিল্প, অলঙ্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাব, ঘরবাড়ী, গৃহসামগ্রী, গাছ, লতা, পাতা, পশু, পক্ষী, মাছ, চাল, পান, কলা, কৃষিকর্ম, মঠ, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, ধর্ম-সংস্কার-বিশ্বাস, জ্যোতিষ, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, ভাষা, বাকরীতি, বাদ্য, চণ্ডীমণ্ডপ, কথকতা, পোড়ামাটির ভাস্কর্য, কুটিরশিল্প জাত সামগ্রী, তাঁত, বয়ন, রসনার সামগ্রী, ঋতু-নদনদী-চন্দ্র-সূর্য-তারা উৎসব, ছাঁচ, শোলার কাজ, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, শঙ্খের কাজ, কাঁথা, আলপনা, পটচিত্র, মাদুর, হাঁড়ি, কলসী, ঘট, লৌকিক দেবদেবী, পৌষ-করম-ইঁদ-ভাদু-টুসু-নবান্ন, বর্ষবরণ, বর্ষশেষ ইত্যাদি উৎসব, ধন্না, মানত, পীরের উরুস, স্ত্রীআচার, স্বপ্ন, খনারবচন, টোটকা, প্রতীকপূজা, লিঙ্গপূজা, গাজন, বাধনা, ঘেটু, বোলান, আলকাপ, ফকিরী, প্রভৃতি সবই লোকবৃত্তের অন্তর্গত। এর কিছু সাহিত্য বিষয়ক, কিছু বস্তু বিষয়ক। সাহিত্য বিষয়ক উপকরণে মূলের সঙ্গে ভাষা, বাকরীতির চর্চা, মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ, জাতীয় ইতিহাস, সাংস্কৃতিক দিকসমূহ লক্ষ্য করা হয়। বস্তু উপাদানের সৃষ্টিতত্ত্ব, উৎপাদন ও ব্যবহার প্রণালী, সাংস্কৃতিক লক্ষণ প্রভৃতি লক্ষ্য করা হয়। উদ্দেশ্য লোকজীবন, লোকসমাজ সংগঠন, ও সংস্কৃতির মানবিক চর্চা।

লোকসাহিত্যের চর্চায় সাহিত্যের উপাদানের বাস্তবভিত্তি, ভাষা-উপভাষার চর্চার, লোকজীবন, বিবর্তন, সমাজ সংগঠন, সংস্কৃতির রূপান্তর ইত্যাদি জানতে হয়। সংগ্রহ, সংকলন, শ্রেণীচিহ্নিতকরণ, হারানো-খোয়ান শব্দ উদ্ধার, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে হয় বাস্তব, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। লোকসংস্কৃতির চর্চায় বা বস্তু সংস্কৃতির অধ্যয়নে দ্রব্য ও উৎপাদন প্রণালী, ব্যবহারের রীতিনীতি, উৎপাদকের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আনুষ্ঠানিক জীবন, জীবনাভ্যাস প্রভৃতিকেও জানতে হয়।

তড়িৎগতিতে ও অনেকটা এলোমেলোভাবে লৌকিক উপাদান-উপকরণের যে বিবরণ পেশ করা গেল তার সামাজিক ভিত্তি কি তাও জানা দরকার। পূর্বেই বলেছি সাবেক ধারণায় লোক হচ্ছে গ্রামের 'অশিক্ষিত' জনতা, অর্থাৎ চাষী, কৃষক,

বর্গাদার, ক্ষেতমজুর, কামলা, মাইন্দার, দিনমজুর, ঘরামি, বসওয়ালা, গুড়ওয়ালা, গ্রামের দোকানদার, চৌকিদার, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, মালি, বাগাল, রাখাল, গরু-মোষ গাড়ির চালক, তাঁতি, জোলা, জেলে, কলু, মুচি, মেথর, কবিগায়ক, পাঁচালীকার, ছড়াদার, নাচনী, বাউল, বৈরাগী, ফকির, পীর, বাদক, কথক, নর্তক, অভিনেতা, পাচক, যাদুকর, ওঝা, পুরুত, মাঝি, হাতুড়ে-ডাক্তার, ভিখারি, গোয়ালা, খোয়াড়ওয়ালা, সুদখোর, মহাজন, পাইকার, দালাল প্রভৃতি। এদের সঙ্গে এখন এসে যুক্ত হয়েছে শহরের মুটে, মজুর, শ্রমিক, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ড্রাইভার, হকার, ভেণ্ডার, মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, জমাদার, ফুটপাতের দোকানদার, দিনমজুর, মেথর, বস্তীবাসী, ফুটপাতবাসী, শ্রমিকাবাসের বাসিন্দা প্রভৃতি। এদের অনেকেই অক্ষরজ্ঞানহীন কিন্তু ঐতিহ্যসচেতন, পিতৃপুরুষের ক্রিয়াকর্মে আস্থাশীল এবং যূথ বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ডেইলী প্যাসেঞ্জারদের এক পা গ্রামে এক পা শহরে। পরম্পরাগত ঐতিহ্যে ওরাও বিশ্বাসী। স্টেশনের প্লাটফরম, ফুটপাত, শহরতলীর কলোনীতে বসবাসকারীদলও পিতৃপুরুষের কর্মকাণ্ড ও ঐতিহ্যকে মান্য করে চলে। সাম্প্রদায়িক পূজা অর্চনা, পীরের জল, জলপড়া, নুনপড়া, নখদর্শন, হাতচালান, বাটিচালান, বাণমারা, বন্ধন, ধন্না, মানত, ব্রত, উপবাস, উৎসব, অনুষ্ঠান, ভোক্তা, যাত্রা ও সঙে আস্থাশীল। টোটকা, ঝাড়ন, মন্ত্র ও বশীকরনে বিশ্বাসী। বিশ্বাসী নানা প্রকার সংস্কার বিধিনিষেধ ও তার মান্য করতেও।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বহু গ্রামের উন্নয়ন হয়েছে। বন কেটে বসত হয়েছে। পতিত জমি আবাদ হচ্ছে। গ্রামে একদল নতুন ধনীর সৃষ্টি হয়েছে। নতুন ধনীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য কিন্তু তারা শক্তিশালী। তাদের দৃষ্টি শহরের দিকে, নাগরিক সংস্কৃতির দিকে। বসবাস গ্রামে। শহরের সুখসুবিধা গ্রামে বসেও উপভোগ করার দিকে তাদের প্রচেষ্টা থাকে। সুবিধাবাদী শ্রেণীরও সৃষ্টি হয়েছে যারা দাদাদের কাছে কেঁচো, দুর্বল সর্বহারাদের কাছে ম্যানইটার। গ্রামের ঐতিহ্যানুগত আচারানুষ্ঠানের মধ্যেও তারা শহরেয়ানা আমদানি করতে, গ্রামে শহরের জলসা জাতীয় অনুষ্ঠান প্রবর্তন করতে সচেষ্ট। শহর থেকে লোক নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের ব্যাপারে গ্রামবাসীদের অবহিত করাতে। গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে নাগরিক সংস্কৃতির বিবাহে তারা চেষ্টিত শালীন হবার ইচ্ছায়। এই শ্রেণীর লোক গ্রামবাসী হলেও অথবা নিরক্ষর হলেও আধুনিক চেতনায় লোক সমাজভুক্ত নয়। আবার শিক্ষিত লোকের কোন রচনা, কোন গান

বা উৎপাদিত দ্রব্য যদি গ্রামের বা শহরের লোকসমাজ নিজস্ব সৃষ্টি বা বস্তু বা দ্রব্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে, তবে তাকেও লোকবৃত্ত বলতে বাধা নেই। অর্থাৎ এখন আর গ্রাম বা শহর এবং নিরক্ষর বা অক্ষরজ্ঞানকে লোক চিহ্নিত করণের কষ্টিপাথর হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। দ্বন্দ্ব এখানে।

এই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণের আশায় কোন কোন বিদ্বানী লোকসমাজকে 'সোসাল গ্রুপ' বলে চিনতে চান। অনেকে আবার তাদের 'স্পীচ কমানিটি' বলে চিহ্নিত করেন আবেগপ্রধান 'লোক' শব্দটিকে এড়িয়ে যাবার জন্য। সমাজবিজ্ঞান বিদ্যাপীঠের লোকবৃত্তবিদদের এ প্রস্তাব অনেকেই মানেন না। যদিও ভাষা সম্প্রদায় বা বাক-রীতি নিয়ে সকলকেই কাজ করতে হয়।

লোকবৃত্তের চর্চায় একদিকে যেমন নিরীক্ষণ, ক্ষেত্র-নিরীক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজন, তেমনি অন্যদিকে প্রয়োজন তাত্ত্বিক আলোচনা। ক্ষেত্র-নিরীক্ষার ব্যাপারে বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা নেই, তা কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত "লোকবৃত্ত : ক্ষেত্র নিরীক্ষার মূলসূত্র' গ্রন্থে আলোচিত। তত্ত্বগত চিন্তা পরিষ্কার না হলে ক্ষেত্র-নিরীক্ষক ও সংগ্রাহক গুদামদারে পরিণত হন। একথাটা পরিষ্কার করার জন্য আরও কিছু কথা বলে নেবো।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লোকবৃত্তের বৈজ্ঞানিক তল্লাশি আরম্ভ হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের প্রসার, জনযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বিস্তারের সংবাদ পরিবেশনে, ও পরিবার পরিকল্পনার অপরিহার্যতা জানান দিতে লোকবৃত্তের ব্যবহারিক মূল্য বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র। জাতি-সংঘ এ শতকের ষাট দশক থেকে এ সম্পর্কে বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তবে জাতিসংঘের প্রস্তাব গ্রহণের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষ এদিকে নজর দিয়েছিল। ১৯৫৪ সনেই ভারত সরকার জনযোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ঐতিহ্যানুগত বা লৌকিক মাধ্যমসমূহকে মেনে নিয়ে সংগ, ডান্স ও ড্রামা ডিভিশন গঠন করেন। তখন থেকেই লোকবৃত্ত চর্চায় লৌকিক মাধ্যম ভারতবর্ষে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এখন লোকবৃত্ত চর্চায় লোকজীবনও বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। সঙ্গে সঙ্গে 'লোক'-দের বিস্তৃতি ঘটেছে। এদেশে এই 'লোক'-দের সংখ্যা এখনও শতকরা সত্তরজনের বেশী। কিন্তু তারা খণ্ডিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

জীবন সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত কোন মানুষ এখন আর আগেকার মতো অবসর ভোগ করতে পারে না। যন্ত্র উৎপাদিত দ্রব্যাদি সহজলভ্য হওয়ায় আয়াসসাধ্য লৌকিক

শিল্প সামগ্রীর চাহিদা কমে চলেছে। কৃষি-শ্রমিক শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক-মজুরে পরিণত হচ্ছে। তাতে এই সমাজ বৃত্তিচ্যুত হতে বাধ্য হচ্ছে। তার উপর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার হয়ে চলেছে, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি হচ্ছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কৃষিশিক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপিত হচ্ছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা, বেতার, দূরদর্শন, ছায়াছবি প্রভৃতিও কিছু কিছু গ্রামবাসী উপভোগ করতে পারছে। তাতেও গ্রামীণ জীবন ও সমাজ আন্দোলিত। তাই আগেকার দিনে তাঁত চালাতে-চালাতে, সুতো কাটতে-কাটতে যে গান গাইতো এখনকার বিদ্যুৎ-চালিত তাঁতের তাঁতি ও হাতে সুতো কাটনদার আর সে গান গাইতে পারছে না। নবজাতকের জন্মলগ্নে নারীসমাজ যে গান গাইতো, আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করতো, আঁতুড়ঘর উঠে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও হাসপাতালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দরুন তাতেও টান ধরেছে। বারোমাসের তেরো পার্বণের বহু পার্বণ এখন বারোয়ারী অনুষ্ঠান। বিবাহের স্ত্রী-আচার ক্রমসংক্ষেপিত হয়ে চলেছে। পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানের সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণেও শৈথিল্য এসেছে। বহু অনুষ্ঠান সাবেক চরিত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই, তা নিয়মরক্ষা করার ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। গ্রামে বিদ্যুতের আগমনে ভূতেরাও নাকি পালিয়েছে। যাদু, ম্যাজিক, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, প্রভৃতিও অনেককে আগের মতো মাতাতে পারছে না। কিন্তু এ ধরনের গ্রাম কটি? এটা মোটেই সারা বাঙলার গ্রামের চরিত্র নয়। শহর ও শহরতলীর আশেপাশের গ্রামসমূহের চরিত্রের সঙ্গে শহর থেকে দূরে, অনেক দূরের গ্রামের চরিত্র আলাদা। এবং শহর ও উন্নত গ্রামসমূহের লোকাচরণে কিছু পরিবর্তন হলেও ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত চিন্তা-চেতনায় ধ্বস নামে নি। সংক্ষেপিত বা নিয়মরক্ষার জন্য হলেও সকলকেই নানা আচার-আচরণ প্রতিপালন করতে হয়। সাম্প্রদায়িক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান মান্য করতে হয়। তেলপড়া, নুনপড়া, হাতচালান, বাটিচালান, মানত, ধন্না, ঝাড়ফুঁক, ওঝা, পীরের জল, মেলাখেলা, ব্রতানুষ্ঠান, আরোগ্যে দেবদেবীর পূজা, স্ত্রী-আচার সংস্কার-বিশ্বাস, কুদৃষ্টি, ডাইনী, বাধা, যাত্রা, গল্প, কথা, নাচ, গান প্রভৃতি প্রায় আগের মতোই অব্যাহত রাখতে হয়।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার, প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি, আধুনিক উন্নত জীবনধারার কোন শক্তিই প্রকৃতিকে বাগে আনতে পারছে না। সে সাবেক মন নিয়ে আপনার খেলা খেলে চলেছে—ভাঙচোর করছে, গড়ছে, প্লাবিত করছে, মরুভূমি বানাচ্ছে। খরা ও অতিবৃষ্টি, নদনদীর ফোঁসফোঁসানি, ভূমিকম্প প্রভৃতি রোখবার জন্য এখনও মানুষকে

প্রকৃতি তোয়াজ করার সাবেক চিন্তার দ্বারাই শাসিত হতে হচ্ছে। লোকসমাজ এখনও প্রকৃতি-নির্ভর, অদৃশ্যশক্তি-নির্ভর, শুভ এবং অশুভ চেতনা-নির্ভর। প্রকৃতির কৃপা পেতে গিয়ে এখনও লোকসমাজকে প্রকৃতি পূজা, নদনদী পূজা, লিঙ্গপূজা, মানত, ধর্ম্না, নাচগান স্তব-স্তুতি করতে হয়। কলেরা-বসন্ত-মহামারীর হাত থেকে উদ্ধার পেতে মনসা শীতলা-কালী-চণ্ডী ও গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা দিতে হয়। ভাগ্য নির্ভরতা থেকে, অদৃষ্ট নির্ভরতা থেকে অনাচারী কাজকর্ম করা হয় না। ভাগ্য দেবতাকে প্রসন্ন রাখার জন্য নানা আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। সন্তান লাভার্থে, পুত্র লাভার্থে, আকাঙ্ক্ষিত স্বামীর প্রার্থনায়, বর্ষার আহ্বানে বা বর্ষা থামাতে, সাফল্য অর্জনের জন্য কত আচার কত অনুষ্ঠান কত ব্রত ইত্যাদি এখনও অনুষ্ঠিত হয় তার সঠিক সংবাদ সংগ্রহ সহজ নয়। শনি দেবতার পূজা বেড়ে চলেছে। বেড়ে চলেছে ভোলাবাবার ভক্তের সংখ্যাও। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আচার-সংস্কার-বিশ্বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে সাংস্কৃতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ আচার-অনুষ্ঠানাদি। মেলাখেলা, নাচগান, লোক-নাটক-কবিগান-পাঁচালী, কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত নানা আচরণ-অনুষ্ঠান, গবাদি ও গৃহপালিত পশুপক্ষীদের হিতার্থে নানা অনুষ্ঠান, উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির অনুষ্ঠান ইত্যাদি। নারী, জমি ও পশু ইত্যাদির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির লৌকিক প্রচেষ্টার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে মানুষের উর্বরাশক্তি হ্রাসে সরকারী প্রচেষ্টা। মানুষের উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির লৌকিক প্রচেষ্টা সরকারীভাবে অবহেলিত—পরিবার পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিক চিন্তা লোকসমাজকে এখনও প্রবুদ্ধ করেনি। লোক সমাজের বাকরীতিতে এখনও পুরাতন ঢঙ। তাদের রঙ্গরসিকতা-ঠাট্টা-হাবভাব-ব্যবহারে, অভ্যাসে-আচরণে লৌকিক মেজাজ স্পষ্ট। ঠিকুজী-কোষ্ঠী, হস্তরেখা বিচার, ভাগ্য-গণনা প্রভৃতি এবং ডাইনী ভূতেরা প্রায় পূর্বের চেহারা নিয়েই বহাল আছে।

সঠিক কাজের জন্য প্রয়োজন সুস্থ উদ্যম ও প্রত্যয়

প্লাটো যেমন বলেছেন "**Knowledge of astronomy is a necessary part of one's education**", তেমনি বলা যেতে পারে লোক, লোকবৃত্ত ও লোকজীবন সম্পর্কে অনবহিত যে শিক্ষা তা সম্পূর্ণ নয়, আংশিক শিক্ষা। লোকবৃত্ত, লোকজীবন, লোকমানস ইত্যাদি জানতে গিয়ে পুরাতন ভাবনাচিন্তা আঁকড়ে থাকলে বা রক্ষণশীলতা

ও গোঁড়ামীর দ্বারা চালিত হলেও চলে না। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই বিবর্তিত হয়। বিবর্তিত হয় লোকবৃত্ত, লোকসমাজ এবং 'লোক' অভিধাযুক্ত সব কিছুই।

আধুনিক চিন্তায় 'লোক' শহরেও বিচরণ করে। আবার নিরক্ষর গ্রামবাসীদের সকলেই 'লোক' নয়। এই পরিবর্তন ও বিবর্তনকে জানতে হয়। লোকবৃত্ত চর্চার নিয়মশৃঙ্খলা, পদ্ধতি-প্রকরণকে বুঝতে হয়। কিন্তু যাঁরা আকস্মিকভাবে 'লোক পণ্ডিতে' পরিণত হয়েছেন (got into the discipline through Lucky Accidents, Motif. No 400) তাঁরা হয় এ ব্যাপারটা বোঝেন না, নয় তলিয়ে দেখতে চান না। যাঁরা বিষয়টা বোঝেন, যাঁরা বিষয়কে ভালবাসেন, তাঁরা যদি কোন দুর্ঘটনাহত হয়েও লোকবৃত্ত চর্চায় মনোনিবেশ করেন (Unlucky Accident Motif No. 300), তবেও তাঁরা কাজের কাজ করতে পারেন। তাঁদের বোধ ও বুদ্ধি, উদ্যম, প্রেম ও ভালবাসা সঠিক বস্তু পাইয়ে দেয়।

কোন সংস্কৃতি জাতি বা গোষ্ঠী ভুইফোঁড়ের মতো অকস্মাৎ গজিয়ে ওঠে না। দীর্ঘদিনের সাধনা ও সৃষ্টির সংরক্ষণের দ্বারা জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে, রক্ষিত হয়। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা নিবিড়ভাবে রক্ষিত আছে তার লোকবৃত্তে। যুগে যুগে গ্রহণ-বর্জনের পথ ধরে সে এগিয়েছে। গ্রহণ করেছে আদিম জাতিসমূহের কাছ থেকে, সভ্য সমাজের নিকট থেকেও। দিয়েছেও তাদের অনেক কিছু। বর্জনও করেছে অনেক সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে। এই গ্রহণ-বর্জন কিভাবে সাধিত হয় লোকবৃত্তশাস্ত্র তার হদিস দেয়। ঐতিহাসিক, নৃ-পুরাতাত্ত্বিক, ভাষা-সমাজ-রাষ্ট্র-মনো-বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক চেতনায় পুষ্ট হয়ে লোকবৃত্তবিদ লোক-বৃত্তের চর্চায় সাফল্য অর্জন করেন। তার জন্য সাধনা দরকার, আত্মত্যাগ দরকার। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবাদী কথা 'যবে জন্মাইলা তবেই কালিদাস হইলা' লোকবৃত্তের চর্চায় অসম্ভব।

লোকবৃত্ত-গবেষককে অজানা তথ্যের সমুদ্রে নিয়ে যায়, সত্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করে। শিক্ষিত সংস্কৃতিতে যেসব জিনিষ পাওয়া যায় না, শিক্ষার শালীনতার-সভ্যতার প্রচ্ছদে যেসব কথা ও ব্যাপার জড়িয়ে রাখা হয়, নিরক্ষর সহজ সরল ও পরম্পরাগত ঐতিহ্যপুষ্ট লোক সংস্কৃতিপুষ্ট সাধারণ মানুষ অনায়াসে তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে। এবং স্মৃতিচারণের সময় গল্প, কথা, গান, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদের সাহায্যে বা অন্যভাবে বৃহত্তর সমাজের কাছে তা পরিবেশনও করতে পারে। এই

ধরনের উপকরণ বা দ্রব্য বহু অজানা তথ্য জানিয়ে দেয়। এই তথ্যে অনেক সময় সত্য ও কল্পনা মিশে থাকে। সত্যসন্ধ গবেষক কল্পনা অংশ বাদ দিয়ে সত্য অংশ গ্রহণ করেন। সেজন্য সত্য ও কল্পনা চেনার বোধ, বুদ্ধি, চেতনা ও শিক্ষার দরকার হয়।

রবীন্দ্রনাথের আগে বাঙলার লোকসাহিত্যের শক্তির কথা, সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তার কথা, আন্তরিকতা ও মানবিকতাবোধ নিয়ে আর কেউ ভাবেন নি। তবে লোকগল্প অনেক আগে থেকেই সংগৃহীত হয়েছে, সংগৃহীত হয়েছে প্রবাদ প্রবচন-আদিও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগের সংগ্রাহক-গবেষকেরা একক। রবীন্দ্রনাথ একটা প্রতিষ্ঠান, নানা দিকের নানা গবেষক ও বিদ্বানদের উৎসাহ উদ্দীপনা জুগিয়ে মহৎ। এঁদের সকলের চেতনা ও মান এক ছিল না। তাই শিশু সাহিত্য হিসাবে গল্প ও ছেলেভুলানো ছড়ার সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু লোক এমন কিছু ভেজাল আমদানী করেছেন যা লোক বিজ্ঞানীদের আফশোষের কারণ হযেছে। লোকবৃত্তের বাস্তব ভিত্তি ও পরিপ্রেক্ষিত সঠিকভাবে না বোঝার জন্য এ কাজটি ঘটেছে। তবু অগ্রজদের দোষারোপ করে লাভ নেই। কেননা, এখন অবধি যেখানে লোকবৃত্তের বাস্তবভিত্তি ও পরিপ্রেক্ষিত পরিষ্কার করা যায় নি গবেষকদের কাছে, উৎসাহী মানুষদের কাছে, তখন অগ্রগামী গবেষকদের চরিত্র হননে যারা উৎসাহ পায় তারা মতলববাজ। তারা কিছু না করে কিছু না বুঝে বাহাদুরী দেখাতে চায়।

লোকবৃত্তকে যদিও বলা হয়েছে মানবজীবনের পুরাবৃত্ত, তবু এর মধ্যে উৎখননে আবিষ্কৃত বস্তু বা দ্রব্য যেমন হাঁড়ি, কলসী, হাতিয়ার, সীল, মূর্তি, মুদ্রা প্রভৃতি পাওয়া যায় না। লোকবৃত্তের মারফৎ প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্যানুগত সমাজকে জানতে হলে পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয়ই। রবীন্দ্রনাথ লোকবৃত্তের গুরুত্ব বুঝেছিলেন বলেই নিজে সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ করেছেন ; অন্যদের উৎসাহিত করেছেন সংগ্রহ, সংকলন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে লেগে যেতে। তিনি মূলত লোকবৃত্তের ভাব ও রসের মধ্যে ডুব দিয়েছিলেন, এর বিজ্ঞান-ভিত্তি খোঁজার ব্যাপারে নিজেকে বা অন্যকে অনুপ্রেণিত করেন নি। লোকবৃত্ত চর্চার এই দুর্বলতা এখনও আমাদের মধ্যে থেকে গেছে। তাই অনেকেই তাত্ত্বিক আলোচনায় ভয় পান, তাত্ত্বিক আলোচনা না করার কারণ হিসাবে যুক্তি দেখান আমাদের সংগ্রহ আংশিক, সম্পূর্ণ নয়। আংশিক সংগ্রহের বিজ্ঞান ভিত্তি সুস্পষ্ট নয়। এমতাবস্থায় এই উপকরণের উপর নির্ভর করে তাত্ত্বিক আলোচনা অসম্ভব।

লোকবৃত্তের সংগ্রহ যে আংশিক তা সত্য। এবং এই সংগ্রহ কোনদিনই সম্পূর্ণ হবে না, হতে পারে না, তাও সত্য। কারণ লোকবৃত্ত প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে, তা অমর। লোকবৃত্তের ধ্বংস নেই। তাছাড়া যে আংশিক সংগ্রহ ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা এত ব্যাপক ও বহুধাবিস্তৃত যে অন্য বহু দেশের সম্পূর্ণ সংগ্রহের চেয়ে (যদি কোন দেশে সংগ্রহ সম্পূর্ণ হযে থাকে) তা কম নয়। অন্যদিকে যে সংগ্রহকে অবৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিহীন বলা হচ্ছে সেই রকম অবৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান-ভিত্তিহীন কাজের উপর নির্ভর করে বিদেশে তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে। লোকবৃত্ত শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-প্রকরণ নির্দিষ্ট হবার আগে যত সংগ্রহ সবই সংগ্রাহকদের খেয়ালখুশি ও মর্জি-নির্ভর ছিল। পৃথিবীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রীমগল্পের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে বহু আধুনিক লোকবৃত্তবিদ্ মনে করেন না। সংগৃহীত গল্পকে মার্জিত করার ফলে এই গল্পের আদিরূপ পরিমার্জিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নষ্ট হয়েছে লালবিহারীদের "ফোকটেলস অব বেঙ্গল", উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "টুনটুনির বই" প্রভৃতিরও। এরাও মার্জিত। কিন্তু এই ধরনের সংকলনে যে উপাদান আছে তা কি বর্তমান প্রজন্মের গবেষক ও বিদ্বানকে আলোকিত করে না? এই সমস্ত উপাদান-উপকরণের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক সংগ্রহকে নিয়ে এগোনো গেলে তত্ত্বীয় আলোচনা বোধহয় অসম্ভব নয়।

বিশ্বের কোন দেশের অগ্রগামী সংগ্রাহকেরাই বর্তমান বৈজ্ঞানিক মানে লোকবৃত্ত সংগ্রহ করেন নি। কারণ, তখনো এ মান নির্দিষ্ট হয় নি। পুরাতন সংগ্রহের সঙ্গে আধুনিক সংগ্রহকে নিয়ে উন্নতিশীল দেশে যে আলোচনা চলছে তা আমাদের বিদ্বান ও গবেষকদের অনুপ্রাণিত করতে পারে ঠিকই, কিন্তু তাত্ত্বিক করতে পারে না। তত্ত্বীয় আলোচনায় ঘিলুর দরকার। মগজকে সঠিক পথে চালনা করতে জানতে হয়।

লালবিহারী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র, গুরুসদয়, শরৎচন্দ্র মিত্র, কালীপদ মিত্র, শরৎচন্দ্র রায়, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, হরিদাস পালিত. বিনয়কুমার সরকার, শিবরতন মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, সুশীলকুমার দে, সুকুমার সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, নীহাররঞ্জন রায়, মনসুর উদ্দীন, জসীম উদ্দীন, অবনীন্দ্রনাথ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুধীররঞ্জন দাস, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অজিত ঘোষ. অজিত মুখার্জি, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, মযহারুল ইসলাম, আশরাফ

সিদ্দিকী, চন্দ্রকুমার দে, কেদার মজুমদার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মীনেন্দ্রনাথ বসু, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, কামিনী রায়, নির্মলেন্দু ভৌমিক, সুধীর করণ, হরিপদ চক্রবর্তী, প্রবোধকুমার ভৌমিক, অতুল সুর, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, ভোলানাথ ভাচট্টার্য, পীযুষকান্তি মহাপাত্র, চিত্তরঞ্জন দেব, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বিনয় ঘোষ, তারাপদ সাঁতরা, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁদের সংকলন, সগ্রহ ও আলোচনার দ্বারা লোকবৃত্তের বিভিন্ন দিকের কথা তুলে ধরেছেন। বাঙলার মাটি, মানুষ, 'সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিচয় প্রদান করেছেন। লোকবৃত্তের সাহিত্য-ইতিহাসের চেতনার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে নৃ-সমাজ বিজ্ঞানীর এষণা। সকলেই ক্ষেত্র-নিরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন পদ্ধতির কথা বলছেন। যতো বলছেন ততো কাজ করছেন না। এর সঙ্গে কিছু প্রগতিবাদী রাজনৈতিক কর্মী বস্তুবাদী চিন্তা আনয়নে উৎসাহ দেখাচ্ছেন। জনজীবনে লোকবৃত্তের ভূমিকা লক্ষ্য করার ইচ্ছায় শ্রমিক মধ্যবিত্ত-কৃষক আন্দোলনে লোকবৃত্তের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অর্থাৎ মে-দিবস, স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ এবং তেভাগা আন্দোলনে লোকবৃত্তের প্রভাব বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি যে "লোকবৃত্তের অন্য দিগন্ত" প্রকাশ করেছি সেখানে কিছু তাত্ত্বিক বক্তব্যও উপস্থাপিত করেছি। অনেকে এখন প্রচার ও জনযোগাযোগের মাধ্যম হিসাবেও লোকবৃত্ত চর্চায় উৎসাহ দেখাচ্ছেন। ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। পেয়েছে সরকারী স্বীকৃতিও। তাই কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের তথ্য দপ্তর গান, নাচ ও নাটক সংস্থা, লোকরঞ্জন শাখা, সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, ম্যাস কম্যুনিকেশন সেণ্টার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। বেতার, দূরদর্শন, সিনেমা মারফৎ লোক সংস্কৃতি প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে কোন না কোন ভাবে লোকবৃত্তকে যুক্ত করা হয়েছে। তবু বিষয় নির্দিষ্ট মানে উন্নীত হতে পারছে না। লোকবৃত্তের শিক্ষা যাঁদের দ্বারা গতি পাবে তাঁরা সকলেই ব্যাপারটা সঠিকভাবে বোঝেন তারও কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং বিষয় খুঁড়িয়ে চলবে, বৃহত্তর বুদ্ধিজীবীদের কাছে খাটো বিবেচিত হবে, পরিকল্পনা ও কর্মরীতি-পদ্ধতির সংঘাতে অধ্যয়ন গতিহীন হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি!

বিষয় হিসাবে লোকবৃত্তের গুরুত্বের সরকারী স্বীকৃতি আসে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করার সময় জনগণের কাছে উন্নয়ন ও পরিকল্পনার বাণী পৌঁছে দেবার একটি পথ হিসাবে লোকবৃত্ত ও লোকজীবনকে

সঙ্গে নিয়ে এগোবার কথা বলা হয়েছে ১৯৫২ সালে। প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার অষ্টম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "An understanding of the priorities which govern the plan will enable each person to relate his or her role to the larger purposes of the nation as a whole. The plan has therefore, to be carried into every home in languages and symbols of the people" জনগণের নিজস্ব ভাষা, বাকরীতি এবং প্রতীক সঠিক ভাবে বুঝে সেই ভাষা ও প্রতীকের মারফৎ জনগণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে হলে লোকবৃত্তের মারফৎ না গিয়ে উপায় নেই। সেজন্যই লৌকিক উপাদান-উপকরণকে প্রচার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। নাচ, গান, নাটক, পুতুল নাচ, তরজা, টপ্পা, কবিগান, পাঁচালী, প্রভৃতির সাহায্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কথা জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরার কথা বলা হয়েছে। লোকশিল্প ও কলাকে এবং লোকশিল্পীদের উৎসাহ দানের নিমিত্তে নানা প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে। আদিবাসী ও উপজাতি গোষ্ঠীসমূহকে নিজস্ব জীবনধারা বাঁচিয়ে চলার জন্য অনুপ্রেরিত করতে আলাদা বিভাগ ও নানা প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। এত সবের পরেও বিষয়টা কতদূর এগিয়েছে? লোকসমাজ কতটা উপকৃত হয়েছে?

১৯৫৪ সনে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক সঙ্গীত-নাটক বিভাগ খোলেন। ১৯৬০ সনে তা স্বয়ংশাসিত সংস্থা। এই সংস্থা 'ট্রাডিশনাল মিডিয়া' নিয়ে কাজ করার দায়িত্ব পায়। কিন্তু তাদের কাজে ট্রাডিশনাল মিডিয়ার যে গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল তা পায় না। বয়স্ক-শিক্ষার ব্যাপারে লোকবৃত্তকে কাজে লাগাবার জন্যও সরকারী সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১৯২৬ সনে। বয়স্ক-শিক্ষার পরিকল্পনায় ১৫-৩৫ বৎসরের ১০০ মিলিয়ন নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষিত করতে লোকবৃত্তকে হাতিয়ার করে এগোবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাজ কতটা কি হয়েছে জানি না। ১৯২৬ দশকে তৃতীয় দুনিয়ার সর্বত্র লৌকিক মাধ্যম সমূহকে জনশিক্ষা জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যবহার করার নির্দেশ দেয় ইউনেস্কো। তার ফলে এদেশে যেভাবে এর ব্যবহার হচ্ছে তাতে বিষয়কে অপব্যবহার করা হচ্ছে—"to promote the development of national leaders, rather than the development of national policy and programmes." পশ্চিমবঙ্গেও এ জিনিষই ঘটছে। এখানকার রাজ্য-সরকারও লোকসংস্কৃতি-র চর্চায় এগিয়ে এসেছেন বলে প্রচারে দেখি। এখানে-ওখানে কিছু কিছু সেমিনার ইত্যাদিও হচ্ছে।

তাতে বিষয় বা মানুষ অর্থাৎ লোকবৃত্ত বা লোকসমাজ কে কতটা উপকৃত হয়েছে তার টের পাই না। এ ভাবেই লোকবৃত্তের চর্চা এগিয়ে চলেছে—ভারতে, পশ্চিমবঙ্গেও। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য সেই একই নৈরাজ্য সরকারী কাজকর্ম ও বিবেচনায় এবং লোকবৃত্ত ও লোকজীবন অনুশীলন অধ্যয়নে।

মনে রাখতে হবে লোকবৃত্ত চর্চার সূত্রপাত হয় গত শতকে ব্রিটেনে। ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে সহজেই ব্রিটিশ লোকবৃত্তবিদদের চিন্তাচেতনা এদেশে চলে আসে। সিবিলিয়ান, পাদরী ও কর্তাদের প্রিয়পাত্রদের চেষ্টায় অনেক উপাদান-উপকরণও সংগৃহীত হয়। লোকবৃত্ত ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী বিদ্বান ও রাজনৈতিক নেতাদের আকৃষ্ট করে। জাতীয়তা বৃদ্ধির আন্দোলনে নানাভাবে লোকবৃত্তকে ব্যবহার করা হতে থাকে। রাজনৈতিক সংগ্রামের মোড় ঘুরতে থাকলে শ্রমিক কৃষক আন্দোলনকে জনজীবনমুখী করতেও লোকবৃত্ত কাজে আসে। লোকবৃত্তের শক্তি হৃদয়ঙ্গম করা গেলে অশিক্ষা, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, মদ্যপান, কুসংস্কার, সমাজ সেবার নানা আন্দোলনে লোকবৃত্ত এসে যায়। নারীশিক্ষা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলনে, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে লোকবৃত্তের ব্যবহার হতে থাকে। তবু বিষয়কে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যয়ন-অনুশীলনের বিষয়ে পরিণত করা যায় না। যদিও "From the point of view of its great appeal to the masses and its quality of touching the deepest emotions of the illiterate millions, the medium of song and drama is matchless." এই সিদ্ধান্ত অনেকটা যুদ্ধজয়ের চালাকি। কোন রকমে জনগণকে বোকা বানিয়ে কার্যহাসিলের চেষ্টা। বিষয়কে ভালবেসে, বিষয়কে বুঝে বিশেষ নির্দিষ্ট গতিপথে লোকবৃত্তকে চালনা করার প্রচেষ্টা দেখা যায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর কিছু নিঃস্বার্থ ব্যক্তির চেষ্টায়। বিষয়টা এগিয়ে যাবার জন্য যখন একটা গতি পাবার মুখে তখন একদল আত্মম্ভরী, স্বার্থপর ও আংশিক সময়ের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির অদ্ভুত আচরণ এবং ঘোট পাকাবার চেষ্টা বাঙলার লোকবৃত্ত আন্দোলনকে একটি বিশিষ্ট ধারা থেকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারায় প্রবাহিত করেছে। ঐক্য ভাবনাকে অনৈক্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাতে বাঙলার ক্ষতি হয়েছে। নিজেরাও খুব কিছু লাভবান হয়েছে বলে তো মনে হয় না। যাদের নিজেদেরই জাতীয়তার চেতনা নেই তারা লোকবৃত্তের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা দেখবে কি করে?

যে দেশের শতকরা সত্তর শতাংশ লোক লোকবৃত্ত শাসিত সেদেশে লোকবৃত্ত একটা মহান মর্যাদা পাবে এটা আশা করা গিয়েছিল। এখনও তা পায়নি। পায়নি শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদের জন্য। সরকারী চাটুকারদের জন্য। কিছু অবুঝ কিন্তু বিশেষজ্ঞ সরকারী আমলার জন্য। উপযুক্ত চর্চার ব্যবস্থা করে বিষয়কে সমুন্নত করা যায় নি। প্রচার মাধ্যম হিসাবে যাঁরা লোকবৃত্ত চর্চায় উৎসাহ দেখালেন তাঁরাও বিষয়টাকে বুঝতে না পেরে যেমন খুশি তেমন চললেন। অথচ প্রচার মাধ্যম হিবাবে এর গুরুত্ব যে অসীম তা বোঝাই যাচ্ছে। ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের ১৯২৬ সনের বাৎসরিক প্রতিবেদনে প্রকাশ ভারতবর্ষের নথিভুক্ত সংবাদ ও সাময়িকপত্রের সংখ্যা ১১৬৩১টি। বেতার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৭ সনে, ১৯৪৮ সনে আকাশবাণী ৬টি কেন্দ্র নিয়ে কাজ আরম্ভ করে। ১৯২৬ সনে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৪ এবং দুরদর্শন স্থাপিত হয় ১৯৫৯ সনে দিল্লীতে, ১৩ বছর বাদে বোম্বেতে। তারপর কলকাতায়। ১৯২৬ পর্যন্ত দুরদর্শনের ১৪টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ১৯৪৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় ফিল্ম ডিভিশন। শিক্ষিত এবং ক্রয়ক্ষমতাযুক্ত মানুষ শহর ও নগরকে কেন্দ্র করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরাই ছায়াছবি, আকাশবাণী ও দূরদর্শনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদা মেটাবার জন্য যে ধরনের লোক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তা লোক সমাজকে মাতাতে পারে না। ঐ সময়ে সারা ভারতবর্ষে যে ৯০০০ সিনেমা হল ছিল তার তিনভাগের দুভাগ দক্ষিণভারত ও মহারাষ্ট্রে স্থাপিত। ভারত-বর্ষের অন্যান্য স্থানে যে স্বল্পসংখ্যক সিনেমা হল আছে তা শহর এবং শহরতলিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তাই আকাশবাণী দুরদর্শন, ছায়াছবি লোকসমাজকে মাতাতে পারে না। লোকসমাজকে মাতাবার জন্য তাদের নিজস্ব ভাষা, বাকরীতি ও প্রতীকের দরকার হয়ই। এই ভাষা, বাকরীতি ও প্রতীককে সঠিকভাবে ব্যবহার করা না গেলে অনেকটাই ভস্মে ঘি ঢালার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। লোকসমাজ আধুনিক প্রচার যন্ত্রের দ্বারাও খুব একটা লাভবান হচ্ছে না। অক্ষরজ্ঞান না থাকার জন্য যেমন সাময়িক ও সংবাদপত্র তাদের চাহিদা মেটাতে পারে না, তেমনি শহরের শিল্পী ও বাবুদের 'পাঞ্চ' করা উপাদান-উপকরণও তাদের তৃপ্তি দিতে পারে না। নিজেদের অদ্ভুত কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করার জন্য একশ্রেণীর গবেষক ও তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু আমলা প্রচার করে চলেছেন গ্রাম পরিবর্তিত হচ্ছে, লোকসংস্কৃতি ধ্বংসের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রাম পরিবর্তিত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যে গ্রাম পরিবর্তিত হচ্ছে সে গ্রাম

কোন্ শ্রেণীর গ্রাম ? পরিবর্তিত গ্রামেও লোকসংস্কৃতি ঠিক আছে। আসলে গ্রাম ধ্বংস হয়ে চলেছে, গ্রামকে ধ্বংস করা হচ্ছে, ধ্বংস আর পরিবর্তন কি এক কথা ?

শহরে বসে গ্রাম পরিবর্তিত হচ্ছে বলে চীৎকার করলেই কি গ্রামের পরিবর্তন ঠেকানো যাবে ? গ্রাম যে ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং বলেছি কিছু কিছু গ্রাম পরিবর্তিত হলেও গ্রামীণ সংস্কৃতি বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজের কাছে প্রায় একই চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে সব গ্রামে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে নি সে সব গ্রামও পরিবর্তিত হচ্ছে একথা বলা কি ঠিক ? আসলে ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামকে একই নিরিখে বিচার করা যায় না। এখানকার বহু গ্রাম শহরের কাছাকাছি। বহু গ্রামের সঙ্গে রেল, বাস বা অন্যান্য যানবাহনের দ্বারা যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। রেডিও ও বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। প্রযোজন মত সিনেমাও দেখতে পারে কিছু গ্রামবাসী। বহু গ্রাম আছে যা এখনও শহব থেকে দূরে, সভ্যতা থেকে বহু দূরে। শহরের কোন বাতাস, বিদ্যুতের কোন আলো, এই সব গ্রামে এখনও প্রবেশ করে নি। আবার এমন গ্রামও আছে যেখানে কিছু বিদ্যুৎ প্রবেশ করেছে। একটু চেষ্টা করলেই বাস, রেলওয়ের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ কবতে পারে। রোজ না হলেও সাপ্তাহিক হাট বসে। এই তিন শ্রেণীর গ্রামের প্রত্যেকটির চরিত্র আলাদা। সমস্যা আলাদা। গ্রামীণ মানুষদের জীবনচর্যার ধরণ আলাদা। আচার-আচরণ, হাবভাব, আদব-কায়দা, কথা বলার ঢঙ সবই আলাদা। কিন্তু সকলেই গোষ্ঠী ও সমাজবদ্ধ। ঐতিহ্য শাসিত। তাই সমস্ত গ্রামকে শুধু কোন এক ধরনের গ্রাম দেখে বিচার করা যায় না। গ্রামের ডেইলি পেসেঞ্জার—যাদের এক পা গ্রামে, আরেক পা শহরে ; কলকারখানার শ্রমিক-মজুর—যারা প্রত্যহ বা সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামে যায় ; তাদের দেখে, তাদের কথা শুনেও গ্রামকে চেনা বা বোঝা যায় না। গ্রাম ধ্বংস হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে গ্রামীণ সংস্কৃতি, এ কথা যাঁরা বলেন তাঁরা সমগ্র গ্রামকে উপলক্ষ করে তা বললেও তাঁদের চেতনায় সমগ্র গ্রাম ধরা পড়ে না। গ্রামকে সঠিক ভাবে চিনতে হলে শ্রেণীচিহ্নিত করে গ্রাম লক্ষ্য করতে হয়। গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে বসবাস করতে হয়। প্রত্যেকশ্রেণীর গ্রামের আলাদা আলাদা সমস্যার কথা বুঝতে হয়। কিছু গ্রামে বিদ্যুৎ চলে গেছে, আকাশবাণীর খবর শুনতে পাওয়া যায় কিছু গ্রামে, কিছু গ্রামের পথের উপর দিয়ে বাস চলাচল করে, এ সবই ঠিক। কৃষি ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে অনেক গ্রামে। সেচ, বীজ, সমবায় কৃষিঋণ, বর্গা অপারেশন প্রভৃতি কোথাও কোথাও কিছু

অর্থনৈতিক সুবিধা এনে দিলেও গ্রামের মোল চরিত্র অপরিবর্তনীয় থেকে গেছে। নির্বাচনের আগে গ্রামে কিছু কিছু উন্নয়নের বাতাস বইতে আরম্ভ করে। নির্বাচন অন্তে অর্ধসমাপ্ত কাজও সমাপ্ত হয় না। পুরাতন ধারার জীবন—পচা, কাদা, ভুখা নিয়েই অতিবাহিত করতে হয়। হচ্ছেও। এই বৃহৎ জনসমষ্টিকে উদ্দীপ্ত করার ব্যাপারে, জাগরিত করার ব্যাপারে, শিক্ষিত করার ব্যাপারে, তাই লোকভাষা, লৌকিক উপকরণ ও প্রতীক, লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, আমোদ-প্রমোদের বিষয় সমূহ লৌকিক মেজাজে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে কাজ করার জন্য লোকসমাজের সাহায্য ও সমর্থন দরকার। কোন বৌদ্ধিক আবেদন বা চালাকির দ্বারা তা পাওয়া যায় না। লোক সমাজের সাহায্য ও সমর্থন তখনই পাওয়া যায় যখন লোকসমাজকে আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়ে কাজের যাথার্থ্য বোঝানো যায়। এই সমাজের সমর্থন ও আশীর্বাদ না পেয়ে তাদের জন্য 'অনেক কিছু করেছি'—গোছের কাজের দ্বারা যাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান লোক সমাজ তাঁদের করুণা করে। তাই আশুতোষ ভট্টাচার্য পুরুলিয়ার 'ছৌ'-নাচকে জনপ্রিয় করেও পুরুলিয়াবাসীদের অনেকের দ্বারাই নিন্দিত, সমালোচিত। মনে রাখতে হবে গ্রামবাসী দরিদ্র। দারিদ্র্যের অহমিকা প্রচণ্ড। টাকা তাঁরা পেতে চায় জীবন ধারণের জন্য, বিলাস-ব্যসনের জন্য চায় না। অধিক টাকা বা ধনীদের তারা মনে প্রাণে ঘৃণা করে। কারণ, ধন অনেক সময়ই অনর্থের সৃষ্টি করে, মূল্যবোধকে বিকিয়ে দেয়। দরিদ্র গ্রামবাসী প্রাচীন মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত জীবন ধারা, সুস্থ জীবনের চিন্তা ও ধর্মীয় চেতনা শাসিত। অর্থ দিয়ে, জৌলুষ দেখিয়ে, তা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাদের সাহায্য সমর্থন লাভ করার জন্য প্রয়োজন কথায় ও কাজে এক হওয়া। প্রয়োজন আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার দ্বারা তাদের মন পাওয়া। গভীর প্রত্যয় ও নিষ্ঠা নিয়ে এ কাজ করতে হবে।

লোকবৃত্ত কর্মীর দায় ও দায়িত্ব

এখানেই প্রকৃত লোকবৃত্ত কর্মীর দায় ও দায়িত্ব। জনগণের সঙ্গে জনগণের মন নিয়ে, সরলতা নিয়ে, অমসৃণ কঠোরতা ও সত্যকে সঙ্গে নিয়ে মিশতে হবে। তাদের মতো করে তাদের কথা ভাবতে হবে। অন্যথায় সঠিক সংগ্রহ, অকৃত্রিম তথ্য পাওয়া

যাবে না, যায় না। লোক সমাজকে অবজ্ঞা করে লোকজীবন অধ্যয়নে 'বিশেষজ্ঞ' হওয়া যেতে পারে, ডিগ্রী অর্জন করা যেতে পারে, কিন্তু জনমনে ঢোকা যায় না। লোক সমাজের সম্পূর্ণ সহযোগিতা সম্বল করে কিভাবে লোকবৃত্তের চর্চা করা উচিত তা বুঝতে হলে লোক, লৌকিক, লোকবৃত্ত, লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনকে সঙ্গে করে কিভাবে এগোতে হয় এই অধ্যায়ে তা বলার চেষ্টা করেছি।

পরবর্তী অধ্যায়ে বাঙালী জীবনে লোকবৃত্তের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবো সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়কে তুলে ধরার বাসনা নিয়ে।

২.

বাঙালী জীবনে লোকবৃত্তের ভূমিকা

বাঙালীর পরিচয়

যারা বঙ্গ সংস্কৃতির বাহক, যাদের মাতৃভাষা বাঙলা, এবং যারা বাঙলার মাটি আলো-বাতাস-জলে বর্ধিত ও আচার-আচরণ-বিশ্বাস-ধর্ম ও জীবনাভ্যাসে গর্বিত এবং বেশ-বিন্যাস ও আহারে তৃপ্ত তারা বাঙালী।

বাঙলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেছে বাঙলার অগণিত আদিবাসী গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন প্রাক-দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকেরাই বাঙলার আদিম আধিবাসী। তাদের ভাষা ছিল অষ্ট্রিক। দ্রাবিড়ভাষীদের আগমন হয় দ্বিতীয় স্তরে। তৃতীয় স্তরে আসে আর্য ভাষাভাষি নরগোষ্ঠী। এই নবগোষ্ঠীর লোকেরা সহজে প্রাচ্যদেশে স্থান পায় না। স্থানীয় অধিবাসীদের বিভিন্ন সংগ্রামে হারিয়ে তারা প্রাচ্যবাসীকে বশে আনে।

আর্য ভাষাভাষিরা দুটি নরগোষ্ঠীর লোক—(১) আলপীয এবং (২) নরডিক, পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন মধ্য এশিযার পর্বতমালার নিকটবর্তী কোন স্থানে আলপীয় গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। নরডিকেরা ছিল উত্তর এশিয়ার তৃণভূমির অধিবাসী। উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে আলপীয় নরগোষ্ঠীর যোগ আছে বলে নৃতাত্ত্বিকদের অনুমান।

উত্তর ভারতে নরডিক নরগোষ্ঠীর লোকেরা প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাঙালী আর্য ভাবধারায অবগাহন করলেও উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখে। তার স্বকীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য উত্তর ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য থেকে কিছু স্বতন্ত্র। যেমন বাঙালীর অন্যতম প্রধান খাদ্য মাছ, উত্তর ভারতীয়দের মাংস। বৈদিক আর্যরা গোমাংস খেতেন বলেও উল্লেখ আছে। কিন্তু অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী লোকেরা গোমাংস খেতেন না। গরুকে তাঁরা দেবতা ও মাতার আসনে বসিয়েছেন। পোষাক-পরিচ্ছদ-ভাষা-আচার-আচরণ পূজার্চনা এবং ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে, লৌকিক ক্রিয়াকর্ম ও আচারের মধ্যেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। ড. অতুল সুর 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাসে' লিখেছেন—"অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ধর্মীয় সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত ছিল মৃত্যু-উত্তর জীবনে বিশ্বাস, পিতৃপুরুষগণের পূজা, কৃষি সম্পর্কিত অনেক উৎসব, যেমন—পৌষপার্বণ, নবান্ন প্রভৃতি, মেয়েদের

দ্বারা পালিত অনেক ব্রত এবং ধর্মীয ও সামাজিক অনুষ্ঠানে চাউল, দুধ, কলা, হরিদ্রা, সুপারি ও পান, নারিকেল, সিঁদুর, কলাগাছ প্রভৃতির ব্যবহার, শিলা, বৃক্ষ ও লিঙ্গ পূজা, পূজায় ঘটের ব্যবহার ইত্যাদি এগুলি আর্য-অন্তর জাতিসমূহের ধর্মীয আচারের অন্তর্গত। চড়ক, গাজন প্রভৃতি উৎসবও বাঙলা দেশের বৈশিষ্ট্য। এরূপ অনুমান করার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে যে বাঙালীর এই সকল বৈশিষ্ট্য প্রাক-আর্যযুগ থেকে প্রচলিত ছিল। যোগ অভ্যাসও এব অন্যতম। লিঙ্গরূপী শিবপুজা, মাতৃদেবীর পূজা প্রভৃতি বাঙলা দেশেই প্রাক-আর্যকাল থেকে চলে এসেছে, তন্ত্রধর্মেব উদ্ভবও বাঙলাদেশেই হযেছিল·· সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয অনুষ্ঠানে উলুধ্বনি দেওযা, আলপনা অঙ্কন প্রভৃতিও বাঙালী সংস্কৃতির নিজস্ব অবদান।" বহু অধ্যাপক, গবেষক ও পণ্ডিতব্যক্তি এ ধরনের বক্তব্য বেখেছেন বাঙালী বিষযে অধ্যযন কবতে বসে। ১৯২৬ সনে প্রকাশিত 'বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি' গ্রন্থে বর্তমান লেখকও বাঙালী সংস্কৃতির নানা বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে আলোচনা কবে লোক সংস্কৃতির কথা তুলে ধরেছেন।

বাঙালীর শ্রেণী বিভাগ

বাঙালীর চরিত্র গঠন এবং জীবনের বনিয়াদ গঠনে নদনদীর ভূমিকা অসাধারণ। নদনদী বাঙালীকে শিখিয়েছিল সপ্তডিঙ্গা নিয়ে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে বাণিজ্য করতে, নদীর ঢেউর তালে তালে ভাটিয়ালী সঙ্গীত গাইতে। এই নদী বাঙালীর ইতিহাসের গতিকে সরলরেখায় প্রবাহিত হতে দেয়নি।

নদীর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধশালী নগরী ও গ্রাম ধ্বংস হয়েছে, আবার নতুন ঐশ্বর্যশালী নগর ও গ্রাম গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ একদিকে নদী এনেছে হাহাকার, অন্য দিকে দিয়েছে প্রাচুর্য। অতুলবাবু লিখেছেন "সাড়ে তিন হাজার বছর আগে বাঙালীরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত সুপরিচিত ছিল।" অনুরূপ-ভাবে আমরা একথাও ভেবে নিতে পারি যে তুরস্কসাগরীয় অঞ্চলের বণিকদের বাঙলা দেশেও উপনিবেশ ছিল। দুই দেশের বণিকদের মধ্যে বিবাহ ঘটিত সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াও আমরা অনুমান করতে পারি। চেহারা দেখে মনে হয় বাঙলার 'সুবর্ণ বণিক' সম্প্রদায় তাঁদেরই বংশধর। পরবর্তী কালে সুবর্ণ বণিকদের সুপ্রগ্রামী সমাজের অবস্থানও এরূপ নির্দেশ করে। এই বণিকদেরই আমরা ঋগ্বেদে 'পণি'

নামে অভিহিত হতে দেখি। বস্তুত 'বণিক', 'পণ্য', প্রভৃতি পণি শব্দে হইতে উদ্ভূত হয়েছে।" অবশ্য এমত সর্বজন গ্রাহ্য নয়।

আর্য জাতি বলে কোন জাতিকে এখন বহু পণ্ডিতই স্বীকৃতি দিতে চান না। আর্যকে তাঁরা গ্রহণ করেন ভাষা বাচক শব্দ হিসাবে, যারা আর্য ভাষায় কথা বলতেন তাঁরা আর্য। আর্য ভাষাভাষিদের মধ্যে নর্ডিক ও আলপীয় এই দুই নরগোষ্ঠীর প্রাধান্য স্বীকৃত বলে নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত। "ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে রুশ দেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূখণ্ডই আর্যজাতির আদি বাসস্থান ছিল। এখানে 'নর্ডিক' ও 'আলপীয' এই উভয় গোষ্ঠীর আর্যরাই বাস করত। নবপলীয় যুগের উত্তরকালে আলপীযরা কৃষি পরায়ণ হয়, আর নর্ডিকেরা পশুপালনে রত থাকে। এর ফলে উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। নর্ডিকেরা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের উপাসক ছিল, এবং উপাস্যদের 'দেব' বলে অভিহিত করত। আর আলপীযরা কৃষির সাফল্যের জন্য সৃজনীশক্তি রূপ দেবতাসমূহের পূজা করত, তাদের তারা 'অসুর' নামে অভিহিত করত। মনে হয আলপীয়রাই প্রথম নিজেদের এক বিশেষ শাখায় বিভক্ত করে শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদীদ্বয় বেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করে।·· তাদেরই একদল এশিয়া মাইনর বা বেলুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড় প্রদেশে পৌঁছায় এবং আর একদল পূর্ব উপকূল ধরে বাঙলা ও উড়িষ্যায় আসে।"

আর্যরা সুসভ্য ছিল না, ভি. গরডন চাইল্ড 'দি এরিয়ানস' গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন জগতের যেখানেই আর্যরা বসতি স্থাপন করেছিল সেখানেই তারা স্থানীয় উন্নত সভ্যতা ধ্বংস করেছিল।

এই আর্যদের যে শাখা ভারতবর্ষে আসে তারা ড. অতুল সুরের ভাষায় "এক সময় নরমাংসভোজী ছিল।" আর্যদের প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতা। তারা মাংসাশী ছিল, দেবতার নামে কোন জীব উৎসর্গ করে তার মাংস খেত। ড. অতুল সুর শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম কাণ্ডের ২, ৩, ৭ ও ৮ অধ্যায়ে বলিদান বিশ্লেষণ করে বলেছেন— "প্রথমত, দেবতারা একটি মনুষ্যকে উৎসর্গ করলেন, তার উৎসর্গীকৃত আত্মা অশ্বদেহে প্রবেশ করল। দেবতারা অশ্বকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করলেন; উৎসর্গীকৃত আত্মা, শবদেহ

হতে পুনরায় বলীবর্দে প্রবেশ করল। বলীবর্দকে উৎসর্গ করা হলে ওই আত্মা মেষদেহে প্রবিষ্ট হল; মেষ উৎসর্গীকৃত হলে, উহা ছাগদেহে প্রবিষ্ট হল। ছাগ উৎসর্গীকৃত হলে পৃথিবীতে প্রবেশ করল। দেবতারা পৃথিবী খনন করে ধান্য ও যব আকারে ওই আত্মাকে পেলেন। তদবধি এখনও ধান্যাদি কর্ষণ দ্বারা পেয়ে থাকে।... নরমাংস ভক্ষণের প্রতি ব্রাহ্মণদের যে বিশেষ লোলুপতা ছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই...এক ব্রাহ্মণ শিবি রাজার কাছে এসে বললেন—'আমি অন্নপ্রার্থী, তোমার পুত্র বৃহদগর্ভকে বধ করে, তার মাংস পাক করে আমার প্রতীক্ষায় থাক।' · নর মাংস ভোজন যে মাত্র আর্য সমাজেই প্রচলিত, তা নয়। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদগণ যথা সামনার (Sumner), লোয়েব (Lowie), কোচে (Koch), ফ্রেজার (Frazer) জনস্টন (Johnston) দেখিয়েছেন যে আদিমকাল (৩০,০০০ বৎসর পূর্বে ক্রোম্যাগনন জাতির প্রাদুর্ভাবের সময় থেকে) হতে সকল মহাদেশেরই জাতি সমূহের মধ্যে এর প্রচলন ছিল।...মেয়েরা পুরুষের বিশেষ অঙ্গ ভক্ষণ করত।" বাঙলা দেশে এই আর্যদের অনুপ্রবেশ বিলম্বে ঘটেছিল। এখানে চাতুবর্ণ সমাজের বদলে ছিল কৌম সমাজ ও বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ। তারপর যে সমাজের উদ্ভব ঘটে সেখানে জাতিভেদ ছিল না, ছিল বৃত্তিভেদ। পালযুগে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ঘটলে বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতি সমূহের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তার ফলে বাঙালীর জাতিসমূহ সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মণ্য বা সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন হলে জাতিসমূহের নতুন করে হিসাব নিতে গিয়ে দেখা গেল বাঙলার সব জাতিই সঙ্কর। বৃহদ্ধর্মপুরাণ বাঙালীকে তিনশ্রেণীর সঙ্করত্বের দ্বারা চিহ্নিত করলেন—(১) উত্তম সঙ্কর (২) মধ্যম সঙ্কর ও (৩) অন্ত্যজ। অন্ত্যদের নবশাঁখ সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করা হল। এই নবশাঁখরা শিল্পী জাত। তারা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ও ঘৃতাচীর সন্তান—"মালাকার কর্ম কাংশঙ্খকার কবিন্দকান। কুম্ভকার সূত্রধার স্বর্ণচিত্রকরাংস্তথা।" একেকজন পণ্ডিত একেকভাবে নবশাঁখদের শ্রেণীচিহ্নিত করেছেন। এরা হচ্ছে মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার সূত্রধর, স্বর্ণকার, লৌহকার ও চিত্রকর। রিজলে সাহেব এদের ভাগ করেছেন তিলি, মালি, তাম্বুলি, কামার, কুমোর, সদগোপ, তাঁতি, বণিক ও ময়রা হিসাবে। নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত বলেছেন প্রথমে নবশাঁখ বলতে নয় প্রকার বৃত্তিভিত্তিক মানুষকে বোঝাত, পরে এদের সংখ্যা চৌদ্দতে দাঁড়ায়। এরা হচ্ছেন—তিলি, মালী, তাম্বুলি,

সদগোপ, নাপিত, মধুনাপিত, বারুজীবী, কর্মকার, কুম্ভকার, গন্ধবণিক, তাঁতি, শঙ্খবণিক, কংসবণিক ও ময়রা। এই তালিকা থেকে সুবর্ণ বণিক ও সাহা সম্প্রদায় বাদ পড়েছে এবং যুক্ত হয়েছে নাপিত ও মধুনাপিত সম্প্রদায়। বর্তমান কালে এই শ্রেণীবিভাগের অস্তিত্ব নেই। এখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, বণিক, বারুজীবী, সদগোপ, সাহা, সুরি, মাহিষ্য, কৈবর্ত, তিলি, তেলি, নমঃশূদ্র ও তফশীলভুক্ত জাতি সম্প্রদায় এবং আদিম উপজাতি গোষ্ঠীদের দিয়ে হিন্দুদের এবং বিভিন্ন ভাবে উপজাতি গোষ্ঠী ও মুসলমান সম্প্রদায়কে শ্রেণী চিহ্নিত করা হয়।

পরিবর্তন ও বিবর্তনের চিত্র

মধ্যযুগে বাঙলার সমাজে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। বিজয়ী মুসলমান মঠ ও মন্দির ধ্বংস করে জোর করে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতে থাকে। ইসলামের প্রতিঘাতে বাঙালী সমাজ স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই দুটি ভাগ হচ্ছে হিন্দু ও মুসলমান।

জাতি বাঁচাতে গিয়ে হিন্দুদের আরও কঠোর হতে হয়। তখন ব্রাহ্মণেতর জাতিদের জলচল ও জলঅচল এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কৌলীন্য প্রথা চালু হয়। অনেকেই যবনদোষে জাত হারিয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। জাতিভেদে হিন্দুসমাজ জর্জরিত। মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দু জাতিভেদের প্রভাব লক্ষিত হতে থাকে। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে পুনরায় বাঙালীর পরিবর্তন ঘটে। খ্রীস্টীয় মিশনারিদের কার্যকলাপ ও ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবে নতুন চেতনার দ্বারা বাঙালী উদ্বুদ্ধ হতে থাকে।

জাতিভেদ প্রথা বিলোপের জন্য চৈতন্যদেব চেষ্টা করেছিলেন। রঘুনন্দন অপহৃতা পদস্খলিতা নারীদের প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করার বিধান দেন। এর ফলে বাধানিষেধের কঠোরতা কিছুটা হ্রাস পায়, কিন্তু সতীপ্রথা ও বাল্য-বিবাহের দাপট কমে না। স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধী মনোভাবেরও পরিবর্তন হয় না। উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার মূলক আন্দোলন রামমোহন-কেশব-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির প্রচেষ্টা এ সবের মোকাবিলা করে। সতী ও বাল্য-বিবাহ বন্ধ হয়। বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তিত হয়।

পর্তুগীজদের সঙ্গে মিলনের দ্বারা বাঙলার কৃষিবাণিজ্য এবং ভাষা ও সংস্কৃতি

পরিবর্তিত হতে থাকে। দিল্লীর সুলতানদের শাসনকাল বাদ দিলে স্বাধীন সুলতানী আমলের দুশো বছরে বাঙালী জাতির যে ঐক্য গড়ে উঠেছিলো, বঙ্গভাষার যে স্বাভাবিক বিকাশ হয়েছিলো, ১৫৩৯ সনে বাঙলা দিল্লীর সুলতানদের দ্বারা পরাস্ত হয়ে স্বাধীনতা হারালে তাতে চোট লাগে। অনেক বেশি আঘাত আসে ইংরেজ আমলে, বণিক ইংরেজ বাঙলা ও বাঙালীকে নানাভাবে দুর্বল করে দেয়।

মনে রাখতে হবে, ১৫৩৯ সন থেকে বাঙলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। এই সময় ভাষাভিত্তিক ঐক্যপ্রবাহ ব্যাহত হয়। সরকারী কাজকর্ম চলতে থাকে ফারসিতে। মুঘলদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণে বাঙলার কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতেও চাপ আসে। সুলতানী বাঙলার অর্থ বাঙলাতেই ব্যয় হতো। মুঘলদের আমলে তা পাচার হতে থাকে দিল্লীতে, এবং ইংরেজ আমলে ব্রিটেনে। মুঘলদের সময়ই বাঙলায় নতুন বণিকশ্রেণী গজিয়ে উঠতে থাকে। রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে তাঁদের কৌতূহল বেড়ে চলে। এই পুঁজিপতিদের সহায়তায় কি ভাবে ক্লাইভের অনুচরেরা বাঙলা দখল করে নেয় সে ইতিহাস সকলেরই জানা। বণিকেরা রাজা হয়েই বাঙালী পুঁজিপতিদের বাণিজ্য উৎসাহ কমিয়ে অন্য উৎসাহ বাড়াতে চেষ্টা করতে থাকে। সেই চেষ্টার ফল হিসাবে একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরকার হয়। নতুন জমিদারদের সহায়তায় দীর্ঘদিন ব্রিটিশ সরকার ভাষাভিত্তিক, সংস্কৃতিভিত্তিক ঐক্য গড়ে উঠতে দেয় নি বাঙলায়।

বাঙলার সামাজিক সংগঠন যে কৌমভিত্তিক ছিলো সে বিষয়টি নীহাররঞ্জন ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ সুনিপুণভাবে দেখিয়েছেন। কৌম জাতির নাম অনুসারে বাঙলার যে সব জনপদের নাম নির্দিষ্ট হয়েছিলো তা এখন অনেকেরই জানা। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, মাহিষ্য, বাগ্দী, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, বাউরী প্রভৃতি বাঙলার আদি বাসিন্দা। পাল রাজাদের আমলে বাঙলার কৈবর্ত জাতির অভ্যুত্থান ঘটেছিলো। দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে তাঁদের বিশেষ আধিপত্য ছিলো। বাঁকুড়ায় ছিল মল্ল রাজাদের প্রাধান্য। আদি মল্ল, জয় মল্ল, কালু মল্ল, বীর হাম্বীর প্রভৃতি মল্লরাজ ছিলেন। তাঁদের রাজ্য সুবিস্তৃত ছিলো। বাঁকুড়া, বর্ধমানের অংশবিশেষ, পঞ্চকোট, মানভূম, ধলভূম প্রভৃতি স্থানে তাঁরা বিস্তারিত ছিলেন। সহজ সরল সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁদের আধিপত্য ছিলো। তাত্ত্বিক অর্থে এই মানুষদের শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব কিছুই বলা যায় না—তারা সব ধর্মকেই হৃদয়াবেগ প্রধান সহজ সাধনায় রূপান্তরিত করে গ্রহণ

করেছিলো। যে অকুণ্ঠ হৃদয়োচ্ছ্বাস চৈত্র-গাজনে লক্ষ লক্ষ শিবভক্তের কণ্ঠে উৎসারিত হয়, তা-ই আবার খোল, করতাল ও মাদলের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ নামগানে প্রেমভক্তির ধারা হয়ে ঝরে পড়ে। এই সহজ সাধনার দ্বারাই বাঙালী মেতেছে।

তুর্কী বিজয়ের পর বাঙলা ও বাঙালীর জীবনে যে অন্ধকার স্তূপীকৃত হয়েছিলো তা বিদীর্ণ করে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ঘটে নব অভ্যুদয়। এই সময় মল্ল রাজাদেরও সুবর্ণযুগ। রাজানুকূল্য লাভ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বিকশিত ও বিস্তারিত হতে থাকে। এই ধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত হয় এক নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। ক্রমে তা সমস্ত বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ে। একই সময় ভ্রাম্যমাণ আউলিয়া দরবেশ প্রভৃতিও বাঙলায় এসে গেলেন। তাঁদের চেষ্টায় ও সুফী ধর্মগুরুদের প্রভাবে বাঙলার মুসলমান সমাজেও একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইতে থাকে। ধর্মীয় উন্মত্ততার তাণ্ডব নয়, প্রেম ও ভালবাসার, মানবিকতাবোধের বাণী, রাধাকৃষ্ণের লীলা, হিন্দু মুসলমান উভয়ের কাছে একটা নতুন সামাজিক উত্তরাধিকার রূপে দেখা দিলো। উত্তর ভারতের অন্যত্র হিন্দুরা যখন রাম সীতাকে নিয়ে মাতলো, বাঙালী হিন্দু তখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় নিমজ্জিত হলো। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ এই মত্ততাকে 'দুর্ভাগ্যের' ব্যাপার বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বাঙালী শ্রীরামচন্দ্রের পত্নীপ্রেম-কে যে যথেষ্ট মর্যাদা দিতে পারে নি তা বাঙালীর অগৌরবের।

মনে রাখতে হবে গৌড় অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে শশাঙ্কই বাঙালী রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সার্বভৌম নরপতি হন। কিন্তু শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অন্ততঃ এক শতাব্দী বাঙালী আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বে ও অরাজকতায় ভুগেছে। অষ্টম শতকে গোপাল রাজা হবার পূর্ব পর্যন্ত অরাজকতা চলছিলো। গোপালের আমলে বাঙলায় আসে এক যুগান্তর। ধর্মপালের সময় হয় বাঙলার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা। রাজ্য বিস্তারও চলতে থাকে। দেবপালের সময় অবধি সাম্রাজ্য বিস্তার চলে।

পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর শেষে বা দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ায় পাল রাজাদের পতন হলে পাল রাজত্বের ধ্বংসাবশেষ থেকে জেগে ওঠে সেন রাজ্য। সেন রাজারা ছিলেন হিন্দু। সম্ভবত কর্ণাটকী ব্রাহ্মণ। বিজয় সেন গোটা বাঙলাতেই আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন। সেন রাজাদের আমলে বাঙলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন চলে। ফলে এই সম্প্রদায় বাঙলার অন্যান্য অঞ্চল

থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে বর্তমান বাঙলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন।

সেন রাজাদের অন্যতম খ্যাতিমান রাজা বল্লালসেন। তাঁর কীর্তি হিন্দু সমাজের সংস্কার ও মিথিলা জয়। বল্লালসেন সমাজ-সংস্কার করে যে কৌলীন্য-প্রথা চালু করেন বাঙালী হিন্দু সমাজে সেই কৌলীন্যের দাপট এখনও অব্যাহত। লক্ষ্মণসেন বাঙলার সীমানা আরও বিস্তৃত করেছিলেন, কিন্তু তিনি শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর আমলেই বাঙলা পাঠান অধিকারে চলে যায়। এরজন্য দায়ী তাঁর ললনা-লোলুপতা। ১২০১ সনে বখতিয়ার বাঙলার শাসনভার পেলে উচ্চবর্ণের হিন্দু-মানসে তা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। এই পরিস্থিতি থেকে আসে অবসাদ। অবসাদ থেকে বৈরাগ্য।

মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের প্ররোচনা, কাজীদের বিচার-বিবেচনা ও শাসক সম্প্রদায়ের অপশাসন হিন্দু বাঙালীকে জর্জরিত করতে থাকে। হিন্দু সমাজকে অবসাদ থেকে উদ্ধার করতে আবির্ভূত হন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের আধ্যাত্মিকতা ও মানবিকতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য প্রেম-সাধনার কথা শোনালেন। বৈষ্ণবীয় আধ্যাত্মিকতার নয়া মানবতাবোধ আবার বাঙালীকে অনুপ্রেরিত করলো। হরে-কৃষ্ণ-হরে-রাম বাঙালীর জীবন ও মননে নতুন দিশা জোগালো। বাঙালী রাধাকৃষ্ণের প্রেমরসে ডুবে গিয়ে রাম-সীতাকে একটু দূরে ঠেলে দিলো। উত্তর ভারতের সর্বত্র রাম-সীতার প্রভাব এখনও অটুট।

আমরা জানি বাঙলার স্বাধীন সুলতানেরা তাঁদের 'বঙ্গশাহী' বলতেন, কিন্তু তাঁদের সময়ও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মানস সংস্কারের যে ভেদরেখা ছিল তা নিঃশেষ করতে পারেন না। ক্রমে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভেদবোধও বাড়তে থাকে। তাই পশ্চিমবঙ্গে যখন বৈরাগ্যধর্মী বৈষ্ণবীয় কাব্য রচিত হয়েছে, তখন পূর্ববঙ্গে জীবনবাদী কাব্য—ময়মনসিংহ গীতিকা, প্রণয়-কাহিনী ও ধর্ম-আখ্যানের মধ্যেও পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তব সুখ-দুঃখের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

ব্রিটিশ বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য শক্তিগুলোকে ভেদনীতির উপাদান হিসাবে দেখে। স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভেদবোধ বাড়িয়ে দেয়। মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণ হিসাবে হিন্দুদের দেখানো হলো। ধর্মীয় ঐক্যই জাতিতত্ত্বের মূলভিত্তি, মুসলমান সমাজকে একথা বুঝিয়ে দেওয়া হলো খয়েরখাঁ মুসলমান নেতৃবৃন্দের সহায়তায়।

নবাব-জমিদারদের সহায়তায়। বিরোধ বেড়ে চলে। হিন্দু ও মুসলমান দুটি জাতি, দুটি আলাদা ধর্ম। এই দ্বিজাতিতত্ত্ব এমনভাবে ছড়ানো হলো, বোঝানো হলো, যার অনিবার্য কারণ হিসাবে বাঙলা হলো বিভক্ত। বাঙালী হয়ে পড়লো দুর্বল ও খণ্ডিত।

বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য বা সনাতন ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে খ্রীস্টপূর্বযুগে। গুপ্তযুগে তার সম্প্রসারণ হয়। সনাতন ধর্মের আগের বাঙালী স্থানীয় চেতনা ও অস্ট্রিক ভাবধারায় পুষ্ট। বাঙলার অনুন্নত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও প্রাচীন বা আদিম চিন্তা-চেতনা বর্তমান। সনাতন ধর্মের জোয়ারেও বাঙালীকে উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা প্লাবিত করা যায় না। এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে দেয়া-নেয়া করে অগ্রসর হতে হয়েছে। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হয়। বহু মঠ, মন্দির নির্মিত হয়। বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ হয়ে যায়। সাধারণ ব্রাহ্মণেরা তখন শর্মা বা স্বামীন উপাধি গ্রহণ করতেন। ব্রাহ্মণেতর জাতিরা দত্ত, পাল, মিত্র, দাম, বর্মণ, ভদ্র, সেন, দেব, কুণ্ডু, পালিত, নাগ, চন্দ্র, দাস, ভূতি, বিষ্ণু, যশ, শিব, রুদ্র ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার করতেন যা এখনও ব্যবহৃত হয়। তখন অবধি মুসলমান আসেনি। কাজেই তখনকার বাঙালী মাত্রেই যে হিন্দু বাঙালী এ কথাটা মনে রাখতে হবে। এই জন্যই বাঙালী বিষয়ক আলোচনায় হিন্দু বাঙালীর কথা প্রাধান্য পেয়েছে ; পরবর্তী কালে যা মুসলমান ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের চোখে এবং কিছু প্রগতিশীল-সাহিত্যেকের রচনায় 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' বলে সমালোচিত হয়েছে। তা যাই হোক, গুপ্ত ও পালযুগে মোটামুটি এই কাঠামো বজায় ছিলো। এই সময় অবধি নিম্নকোটির লোকদের মধ্যে ডোম, চণ্ডাল, শবর, কাপালিকদেরও দেখতে পাই।

সেন রাজারা, পূর্বেই বলেছি, নতুন উদ্যমে সনাতন ধর্মের প্রবর্তন করেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য পূজা-অর্চনা, যাগযজ্ঞের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। পালযুগে বৌদ্ধ-ধর্ম যে প্রাধান্য পেয়েছিলো তার চেয়েও তীব্র গতিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এগিয়ে যেতে থাকে। বৌদ্ধদের উপরেও নানা ধরনের অত্যাচার হয়। রাজানুকূল্যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম প্রাধান্য পেলে স্মৃতিশাস্ত্র সমূহের অনুশাসন অনুযায়ী সমাজ সংগঠিত হয়। তবু বাঙালী তার মানস-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রাধান্য মান্য করতে এসেও বাঙালী লোকাচার, লোকধর্ম, লৌকিক দেবদেবী, উৎসব-অনুষ্ঠান, মেলা, মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগ, সিঁদুর-হলদির ব্যবহার, পান ও ধানের আচার

ব্যবহার ভোলে না। মিলন-মিশ্রণের মধ্যে যে বর্ণসঙ্কর জাতির উদয় হয় তার মধ্যে একটা সহজ সাম্য ও ঐক্যবোধ জাগ্রত ছিলো যা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য জাতিভেদ প্রবর্তনের দ্বারা বিঘ্নিত হলেও একেবারে বিনষ্ট হয় না। সে কারণেই বাঙালীর ব্যবহার-শাস্ত্র, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি আর্য ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতি থেকে বহুধাভিন্ন। বহুলাংশে বাঙালী লোকবৃত্ত-শাসিত। বাঙালী জীবনে লোকবৃত্তের প্রভাব যেমন হিন্দু সমাজে তেমনই মুসলমান সমাজেও প্রবল। কেননা বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে একই জলবায়ু ও একই প্রকৃতি-পরিবেশ ও নদ-নদী শাসিত।

বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ

বাঙালীর মানস সংগঠনে বাঙলার ভূ-প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। এদেশের প্রকৃতি মনোহর, কিন্তু প্রতিপক্ষ। দৃষ্টিসীমা সরলভাবে দিগন্তের সীমা পায় না। পথঘাট আঁকাবাঁকা, নদনদী প্রলয়ঙ্করী। জঙ্গলে, সমুদ্রে, পাহাড়ে, বনে প্রকৃতি প্রতিপক্ষ। নদী ঘর ভাঙে, শস্য কেড়ে নেয়, শহর-নগর ধ্বংস করে। সমুদ্র ফুলে উঠে গ্রাম গ্রাস করে। পাহাড় কাঁকড় বিছিয়ে জমিকে করে অনুর্বর। বন হিংস্র বন্যপ্রাণীদের আশ্রয় দিয়ে মানুষদের ভয় দেখায়, ভূত, দৈত্য, দানো প্রভৃতিও বাঙালীকে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে দেয় না। বাচার জন্য প্রতিনিয়ত বাঙালীকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে এই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। কালে কালে সংগ্রাম ও প্রতিবাদ বাঙালীর সংস্কারে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় মধ্যযুগে ইসলাম এলো বিজেতা হিসাবে। সে ধর্মীয়গোষ্ঠী বাড়াবার জন্য স্থানীয় লোকদের উপর প্রবল অত্যাচার চালালো। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলো—মানুষ তার কর্মের জন্য দায়ী, ধর্মের জন্য নয়। কর্মপ্রবাহ মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। ধর্ম জীবনের জন্য, ধর্মের জন্য জীবন নয়। ধর্মীয় কঠোরতায় নিষ্পেষিত হিন্দু-সমাজের নিম্নবর্ণীয়েরা রাজার জাতের এই ঘোষণায় নতুন বল পায়। ধর্মান্ধ হিন্দু সমাজের গোঁড়াসম্প্রদায় ইসলামের এ সিদ্ধান্ত মানে না। তবে নিম্নকোটির হিন্দুরা এই মানবতাবোধে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে, কেউ ইচ্ছা করে, কেউ অত্যাচার ও শাসনে জর্জরিত হয়ে। দুটি পরস্পর বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই দুটি ধর্মের একটি হিন্দু অপরটি

মুসলমান। যদিও নিজস্ব তত্ত্ব ও বোধ নিয়ে ধর্ম দুটি এগিয়েছে, তবু একথা বলতেই হবে যে কোন ধর্মই বাঙলায় স্ব-স্ব শাস্ত্রীয় শুদ্ধতা নিয়ে এগোতে পারে নি। হিন্দুধর্ম শাস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ সমূহের অনুশাসনের সঙ্গে লোকাচার, লোকধর্ম ও স্থানীয় প্রভাবকে নিয়ে এগুতে গিয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। মুসলমান ধর্মও তেমনি কোরাণকে অনুসরণ করে লোকাচার, লোকধর্ম ও স্থানীয় প্রভাবকে নিয়ে এগুতে গিয়ে বাঙালী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। উভয় ধর্মকেই লৌকিক প্রভাব মেনে নিতে হয়েছে। দেয়া-নেয়া করে এগুতে হয়েছে ও হচ্ছে। এখানেই ধরা পড়েছে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য।

স্থানীয় প্রভাব, জলবায়ু ও প্রকৃতি উভয় ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়কে বাঙালী বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। লোকধর্ম, লোকাচার, লৌকিক-চেতনা উভয়কে দেয়া-নেয়া করে এগুতে শিখিয়েছে। বাঙলাভাষা উভয়কে কাছের মানুষে মনের মানুষে পরিণত করেছে। মাটিকে ভালবাসতে, মাতৃজ্ঞানে পূজা করতে শিখিয়েছে।

বাঙলার মাটি পলিমাটি। বাঙলা নদীবহুল দেশ। এখানে কৃষির প্রাধান্য। কৃষিজাত ফসলের মধ্যে শীর্ষস্থান ধানের। ধান অস্ট্রিক নরগোষ্ঠীর আবিষ্কার। এখানে তেমন গম ও যবের চাষ হয় না। তা হয় উত্তর ভারতে। উত্তর ভারতের আর্যভাষীরা গম ও যবের চাষ প্রবর্তন করেন। অবশ্য সাম্প্রতিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে ও কৃষি গবেষণার দৌলতে বাঙলার মাটিতেও এখন গম চাষ হয়। তবু ধানই এখানকার প্রধান শস্য। ধানের পর বাঙলার কৃষিজাত পণ্য ছিলো আখ। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে আখের উৎপাদন, এমন কি ধানের উৎপাদনও কমে। প্রাধান্য পেতে থাকে নীলের চাষ। নীল চাষের জন্য বাঙলার কৃষকের দুঃখ দুর্দশা বেড়ে চলে। নীল চাষ না করার জন্য কি ভাবে বাঙলার কৃষককে অত্যাচারিত উৎপীড়িত নিপীড়িত হতে হয়েছিলো তা সকলেরই জানা। পাট চাষও ব্রিটিশ আমলে প্রাধান্য পায়। আরম্ভ হয় চা-য়ের চাষ। কিন্তু সব মাটিতে পাট বা চা চাষ করা যায় না। তার জন্যও বিশেষ বিশেষ অঞ্চল পাট ও চায়ের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ আমলে চাষ-আবাদ চলতে থাকে বা প্রাধান্য পেতে থাকে বণিকদের কাঁচামাল যোগাবার তাগিদ থেকে। তার ফলে ভূমি সন্তানেরা প্রয়োজনীয় উৎপাদন করতে না পেরে অনাহারে অনিদ্রায় কাটাতে থাকে।

বাঙলায় যে আখ চাষ করা হতো তার সঙ্গে উত্তর ভারতে উৎপাদিত

আখের ঈষৎ পার্থক্য বিদ্যমান। বাঙলার আখ রসালো পুরুষ্টু। উত্তর ভারতের 'গণ্ডোরিয়া আখ' বাঙলার আখের ন্যায় পুরুষ্টু ও রসালো নয়। এই আখের সম্পর্কে সুশ্রুত লিখেছেন, পুণ্ড্রবর্ধনে এক বিশেষ ধরনের আখ জন্মায়। এর নাম পৌণ্ড্রক। এই আখের রস দিয়ে উত্তম গুড় প্রস্তুত করা হতো যা ইক্ষুগুড় নামে পরিচিত। ইক্ষুগুড় একদা বাঙলার বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্য হিসাবে বিবেচিত হতো। ইক্ষুগুড় ছাড়া খেজুর গাছের রস, তাল গাছের রস দিয়েও খেজুরগুড়, পাটালী, তালের গুড় প্রভৃতি তৈরী হতো ও হয়; রপ্তানী হতো ও হয়। কিন্তু চিনির আমদানী হলে গুড়ের কৌলীন্য অনেকটাই কমে। বাঙলায় তুলার চাষও যথেষ্ট হতো। তুলাও বাঙালীর অন্যতম বাণিজ্য পণ্য হিসাবে বিবেচিত হতো। বাঙলায় সরিষা, এলাচ, আদা, লঙ্কা, লবঙ্গ, দারুচিনি, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতিও উৎপন্ন হতো। পান, কলা আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, আমলকী, হরিতকী, মহুয়া, ডুমুর, বয়রা, দাড়িম্ব, খেজুর প্রভৃতি অস্ট্রিক যুগ থেকেই বাঙালীর প্রিয় উৎপাদন।

কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষির উপযোগী নানা যন্ত্রপাতিও তৈরী হতো। তাম্রাশ্মযুগে বোধ হয় কৃষির যন্ত্রপাতি তামা দিয়ে তৈরী হতো। রাঢ় দেশের অরণ্য অঞ্চলে লৌহ উৎপাদিত যন্ত্রপাতি পাওয়া যেতো। এই অঞ্চলে বহু লোহার খনি ছিলো। বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ অবধি লৌহের উৎপাদন হতো। কৌটিল্য "বাঙলায় স্বর্ণ, হীরক ও মুক্তার উল্লেখও করেছেন। বাঙলার হীরকখনি সমূহ মোগল যুগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। কেননা আইন-ই-আকবরী-তে গড়মান্দারণের হীরক খনির উল্লেখ আছে···আর মুক্তোর কথা তো 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের রচয়িতা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে গেছেন।···প্রাচীন বাঙলার শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রই প্রসিদ্ধ ছিল। ইংরেজ আমলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'মসলিন'। বাংলাদেশে খ্রীস্টের তিন চারিশত বৎসর পূর্বে রেশমের চাষ খুব হত। রেশমের খুব ভাল কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণ' বা পাতার পশম। —বাঙলার রেশমের চাষ বাঙলার নিজস্ব অবদান"। অর্থাৎ বাঙলার কৌম সমাজ থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের সময়েও বাঙালী সুস্পষ্ট সভ্য জাতি। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ব্যাখ্যা করলেও দেখা যায় আর্যভাষীরা যখন বিস্তারিত হচ্ছিলো তখনও বঙ্গ ও তার প্রতিবেশী জনপদ সমূহ সুসভ্য।

আর্যভাষী সংস্কৃতি বাঙলায় বিনা প্রতিরোধে গৃহীত হয়নি। রঘু-ভীমের দিগ্বিজয় অথবা চিত্রসেন-বাসুদেব-নরক-জরাসন্ধের কৃষ্ণ-বিরোধিতার মধ্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে। শেষ অবধি বাঙলা সনাতনধর্ম ও আর্য-ভাষাকে মান্য করতে বাধ্য হয়।

বঙ্গ প্রভৃতি জনপদের লোকেরা যখন সনাতন ধর্ম ও ভাষাকে আত্মস্থ করে এগিয়ে যাচ্ছিলো তখন জৈন ধর্মাবলম্বীরা বঙ্গের আশেপাশে জনগণের সান্নিধ্যে আসতে থাকে। স্বাতন্ত্র্যকামী বঙ্গ-পুণ্ড্র-রাঢ় জনপদের লোকেরা জৈনধর্মকে প্রতিরোধ করেছিলো। মহাবীরকে দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিলো। তার ফলে জৈন ভাবধারা ধীর ও মন্থর গতিতে কিছু প্রবেশ করে নি এমন নয়। জৈন-বিরোধিতার কারণেই এই সব জনপদের স্বাতন্ত্র্যবাদী লোকেদের বিরুদ্ধে আচারঙ্গসূত্রে কিছু বিরূপ মন্তব্য আছে। জৈন ধর্ম যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে চাইছিলো তখন সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় মগধে। তখনো বঙ্গ নিজস্ব ভাব ভাষা ধর্ম ও দর্শন নিয়ে, নিজস্ব রাষ্ট্রচেতনা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সম্ভবতঃ সম্রাট অশোকের সময় বঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের করতলগত হয়। অশোকের উদার নীতি বঙ্গ জনপদবাসীকে আকৃষ্ট করে।

মৌর্য রাজধানী পাটালীপুত্রের বৈভব বঙ্গ জনপদের সম্পদ বলে অনেকেই মনে করেছেন। দিল্লী-আগ্রার হর্ম্যাশ্রেণীর ইঁটেও রয়েছে বঙ্গের ঐশ্বর্য। লণ্ডনের পারিপাট্য ও গর্বের মূলেও আছে এই বঙ্গের সম্পদ ও অর্থ। অর্থাৎ মৌর্য সাম্রাজ্যের আমল থেকেই যে বঙ্গ শোষিত হতে আরম্ভ করে, মুঘল যুগ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকলেও এই সম্পদ ভারতবর্ষের মধ্যেই ছিল। ব্রিটিশ আমলে এই সম্পদ চলে যেতে থাকে বহির্ভারতে। স্বাধীন ভারতবর্ষেও পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত। এ রাজ্যের ধন চলে যাচ্ছে দিল্লীতে ও অন্যত্র। বাঙালীর উপর অবাঙালী রাষ্ট্র শাসকদের এই বিমাতৃসুলভ ব্যবহার আজকের নতুন নয়। তবে এ নিয়ে রাজনৈতিক বিচার বিবেচনা ও লড়াই হাল আমলের ব্যাপার। যদিও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে বাঙলা ও বাঙালীর উপর শোষণ ও উৎপীড়ন।

সুদীর্ঘ দিন বাঙালী শোষিত, খণ্ডিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের বাসিন্দা। স্বাধীনতার মূল্য হিসাবেও আবার বাঙলা ও বাঙালীকে খণ্ড ছিন্ন হতে হয়েছে। পশ্চিমবাংলা ও পূর্বপাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) তারই সাক্ষ্য।

বাঙালীর রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে ওঠার প্রথম সুযোগ আসে সেন আমলে। সেন যুগে

রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও সামাজিক অনৈক্য বেড়েই চললো। এই সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা পতিত হলো। কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনের দ্বারা সামাজিক পার্থক্য বেড়ে গেলো। শূদ্রশ্রেণীর জনগণ রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় সামাজিক ব্যাপারে কোন অধিকার না পেয়ে উৎপাদন যন্ত্রে পরিণত হলো। স্মৃতির শাসন, জ্যোতিষ চর্চা, আগম-নিগম তন্ত্রের চর্চার দাপটে জনগণের নিয়তি-নির্ভরতা বেড়ে গেলো। তার ফলে রাজার অসামাজিক ও চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য জাতি তার প্রাণশক্তি হারালো। প্রতিরোধ শক্তি হারালো। এ কারণেই হঠাৎ মুসলিম আক্রমণকে সে প্রতিরোধ করতে পারে না। অনেকটা অনায়াসে এ দেশ মুসলমান সুলতানের অধীনে চলে যায়।

স্বাধীন সুলতানদের আমলে বৌদ্ধ ও শূদ্র সম্প্রদায়ের বিপুল অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। শামসুদ্দীন ইলিযাস শাহ 'বঙ্গশাহী' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর সময় থেকেই বাঙলাদেশের অধিবাসিগণ নিজেদের বাঙালী বলে পরিচিত করতে থাকেন। স্বাধীন সুলতানেরা বঙ্গভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু মুঘল আমলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পায় ফারসি। তখন হিন্দু-মুসলমান সকলে ফারসির দিকে ঝুঁকতে থাকে। বাঙলা ভাষা অবহেলিত হতে আরম্ভ করে। ভাষার পীড়নের সঙ্গে আরম্ভ হয় আর্থিক পীড়ন। সুলতানী বাঙলার অর্থ বাঙলায় থাকতো, মুঘল আমলে তা পাচার হতে থাকে দিল্লীতে। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কেন্দ্রের সুনজরে থাকার চেষ্টায় টাকা আর টাকার জন্য নানাপ্রকার শোষণ চালাতেন জনগণের উপর। এর ফলে বাঙালী রাষ্ট্রীয় সচেতনতা হারায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু হয়ে পড়ে। ফসল উৎপাদন ছাড়া সাধারণ বাঙালীর আর কোন ভূমিকা থাকে না। এরই মধ্যে হয় ইংরেজ বণিকদের আগ্রাসন। বণিক ইংরেজ স্বাধীনচেতা সিরাজকে দাবিয়ে দিতে গিযে নানা ফন্দী আঁটলো। স্বাধীন চেতনা সত্ত্বেও সিরাজের অত্যাচার অবিচারকে অনেকেই প্রশ্রয় দিলো না। উপরতলায় ষড়যন্ত্র দানা বাঁধলো। তার ফলে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হয। মীরজাফরেরা ক্লাইভের 'গর্দভে' পরিণত হয়ে দেশকে বিকিয়ে দেয়। সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ক্লাইভ যখন মুর্শিদাবাদের দিকে এগোতে থাকে তখন দুধারে লক্ষ লক্ষ বাঙালী দাঁড়িয়ে নীরবে বিজয় মিছিল লক্ষ্য করতে থাকেন। কোন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করেন না। কারণ নবাব রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে গতিশীল সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন নি।

পলাশীকে কেন্দ্র করে সারা ভারত ইংরেজের পদানত হয়ে পড়ে। ক্রমে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কলকাতায়। হিন্দু বাঙালী কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা প্রভৃতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। মুসলমান বাঙালী নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ইংরেজির বিরোধিতা করতে থাকেন। তার ফলে বাঙালী জাতীয়তাবাদ হিন্দু জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়। বাঙালী মুসলমান বিজাতীয়, আরব-পারস্যমুখী হয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্রোত থেকে নিজেদের পৃথক করে রাখার খেলায় মাতেন। হিন্দু বাঙালী আগে ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে আসার দরুন সরকারী কাজে প্রাধান্য পেতে থাকেন। তাঁদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। মুসলমান সমাজের মধ্যে অবশেষে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটলে দেখা গেলো তাঁরা হিন্দু বাঙালীর চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছেন। দুটি স্বতন্ত্র ধারায় দুই শ্রেণীর বাঙালীর বিকাশ ঘটতে থাকে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও হিন্দু বাঙালী এগিয়ে যেতে থাকেন। অনেকের চেতনায় বাঙালী সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। কোন বিদ্বেষ অথবা বৈষম্যমূলক ধারণা বা অন্য সম্প্রদায়কে ছোটো করার কৌশল হিসাবে এ জিনিষ ঘটেছে তা মনে করার কোন কারণ নেই। সাধারণ ধারণা থেকে এ মনোভাবের বিকাশ ঘটেছে যা পরবর্তী কালে সমালোচকদের কাছে কোন একটি সম্প্রদায়কে দাবিয়ে রাখার কৌশল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। তৎকালীন সমাজ-জীবনকে প্রত্যক্ষ করলে এ ধরনের মন্তব্যকে কুটিল মন্তব্য বলে মনে করতে অসুবিধা হয় না। এই ধরনের কুটিল মন্তব্যের ইন্ধন জুগিয়েছে যারা তারা সাত সমুদ্দুর থেকে এসে আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসেছিলো।

বণিক ইংরেজ বুদ্ধিমান ও সুচতুর। তারা বাঙালীর সম্প্রদায়গত বিদ্বেষকে মূলধন করে হিন্দু ও মুসলমানের ফারাক বাড়িয়ে দিতে একের পর এক পরিকল্পনা করে চলে। ১৯০৫ সনের বঙ্গ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতির দ্বারা ইসলাম সমাজকে তাতিয়ে চলে। নবাব জমিদারদের নানাভাবে প্রলোভিত করে সাম্প্রদায়িক ভেদবোধ বাড়ায়। তারই অনিবার্য কারণে দেখি ১৯৪৬ সনের রক্তগঙ্গা। ১৯৪৭ সনের বঙ্গভঙ্গ। এর ফলে বাঙালীর ভাষা-সাহিত্য ইতিহাস-সংস্কৃতি ও জীবনের উপর আসে প্রচণ্ড আঘাত। কিন্তু এই রাজনৈতিক বিভাগের দ্বারা সাধারণ বাঙালীর জীবনমুখী চেতনা, অধ্যাত্মমুখী আবেগ, লৌকিক

আচার-আচরণ, প্রাচীন ও পরম্পরাগত সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বিভক্ত করা যায় নি। বাঙালী দুটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের বাসিন্দা, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকেও স্বতন্ত্র, তবুও ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক থেকে উভয়েই এক ও অভিন্ন। এই অভিন্নতার মূলে আছে বাঙালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য যা বাঙলার মাটি, নদী, জলবায়ু ও প্রকৃতির দান। লোকবৃত্তের দান।

বাঙালীয়ানা বাঙালীর সম্পদ

বাঙালীর নিজস্ব চেতনা, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকার জন্য সনাতন বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশের পর্বেও হিন্দুবাঙালী তার আদিম ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুসরণ করে এগিয়ে গেছে। পারলৌকিক আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা, বিভিন্ন যাদু ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্ম, ব্রত, তন্ত্রমন্ত্র, মাতৃপূজা, লিঙপূজা, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, শিলাপূজা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাঙালী বাঁচিয়ে রেখেছে। মুসলমান বাঙালীকেও কোরাণ-শরিয়তের শাসনের সঙ্গে সঙ্গে লোকধর্মকে মানিয়ে নিতে হয়েছে। ওলাইচণ্ডী ও ওলাবিবি, সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর বাঙালীর লৌকিক ধর্মের ঐক্যপুষ্ট। লোকবৃত্ত ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাঙলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করেছে সেই ঐক্যবোধ লক্ষ্য করি সুফী ও বাউলদের মধ্যে। লৌকিক ধর্মের মধ্যে। ইতিহাসের ধারায় এ জিনিষ সংঘটিত হয়েছে। রাজনৈতিক সংগ্রাম এই ঐক্যবোধের প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারেনি, কেননা, সে প্রাচীর তাসের ঘর নয়, বাঙালী জীবনের গভীরে তার মূল। আত্মার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। বেদ-স্মৃতিশাস্ত্রাদির অনুশাসন, শরিয়তের শাসন, বাঙালীকে বাঙালীয়ানা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হিন্দু বাঙালীকে নিয়ে এগিয়ে যেতে নবপত্রিকা, শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক, ভাদু, টুসু, গাজন, বাঁধনা, ধ্বজপূজা অশাস্ত্রীয় লৌকিক দেবদেবী, পীর, পয়গম্বরদেরও মেনে নিয়েছে। আনুষ্ঠানিক কর্মে ধান, চাল, দূর্বা, কলা, কলাগাছ, নারকেল, সিঁদুর, সুপারী, হরিতকী, পান, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময়, পঞ্চগব্য, প্রভৃতিকে বজায় রেখেছে। বিভিন্ন ব্রত, উৎসব, ষষ্ঠীপূজা, গাত্রহরিদ্রা, দধিমঙ্গল, জলভরা, পানখিলি, গুটিখেলা, বৃক্ষপূজা, শিলাপূজা,

লিঙ্গপূজা, স্নানযাত্রা, ঝুলন, দোল, অরন্ধন, ধর্মঠাকুর, শিব, কালী, মনসা, শীতলা, জাঙ্গুলী, বরাম, মা-মোড়ে, শনি, সত্যনারায়ণ, অম্বুবাচী, শিলা-নদী-হ্রদ-সমুদ্রপূজা, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রপূজা প্রভৃতি আচরণ ও ক্রিয়াকর্মকেও মানতে হয়েছে। প্রাক্-ব্রাহ্মণ্য জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্ম এবং গুপ্তযুগের আগের শিথিল সনাতন ধর্মকে ও লোক সমাজের মান্য ধর্মমতকে সঙ্গে করে এগোতে হয়েছে। হিন্দু বাঙালীর গ্রহণ-বর্জনের এই চারিত্র্য তাকে এতো সহনশীল করেছে যে মধ্যযুগে ইসলামের আগমনে সে এই ধর্মকেও গ্রহণ করতে পেরেছে। বহুসংখ্যক বাঙালী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমানও আবার তদীয় সাবেক চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণে আরবীয় মুসলমান হযে যেতে পারে না। অর্থাৎ সেখানেও বাঙালীয়ানা পুরোপুরি বজায় রাখতে হয়েছে। তার জন্যই হিন্দু বাঙালী মুসলমান বাঙালীকে আপন করে নিতে পারে। ভাই ভাই বলে সম্বোধন করতে পারে। মুসলমান বাঙালীর বহু ক্রিয়াকমের মধ্যে, আচার-আচরণের মধ্যে হিন্দু বাঙালীর ক্রিযাকর্ম ও আচার-আচরণ স্পষ্টতঃই লক্ষিত হয। হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর বিবাহের স্ত্রীআচার লক্ষ্য করলে এ জিনিষটা সহজেই বোঝা যায।

ইসলামের বহু ভাবধারা ও উপাদান যেমন হিন্দু বাঙালী আপনার করে নিতে পেরেছে তেমন মুসলমান বাঙালীও হিন্দু বাঙালীর বহু উপাদান ও প্রতীককে নিজ নিজ ক্রিয়াকর্মে ব্যবহার করতে পেরেছে। এদিকে কোন বিরোধ নেই। কোন সংঘাত নেই। এজন্যই হিন্দু বাঙালী আচরিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার-আচরণ, খাদ্যাখাদ্য বিচারের তফাৎ বা ফারাক দৃষ্ট হয়। কেননা, আগেই বলেছি, কোন অবস্থাতেই বাঙালী অশনবসন, ধ্যান-ধারণা, আহার-বিহার, ভাষা-সংস্কৃতি, পূজা-অর্চনা, আচার-বিচার-সংস্কার, ক্রীড়াকৌতুক, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রাচীন বা ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারা থেকে দূরে সরে আসেনি। বাঙালী প্রাচীন বা আদিম ভাব ও ভাবনার সঙ্গে, ধ্যান ও ধারণার সঙ্গে আগত আচার-আচরণ ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই গ্রহণ কোথাও অবিকল ভাবে হয়নি, হয়েছে বাঙালীয়ানার দ্বারা জারিত হয়ে।

বাঙালীর লোকসমাজ বাস করতো কুঁড়ে ঘরে। সেখানে খড় বা ছনের চাল, মাটির দেওয়াল বা তলতা বাঁশ, পাতা প্রভৃতির দেওয়াল। মেঝে শক্ত করা হতো গোবর বা চুণ দিয়ে। বসত বাড়ীর চারদিক ঘেরা থাকতো বাঁশ বা কাঠের

বেড়া দিয়ে। বসবার এবং শোবার জন্য ব্যবহার করা হতো মাদুর, কোথাও বা কাঠের চৌকি, খাবার আসন পিঁড়ি, নগরের লোক বা ঐশ্বর্যবান গ্রামবাসীদের কেউ কেউ ইঁট দিয়ে কোঠাবাড়ী বানাতো অনেক সময় 'পত্থের' কাজও করা হতো—এই অবস্থা সুপ্রাচীন কাল থেকে এখনও প্রায় অপরিবর্তিত। বাঙলার লোক সমাজের কাঠামো এবং প্রথা ও রীতির বন্ধন, ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোত যে ব্যক্তির পরিবারেব বা গোষ্ঠীর কোন প্রয়াসকেই সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না যদি তার সামাজিক তাৎপর্য উপেক্ষা করা হয়। এখানে কোন এককই আপন প্রয়াসকে বিচ্ছিন্নভাবে চালিত করে না। সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অন্যান্য এককের উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যক্তি বিকশিত। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের আগে বাঙালীর খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিলো না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের আমল থেকে খাদ্যাখাদ্যে যে বিধিনিষেধ আরোপিত হয় তাতে দেখি একাদশী, রামনবমী, শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমীতে ব্রাহ্মণ উপবাসী থাকবেন, এই নিষেধ অমান্য করে কেহ আহার করলে তা বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণের সামিল হবে। বলা হয়—দ্বিপক্ক অন্ন বা চিড়া ব্রাহ্মণের প্রশস্ত খাদ্য নয়। তাছাড়া কোন ব্রাহ্মণ যদি তামার বাসনে আহার করেন, নুন দিয়ে দুধ খান বা এঁটো পাতে ঘি নেন, তবে তা গোমাংস ভক্ষণের সমান হবে। কাঁসাব বাসনে ডাবের জল ও তামার বাসনে মধু এবং আখের রস খাওয়া মদ্য পানের সমান। কার্তিক মাসে বেগুন, মাঘ মাসে মূলো, ভাদ্র মাসে লাউ শাক নিষিদ্ধ। কোন ব্রাহ্মণ যদি সাদা ডাল, মুসুর ডাল ও মাছ খান তবে তাঁকে তিনরাত্রি উপবাসী থাকতে হবে। কিন্তু বাঙালী ব্রাহ্মণ এইসব বিধি নিষেধের অনেক কিছুই মান্য করেন না। লোকাচারকে মান্য করতে গিয়ে ভবদেবভট্ট এবং জীমূতবাহনকেও বলতে হয়েছে, বাঙালী ব্রাহ্মণ মাছ খেতে পারে। পরবর্তী কালে রঘুনন্দন বললেন বাঙালী ব্রাহ্মণের পক্ষে মুসুর ডালও নিষিদ্ধ নয়, তবে তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মূলা, ষষ্ঠীতে নিম ও চতুর্দশীতে মাশকলাই খাওয়া উচিত নয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ পূর্ণিমা ছাড়া অন্য তিথিতে দেবতার কাছে বলি দেওয়া মাংস খেতে বলেছেন ব্রাহ্মণকে।

খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার ছাড়া উপবাস ইত্যাদি সম্পর্কেও বিধিনিষেধ আছে। "শোয়া ওঠা পাশ মোড়া/তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া/ক্ষেপার চৌদ্দ ক্ষেপীর আট/

এই নিয়ে কাল কাট।" অর্থাৎ শয়ন একাদশী (আষাঢ় মাসের শুক্ল একাদশী) ভীম একাদশী (মাঘ মাসের শুক্ল একাদশী) উত্থান একাদশী (কার্তিক মাসের শুক্ল একাদশী) শিবরাত্রি ও দুর্গাষ্টমী হচ্ছে উপবাসের বিশেষ দিন। আরও যেসব বিধিনিষেধ লোকসমাজ মান্য করে চলে তা হচ্ছে অরণ্যষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠীর দিনে সধবা মাছ খাবেন না ও বিড়ালকে তোয়াজ করবেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবার বা জয়মঙ্গলবারেও মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার হচ্ছে ইতুপূজার দিন। এই দিনেও মাছ খেতে নেই। পশ্চিমবাঙলার অনেক জায়গায় শ্রীপঞ্চমীর (মাঘ) দিন মাছ খাওয়া হয় না, কিন্তু পূর্ববাঙলার বহু জায়গায় ঐদিন জোড়া বেগুন ও জোড়া ইলিশ ঘরে আনতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে লাউ খেতে নেই, মাঘ মাসে মূলো খেতে নেই, অরন্ধনের দিনে গরম খেতে নেই, প্রতিপদে কুমড়া, দ্বিতীয়া ও ত্রয়োদশীতে বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমী শাক, একাদশীতে নিম, দ্বাদশীতে পুঁই শাক, চতুর্দশীতে মাস কলাই, অষ্টমী-নবমী-চতুর্দশী ও পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় মাছ-মাংস খাওয়া ও স্ত্রী সম্ভোগ নিষিদ্ধ। এইসব বিধি নিষেধের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব।

লোকশিল্প ও কলার ব্যাপারেও নানা বিধিনিষেধ আছে। এই শিল্পকলা সামাজিক লক্ষ্য পরিপূরণ করে এগিয়ে যায়। যুগ যুগ ধরে কাঁথা, সরা, কুলো, উল্কি, পট, আলপনা, মাদুর, তক্ষণ-ভাস্কর্য, পোড়ামাটির শিল্প পরস্পরের হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছে। একে অপরের মোটিফ, ডিজাইন, নক্সা, কৌশল এমনকি বিষয়বস্তু পর্যন্ত আত্মসাৎ করেছে। এইসব শিল্পের অধিকাংশই বৃত্তিমূলক। সামাজিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার সঙ্গে যুক্ত। তবে কাঁথা, সরা, আলপনা, পুতুল, ঘট লেখা প্রভৃতি গার্হস্থ্যধর্মী, অপেশাদার এবং অবসরমূলক শিল্প।

ব্রত, স্নান, পার্বণ, উৎসব, আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কার, বিশ্বাসজনিত নানাবিধ কর্মকাণ্ড বাঙালীকে ব্যস্ত রাখে। জননীর গর্ভে আশ্রয় নেবার সময় থেকে মৃত্যু অবধি এমনকি মৃত্যুর পরেও চলে বাঙালীর কর্মসাধনা। কৃষিজীবন, শিল্পজীবন অথবা শিকার ইত্যাদি কাজে অর্থাৎ হলচলনা, বীজ রোপন, ধান রোপন, ধান্যচ্ছেদন, ধান্যস্থাপন থেকে কামারের হাপর, কুমরের চাকা, তাঁতীর তাঁত, মিস্ত্রীর কারুযন্ত্র, লাঙ্গল থেকে শিকারের দিন, শিকারের অস্ত্র তৈরী ও ব্যবহারের

সর্বত্রই আছে আচার অনুষ্ঠান। বাণিজ্যে যাবার আগে, বাণিজ্য আরম্ভে দীক্ষা গ্রহণে, শিক্ষারম্ভে, গ্রহপূজা, শান্তিস্বস্ত্যয়ন করতে হয়। কেন করতে হয় তা বোধ হয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ না করলে বোঝা কষ্টকর।

বাঙলার কৃষক শ্রমিক সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের আচরণে বৃক্ষাদিরোপণ কর্মে, রোগ ও দৈবদুর্বিপাক থেকে উদ্ধার পেতে, ভূত-দৈত-দানবদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে, বিবাহে, গৃহপ্রবেশে, বর্ষ আহ্বানে, জীবনচক্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে সব বাধা নিষেধ, আচার-বিশ্বাস ক্রিয়াশীল তা সঙ্গে নিযে না-এগোলে অর্থাৎ জীবন সংগ্রামের যাবতীয় কাজে, উৎসব-অনুষ্ঠানে, মেলাখেলায়, নাচ-গান--নাটকে, আমোদ প্রমোদানুষ্ঠানে যে আচরণ বিধিনিষেধাদি পালন করা করা হয় তা সঠিক পবিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করা না গেলে মৌল চরিত্র বোঝা যায় না। মনে রাখতে হবে বাঙালীর যাবতীয় আচরণ পরম্পরাগত ঐতিহ্য নিয়ন্ত্রিত। এই পরম্পরাগত ঐতিহ্যের কোন কিছুই ভুঁইফোড় ব্যাপার নয়। প্রত্যেক কলাকৌশল, আচার-আচরণ-বাধানিষেধের পিছনে কোন-না-কোন যুক্তি বিদ্যমান। যেমন কৃষি প্রসঙ্গিত সংস্কার ও আচরণ। কৃষি ব্যবস্থার পত্তন মানুষকে সামাজিক ও স্থাযী বসবাসের সুযোগ করে দিযেছে। অথচ এই কৃষি, অন্ততঃ আমাদের দেশে, এখনও চরম অনিশ্চিত ব্যাপাব। তাই কৃষি নির্ভব সমাজে কৃষিকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সংস্কার, আচার-আচরণ ও বিধিনিষেধ গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও বিজ্ঞান প্রকৃতিকে শাসন করতে পারছে না। এখনও প্রকৃতি নিজের খেযালে চলে। নিজের ইচ্ছামত বৃষ্টি নামায়। প্লাবন, খরার আমদানী করে। নদীর একূল ভেঙ্গে ওকূল গড়ে। বজ্র, বিদ্যুৎ, আগ্নেয়গিরির দাপটে জনজীবন তটস্থ। সাধাবণ মানুষ এসব দেখে বিজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে না। তারা কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। দিনক্ষণ দেখে কাজ করে। নানান আচার অনুষ্ঠানে মাতে। 'ধানডাকা', 'মুই আনা', 'ডেনী আনা' প্রতিপালিত হয় বাঁকুড়া ও দক্ষিণ রাঢ বঙ্গে মুর্শিদাবাদ ও উত্তর রাঢের অনেক স্থানে, যে দিন বীজাগার থেকে বীজধান বের করা হয় সেদিন একটা কলসী বা জলপূর্ণ ঘটে সিঁদুরের তিনটি দাগ দিয়ে তা বীজাগারের সামনে রাখা হয়। ঘটে বা কলসীতে রাখা হয় আমের পল্লব, বীজসহ এই ঘট জমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। বীজ বপনের প্রথম দিন কর্তাকে জমিতে হাজির থাকতে হয়। অন্ততঃ তিন মুঠো বীজ তাকে বপন করতে হয়।

বীজ বোনা হয়ে গেলে ঘটের জল জমিতে ঢেলে দিতে হয়। আম্রপল্লবটি গরুকে খাইয়ে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য, জমিতে চাষের জলের অভাব না ঘটে। নতুন ধান ঘরে উঠলে সুন্দরবনের ধাসি সম্প্রদায় যে মাতৃপূজা করে তাতে আতপ চালের সঙ্গে কালমেঘ পাতার রস, বুড়ীপানের রস ও বেনা শিকড়ের রস, যষ্টিমধু ও আপাং শিকড় বাটা দিয়ে একপ্রকার বড়ি তৈরী করা হয়। নতুন চালের ফেনভাত শুকিয়ে তার সঙ্গে এই বড়ির গুঁড়ো মিশিয়ে মাটির ঘটে রাখা হয় তিনদিন। চতুর্থ দিন ভাত তরকারী রেঁধে পূর্বপুরুষের নাম উচ্চারণ করে 'চিলপিঠি'-তে তা উৎসর্গ করা হয়, তারপর নাচগান অন্তে নতুন চালের ভাত খেতে হয়। অন্যথায় পরবর্ত্তী চাষে বিঘ্ন দেখা দেয়। একই চিন্তা-চেতনা থেকে সাধারণ কৃষিজীবী শ্রেণীর আচার-আচরণ নির্দিষ্ট হযেছে। দেশজ চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস থেকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বা গাছের ছায়ায় থান নির্দিষ্ট হয়েছে। যার কোথাও আছে মূর্তিরূপী কোন দেবতার অধিষ্ঠান আবার কোথাও শিল, পাথর, ইঁট, পোড়ামাটির পুতুল। সকলেই জাগ্রত দেবতার সম্মান পায়। কোন কোন স্থানে বিশেষ বিশেষ বৃক্ষকে বন্দনা করার ব্যাপার আছে। এখানে মানত করা হয়, সুস্থ সুখী পরিবারের জন্য কামনা করা হয়, দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য নানা প্রকার আচরণ প্রতিপালিত হয়। এই জাগ্রত দেবদেবীব মধ্যে লক্ষ্মী, শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, চণ্ডী, কালী, মহাকালী, জাগুলী প্রভৃতি নারী দেবতার প্রাধান্য। পুরুষ দেবতার মধ্যে শিব, ত্রিনাথ, শনি, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ব্রতোৎসব বঙ্গললনার ধর্মজীবনের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সমষ্টি প্রবণতা থেকে ব্রতানুষ্ঠানের বিকাশ ও বিবর্ধন। ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান সমুহ প্রকৃতিকে বশীভূত রাখার প্রচেষ্টা, বিশেষ বিশেষ গাছ, পাথর, পাহাড়, ফল, মূল, পশুপক্ষী, জীবজন্তু, বিশেষ বিশেষ স্থান, নদনদী প্রভৃতির উপর দেবত্ব বা ঐরূপ কোন শক্তি আরোপ করার প্রবণতা বাঙালী জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তুলসী, শেওড়া, আমলকী কলাগাছ, অশ্বত্থ, বট, পাকুর, ডুমুর, সিজ, বেল, মহুয়া, দুর্বা, বাঁশ, নিম, কদম, আম, ধান, প্রভৃতি পূজা বাঙলার লোকসমাজে এখনও অব্যাহত। বিভিন্ন গাছ বিভিন্ন দেবতার প্রতীক, যেমন বিষ্ণুর তুলসী, কৃষ্ণের কদম, শিবের বেল, মনসার সিজ, শীতলার নিম, লক্ষ্মীর কলাগাছ ও ধান প্রভৃতি। বটগাছে ব্রহ্মা- বিষ্ণু ও মহেশ্বর অবস্থান করেন। গাবগাছে থাকে ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য। তেঁতুল গাছেও ওদের দেখা

যায়। শ্রীহরির প্রিয় আমলকী গাছ। নিমগাছ বসন্ত হাম প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক, অপদেবতা বিতাড়নেও নিমের ভূমিকা আছে, প্রসূতির ঘরে যাতে অপদেবতা ঢুকতে না পারে সেজন্য ঘরের চারদিকে নিমের ধোঁয়া দেবার বিধান আছে। যূপকাষ্ঠ ও গাজনের পাইগোসাঞ বেলকাঠ দিয়ে তৈরী। চড়ক উৎসবেও চাই বেলকাঠ। বাঁশ আরেকটি প্রয়োজনীয় গাছ। কৃষ্ণের বাঁশী, মৃতের খাটিয়া, শ্রাদ্ধের মশারী (ব্রাহ্মণকে দান করা হয়) বাঁশের তৈরী। অপদেবতা তাড়াতেও বাঁশের দরকার হয়। অনেক জায়গায় নবদম্পতি প্রথম ঘরে ঢোকার সময় বাঁশের পোলে পা রাখেন, ঢোকার সময় নববধূ বাঁশের তৈরী খাড়ুই ভর্তি কইমাছ হাতে নেন, বাঁশের পোল যৌথ সমাজের প্রতীক, খাড়ুই ও কইমাছ দীর্ঘ জীবন ও অধিক সন্তানের প্রতীক। মাথায় যে ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করা হয় তা আয়ুবৃদ্ধিজনিত আচার। আরেকটি উল্লেখযোগ্য গাছ আম। হিন্দুর শবদেহ দাহনে আমকাঠ দরকার হয়। বিয়ে ও পৈতায় দরকার হয় আমকাঠের পিঁড়ি। শনি ও মঙ্গলবার আমগাছ কাটতে নেই। এই গাছের পল্লব ব্যতীত হিন্দুর কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতে পারে না। পলাশ ত্রিদেবের প্রতীক, পলাশ কাঠে মৃতের সৎকারের পুণ্য অর্জিত হয়। বৃষকাষ্ঠ নির্মাণ করতেও পলাশ কাঠ ব্যবহার করা চলে। তুলসী বিষ্ণুর প্রতীক, তুলসী তলায় নিত্য প্রদীপ হিন্দুর অবশ্য কৃত্যের একটি। কার্তিক মাসের শুক্লানবমীতে মেয়েরা আমলকী গাছের পূজা করে। বৃক্ষপূজা ও বৃক্ষ উৎসব সম্পর্কে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাবে লেখকের 'সেক্রেড ট্রিজ অ্যাক্রশ কালচারস অ্যাণ্ড নেশনস' ও 'ট্রি সিম্বল ওয়ারশিপ' গ্রন্থদ্বয়ে ও অন্যত্র। গাছ বা গাছের ডাল, পাতা ধানের ছড়, খাগের কলম, আখ, দূর্বা, কুশ, প্রভৃতি, চালকুমড়া, কলার খোল, কলার মোচা, ধানের গুচ্ছ, ধান দূর্বার আশীর্বাদ, হলুদ, পান, সুপারী, নারকেল, সিন্দুর, মঙ্গল ঘট, ঘটের উপর আঁকা বিভিন্ন প্রতীক আলপনা, গোবর, কড়ি, গঙ্গাজল, দধি, মধুপর্ক, মধু প্রভৃতি বাঙালীর ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু এর অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দান নয়। বাঙলার লোকসমাজ তদীয় চিন্তাচেতনা ও বিশ্বাস থেকে এগুলো গ্রহণ করেছে আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে। সেখান থেকে তারা চলে এসেছে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সংস্কৃতির আঙ্গিনায় পরম্পরাগত ঐতিহ্যের সিঁড়ি বেয়ে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে বাঙালী এখনও যে সব আচার-আচরণ-সংস্কার ও বিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত, তা এই ভাবেই গৃহীত হয়েছে।

প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন, দিবারাত্রির পরিবর্তন, চন্দ্রসূর্যের উদয় অস্ত, জীবজন্তু বৃক্ষ লতাদির জন্মমৃত্যু বাঙালীকে জীবন সম্পর্কে সপ্রতিভ করে আচার অনুষ্ঠানের পত্তন করতে সাহায্য করেছে। গ্রীষ্মের দাবানল থেকে উদ্ধার পেতে পুণ্যি পুকুর, বসু ধারা ইত্যাদি ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। উর্বরতা ও প্রজনন শক্তি বৃদ্ধির জন্য শিবপূজাব্রত তুষতুষলাব্রত, তারাব্রত, সসাপাতাব্রত, জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, দলপুতুল ব্রত, অরণ্যষষ্ঠী ব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়, গবাদি পশু রক্ষাকল্পে গোকলে ব্রত, বাঁধনা পর্ব, সৌরজগতের বন্দনায় মাঘমণ্ডল ব্রত, তারা ব্রত প্রভৃতি পিতৃপুরুষকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য কুলকুলতী ব্রত ও মহালয়ার স্নান। সৌভাগ্য কামনায় সাবিত্রী ব্রত, মঙ্গল চণ্ডীব্রত, সুখশান্তিতে বসবাস করার জন্য লক্ষ্মীব্রত, মৃত্যুর পর শান্তি পাবার জন্য হরিবেশ ব্রত, বাণিজ্যে সাফল্যের জন্য ভাদুলী ব্রত, সেঁজুতীব্রত, প্রেম ভালবাসার জন্য জতুব্রত, সৌন্দর্য কামনায় নখছুঁই ব্রত, সন্তানাদির কামনায় ষষ্ঠীব্রত ইত্যাদি প্রতিপালিত হয়। এই সব আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে লোকসমাজ বিচিত্র কামনা বাসনা সফল করে তুলতে চায়।

বাঙালী বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবী, পীর দরবেশ, গণক-ওঝা, প্রভৃতির কাছে যায় জলপড়া, নুনপড়া, পীরের জল প্রভৃতি আরোগ্য নাশক ঔষধের জন্য, কবচ তাবিজ প্রভৃতি শান্তির উপায় বলে গ্রহণ করা হয়। ভাইবোনের মিলন উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে ভাইফোঁটা, আমোদ আহ্লাদের জন্য রঙ খেলা ইত্যাদিও বাঙালী সমাজে চলে আসছে সুপ্রাচীনকাল থেকে। কিন্তু রাখীবন্ধন বাঙালীর উৎসব নয়, তা উত্তর ভারতের উৎসব। ১৯০৫-১১-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে বাঙলায় রাখীবন্ধনের আমদানী হয়।

ব্রতের মতোই বাঙালীর প্রিয় স্নান। গ্রহণ স্নান, গঙ্গা পদ্মায় স্নান, অক্ষয় তৃতীয়া স্নান, মাকরী স্নান, গঙ্গাসাগর স্নান প্রভৃতির দ্বারা পাপীরও পাপ বিধৌত হয় বলে বিশ্বাস ; বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি' গ্রন্থে। বাঙালী কিভাবে বারোমাসে তের পার্বণে মেতেছে, কিভাবে বিশ্বাস আচার আচরণ অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে, ধর্মকর্মের সঙ্গে, শিল্পকলা নৃত্যগীতাদিতে মেতেছে, কিভাবে অর্থনৈতিক চেতনা থেকে এসেছে বাঙালীর বাস্তবজীবনবোধ, নতুন জীবন জিজ্ঞাসা, নতুন সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা এবং জীবনধারণ ও বাঁচার মূল্যবোধ, তা বাঙালীর লোকাচার, লোকধর্ম ও লৌকিক চেতনা ও উপলব্ধি না বুঝলে বোঝা সম্ভব নয়। কিভাবে বাঙালী অতীতের ঐতিহ্য বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রতা নিয়ে জলের স্রোত অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পেরেছে

শত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে, দিয়ে ও নিযে এগিয়ে যাবার পথপরিক্রমায় কিভাবে তাকে সংঘাত ও সংযোগ মানিয়ে নিতে হয়েছে, এবং নতুন জীবনকে বিকশিত করতে গিয়েও সে কেন পরম্পরাগত ঐতিহ্য সংস্কার বিশ্বাসকে ভুলতে পারেনি তা বাঙালীর লোকসাহিত্য, লোকাচার, লোকধর্ম ও লৌকিক শিল্পকলা তথা লোকবৃত্ত সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করা না গেলে হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টসাধ্য।

বাঙালীর লোকাচারণীয় তথ্যাদির কথা স্মরণে রেখে লোকশিল্পীদের দিকে তাকালে দেখতে পাই তারাও পুরুষানুক্রমে ও পরম্পরাগত কক্ষপথে বিচরণশীল। সমাজ নির্ভর। সামাজিক, পারিবারিক ও গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে, রীতি ও প্রথার দাবী মেটাতে সচেষ্ট। লোকশিল্পে সমাজ ও পরিবারের সকলকেই হাত মেলাতে হয়। এখানে অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন নেই। কেননা, লোকসমাজে ব্যক্তির সামাজিক মূল্য অর্থ, কৌলিন্য বা শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা চিহ্নিত হয় না। শিল্পে সকলেরই সমান অধিকার। নিজস্ব ক্ষেত্র ও সাধ্য অনুসারে শিল্পকর্মে অংশ নেবার কোন বাধা নেই। ভোলানাথ ভট্টাচার্য যথার্থই লিখেছেন, "ক্রীড়াচঞ্চল, সখীপরিবৃত কিশোরীর হাতে গড়া শিবপূজার মৃন্ময় মূর্তিটি কিংবা খেলাঘরের পুতুলগুলিও এক উন্মেষশীল শিল্পীমনেরই অর্ধস্ফুট প্রকাশ। যে প্রবীণা তার প্রিয়জনের নবজাতকের জন্য অথবা নানা আকারের পেটিকা নির্মাণকল্পে তাঁর অবসরের দীর্ঘপ্রহরগুলিকে পরম ধৈর্য নৈপুণ্য ও মমতা ভরে প্রায় তুলির মত নমনীয় আঁচরে অবলীলাক্রমে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের উপর দিয়ে ছুঁচের ফোড়ের সাহায্যে বিচিত্র নকশা ও মোটিফের সমাবেশে এক অনবদ্য রূপকল্প উপস্থাপন করেন, সেই চিত্রনধর্মী সব শিল্পী সহস্র গার্হস্থ্য দায়দায়িত্বের চাপে ঢাকা থাকতেন যদি না গার্হস্থ্যধর্মের একটি বিশেষ প্রথা বা প্রযোজন তাঁকে এইভাবে বস্ত্রনির্মিত আচ্ছাদন বা আধার নির্মাণে প্রণোদিত করত। ঘরের মেয়েরা এইভাবে যুগযুগ ধরে এঁকে এসেছেন, মাটি, ননী, ক্ষীর প্রভৃতি দিয়ে পুতুল গড়েছেন, কাপড়ের উপর নকশা বুনেছেন, দেওয়ালে ও মেঝের গায়ে আলপনা ও ছবি এঁকেছেন, বেত ও মাদুর দিয়ে সুন্দর আধার ও আসন শয্যা তৈরী করেছেন, নানান আকৃতির মিষ্টান্ন বানিয়েছেন, ফুল, লতাপাতা দিয়ে গৃহ ও উৎসব মণ্ডপ সাজিয়েছেন, এবং এসবই তাঁরা করেছেন শিল্প সৃষ্টি করছি এমন কোন সচেতন শৃঙ্খলা বা বোধ নিয়ে নয়।...লোকশিল্প একান্তভাবে আপন সন্তোগের জন্য অথবা সামাজিক লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য পরিকল্পিত। বিপণনের সামগ্রীতে পর্যবসিত হলেও তার এই মৌল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে।...ব্যক্তিক প্রয়োজন অবশ্য কালক্রমে সামাজিক

তাৎপর্যের মধ্যে প্রসার লাভ করায় পরবর্তী পর্যায়ে লোকশিল্পের প্রকৃত ধাত্রী হয়ে দাঁড়াল সামাজিক রীতি প্রথা, আচারানুষ্ঠান ও উৎসবাদি, কেননা ব্যক্তি সেখানে সমাজেরই একজন সদস্যরূপে তার সাধ্যমত শিল্পার্ঘ্য নিবেদন প্রয়াসী।" ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য লোকশিল্পের উদ্ভাবন। এতে লোকমনের রঙ ও হৃদয়ের স্পর্শ থাকে। প্রতীক ও মোটিফ দেখে তা বোঝা যায়। লোকশিল্পের একটি মুখ অতীত স্মৃতি মন্থনের দিকে, আরেকটি মুখ সমকালের চাহিদা মেটাবার দিকে। ঐতিহ্য এই দুইটি মুখের মধ্যে সড়ক নির্মাণ করে সংযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করে।

লোকশিল্প ও কলা সামাজিক লক্ষ্য পরিপূরণ করে এগিয়ে যায়। এই শিল্পের অধিকাংশই পেশার সঙ্গে যুক্ত। যেমন বাঙলার খেলনা-পুতুল। খেলনা-পুতুলের প্রধান কারিগর হলেন দেশের কুম্ভকার, সূত্রধর ও পটুয়া-চিত্রকর সম্প্রদায়। বাঙলার বিভিন্ন প্রান্তে এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আজও বাঙলার মাটির পুতুলের উপর টান আছে বাঙলার গ্রামবাসীর। পুতুল-শিল্পীদের পুতুলের নির্মাণকৌশল ও গড়নপদ্ধতি এক এক সম্প্রদায়ের একেক রকম। যেমন কুম্ভকার সম্প্রদায় যে সব পুতুল তৈরী করেন তাতে মাটির পলেস্তারা বেশ পুরু আকারের হয়। যা পোড়াবার পরেও হাল্কা হয় না। সূত্রধর সম্প্রদাযের পুতুলে থাকে রঙের ঔজ্জ্বল্য এবং ভারের পরিমাণ মাত্রাধিক্য। অন্যদিকে চিত্রকর-পটুয়াদের পুতুল ওজনে হাল্কা। কারণ, অর্থনৈতিক। কুম্ভকার সম্প্রদায়ের প্রধান উপজীবিকা মাটির হাঁড়ি কলসী, ঘট, গামলা বানানো। এই সম্প্রদায়ের মহিলারা অবসর সময়ে খেলনা-পুতুল বানান। কাছাকাছি কোন মেলা পার্বণে তা বিক্রি করেন হাঁড়িকুড়ির সঙ্গে। হাঁড়িকলসীর সঙ্গে একসঙ্গে তা বহন করতে ওদের বেশী অসুবিধা হয় না। অন্যদিকে সূত্রধর শিল্পীরা কাঠ, পাথর, মাটি ও চিত্রবিদ্যায় দক্ষ। ঐসব দিয়েই তাঁদের জীবিকা-চলে। পুতুল শিল্পের উপর নির্ভরশীল নয়। ওদের নির্মিত পুতুল সাধারণত হাল্কা না হয়ে ভারী হয় তাঁরাও খেলনা-পুতুল নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ান না। কাছাকাছি মেলা-উৎসবের জমায়েতে বিক্রি করেন। পটুযা-চিত্রকর সমাজের পুতুল হাল্কা। কারণ এই সম্প্রদায় পট এঁকে গান শুনিয়ে পুতুল বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। এই পুতুলের কোন বাঁধাধরা বাজার নেই। দোকান বাজারেও বারোমাস বিক্রির ব্যবস্থা নেই। তাই তাদের ছুটতে হয় বিভিন্ন গ্রাম্য মেলায়। সেই মেলায় যাবার জন্য পুতুলের বিরাট ঝাঁকা মাথায় চাপিয়ে ওরা এক মেলা থেকে আরেক মেলা ঘোরেন। পুতুলের গড়ন ভারী

হলে বোঝা ভারী হয়। মাথায় মোট বোঝাই করে দূর দূরান্তরে যাওয়া-আসায় অসুবিধা। এই অসুবিধার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যই তাঁরা হাল্কা পুতুল নির্মাণ করেন। একান্ত কারিগরি দক্ষতার সঙ্গে খুব পাতলা পলেস্তারা দিয়ে পুতুল তৈরীর দিকে তাদের ঝোঁক। এই ভাবেই নির্মাণ কৌশল অবলম্বিত হয়। প্রয়োজনভিত্তিক শিল্পকলা গড়ে ওঠে। এই মুহূর্তে যে প্রয়োজনভিত্তিক নির্মাণ কৌশলের কথা বলা হলো তা মনে রেখে আরও একটি কথা স্মরণ করবো।

সকলেই জানেন যে অতীতে ভয় ও অনিশ্চয়তা ছিল মানুষের নিত্যসঙ্গী। তাই দৃশ্য ও অদৃশ্য শক্তির প্রসাদলাভে মানুষকে নানা বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। আচার, অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধকে মান্য করে অগ্রসর হতে হয়েছে ও হচ্ছে। এদের বহুকিছু ক্রমে ধর্ম ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে সমগ্র সমাজ বিভিন্ন শ্রেণী অর্থনৈতিক বর্গ বা স্তরে বিভক্ত হবার পর এই ভয় ও অনিশ্চয় জীবন আধুনিকতার বিচিত্র সংমিশ্রণে এক জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছে। তারই ফলে মহিলা সমাজের একটা বৃহৎ অংশ সামাজিক রীতি অনুযায়ী পারিবারিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তাদের শ্রম প্রায়শই সামাজিক মূল্য পায না। পায না কোন সামাজিক অধিকার। কায়িকশ্রমের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের একটা অংশ সংগঠিত ও উৎপাদনশীল শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। এদের অনেকেই সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পদতার শিকার। কর্মক্ষেত্রে থাকে না কোন নিরাপত্তার গ্যারান্টি। অনুৎপাদনীয় ক্ষেত্রের সঙ্গেও জড়িত এক বিরাট সংখ্যক মহিলা যারা মহানগর ও শহরের বস্তী ও কলোনীগুলোতে বসবাস করে, যারা ঘুঁটে দিয়ে, ঠিকাঝি, ঝি হিসেবে কাজ করে, ঠোঙা তৈরী থেকে চাল ব্ল্যাক, তরিতরকারী বিক্রি প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকে, যুক্ত থাকে বিভিন্ন মাত্রায় সমাজের দুর্নীতির সঙ্গে—একদিকে সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পদতা অন্যদিকে অপসংস্কৃতি তাদের ঘিরে থাকে। নিজেদের দেহকে পণ্য করে যারা দিনাতিপাত করে তারাও শহরগুলোতে ডালপালা ছড়িয়ে চলেছে। তাদের সমাজে রয়েছে এক হীনমন্যতা ও সমাজের প্রতি বিদ্বেষ, রয়েছে ভয়। কিন্তু এদের কেউই পরম্পরাশাসিত বিশ্বাস, আচার আচরণের বাইরে যেতে পারে না। সমাজের অন্যান্য বর্গের মহিলাদের মতোই এরা ঐতিহ্য ও বিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত। সংস্কার চালিত। ভীত। সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকে সর্বস্তরে যে ভয়, প্রকৃতির খেয়ালীপনার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য যে আকূতি, যে ভয়, তা থেকেই জন্ম নিয়েছে নানা ধরনের সংস্কার, আচার

আচরণ ও বাধানিষেধ। এই সংস্কার আচার, আচরণ ও বিধিনিষেধকে এককথায় যারা কুসংস্কার বলে এড়িয়ে যেতে চান তাদের বিচারবোধ ও বুদ্ধির সঙ্গে সাধারণ মানুষ প্রায়শই সহমত প্রদর্শন করেন না। করেন না কারণ, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার কোন কোন ভয় দমন করতে শেখালেও এখনও বিজ্ঞান বহু ভয় দমন করতে শেখাতে পারেনি। এখনও বিজ্ঞান প্রকৃতিকে শাসন করতে পারছে না। প্লাবন, অনাবৃষ্টির হা-হুতাশ বন্ধ করতে পারে নি। ভূমিকম্প যে জন ও জনপদকে নিশ্চিহ্ন করে, জলরাশির ভ্রূকুটি-কুটিল চাহনিতে যে ধ্বংস ও মৃত্যু অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান তা দমন করতে পারে নি। তাই মানুষের ভয়ও কমে নি। অদৃশ্যশক্তির উপর নির্ভরতাও কমে নি।

মানুষ যতো এগিয়ে যেতে থাকে ততো সে নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকে। অদৃশ্যশক্তি প্রাকৃতিক বিপর্যয় মহামারী, হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ, কৃষিকার্য, পশুপালন প্রভৃতির নিয়ামক বলে মনে করতে থাকে। অদৃশ্যশক্তিকে তুষ্ট করার চেষ্টা চলে বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠান ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের মারফৎ। এই উৎসব অনুষ্ঠানের অনেকটাই যাদুধর্মী। এদের অঙ্গ-স্বরূপ যে শিল্পকর্ম, যথা আলপনা ও অন্যান্য চিত্র, প্রতিমা, পুত্তলিকা, বিভিন্ন বস্তু নির্মাণ, নৃত্যগীত, সঙ্গীতাদি সকলেই যাদুতন্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত। বাঙালীর ব্রত, ব্রত-আলপনা, বিভিন্ন উৎসব ও পূজা প্রভৃতির বিশ্লেষণ করে যোগ্য বিদ্বান ও গবেষকেরা এ জিনিষ দেখিয়েছেন।

বিশ্বাস ও সংস্কার কিভাবে শিল্পকে প্রভাবিত করে তার অন্যতম উদাহরণ নবান্নের পর ধানের ছড়া ও ছই দিয়ে ঘর সাজানো। লক্ষ্মীপূজার আলপনায় পায়ের ছাপ, মাঙ্গলিক কাজে মঙ্গলঘট প্রভৃতি যে বিশ্বাস ও সংস্কার-উদ্ভূত তা গভীরে প্রোথিত। অবশ্য অভিজাত ধর্মে এ বিশ্বাস ও সংস্কার লক্ষণীয়। তবে অভিজাত সংস্কৃতি লোক-সংস্কৃতি থেকে "অনেক বেশী সন্দিগ্ধ, কৃত্রিম, খুঁতখুঁতে, পরিপাট্যপ্রিয়। গ্রহিষ্ণু ও অবিমিশ্র শিল্প সৌন্দর্যের সন্ধানী।...একই মানুষের মধ্যে এই নাগরকবি ও লৌকিক বিশ্বাসের সহাবস্থান এমন কি দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলা বর্তমান থাকতে পারে। কিন্তু মোদ্দা কথা হল, যখন যে কোন শিল্পকর্মকে ধর্মবিহিত বা সমাজ নির্দেশিত বলেই সৃষ্টি বা গ্রহণ করে ও তার শিল্পমূল্যকে আলাদা করে দেখে না, তখন তাকে বলি লোকায়ত মানসিকতার লক্ষণাক্রান্ত, আবার যখন সে শিল্পকে ধর্ম সমাজ, সংস্কার প্রভৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশুদ্ধ শিল্পসুষমা ও উৎকর্ষের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখে, তখন তাকে অভিজাত রুচির লোক বলে মেনে নিতে হয়। অভিজাত মনোভাবাপন্ন লোকও

যেমন সময় বিশেষে শিল্পবস্তুর প্রতীকী বা ধর্মীয় তাৎপর্যের দ্বারা চালিত হতে পারেন, তেমনি লোকায়ত সমাজের মানুষও ক্ষেত্রবিশেষে নিছক শিল্পশোভায় আকৃষ্ট হয়ে অভিজাত শ্রেণীর শিল্পবস্তু সংগ্রহে বা রচনায় বা অনুকরণে প্রবৃত্ত হতে পারে। অভিজাত শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টি একটি উপেয়, উপায় নয়। সৃষ্ট বস্তুটির সামাজিক, প্রতীকী বা ধর্মীয় তাৎপর্য সেখানে গৌণ বা নগণ্য, অপর পক্ষে লোক শিল্পে ধর্মসাধন, সামাজিক কর্তব্যপালন বা ঐতিহ্যসম্ভূত রীতি, প্রথা, অনুষ্ঠানাদির যথাযথ সম্পাদনই মুখ্য লক্ষ্য, শিল্পবস্তুটি যদি সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয় তাতে সেটা উপরিলাভ, শিল্পকর্ম সেখানে উপায মাত্র।" ভোলানাথ ভট্টাচার্যের 'শিল্পভাবনা' গ্রন্থ থেকে এই উদ্ধৃতিটি নেয়া।

সাধারণ পরিচিত জগতের রূপ ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য বস্তুর ছবি লোকচিত্রে স্থান পায়। তাতে বিমূর্ত ভাবনা থাকে না। বাঙলার লোকচিত্রে কতগুলি স্বতন্ত্র মোটিফ যেমন পদ্ম, কলকা, গাছ, বর্ফি, বুটি, লতা, পেঁচানো ফুল, বক্ররেখা, বৃত্ত প্রভৃতি সবই বাস্তব চেতনার প্রতিফলন। অঙ্কনের উপকরণ অথবা চিত্ররূপ দেখে লোকচিত্রকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না। এবং তা দিয়ে কোন লোকচিত্র কত প্রাচীন তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কিন্তু এর অঙ্কন প্রণালী, রঙের ব্যবহার, মোটিফাদি দেখে শিল্প সমালোচকের পক্ষে এর চরিত্র নির্ধারণ করা সম্ভব।

লোকসঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্য

ব্রত-আচার-অনুষ্ঠান ও লোকশিল্পের ন্যায় নৃত্য-গীতাদির ব্যাপারেও লোক সমাজের নিজস্ব চারিত্র্য লক্ষণীয়। এক্ষেত্রেও বাধানিষেধের ব্যাপার আছে, ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত ধারার ব্যাপার আছে। এর দ্বারা লোকসমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাচেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানা যেতে পারে।

বাঙলার লোকসঙ্গীতে কতগুলো নিজস্ব ধারা আছে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে। লোকনৃত্যে অঙ্গভঙ্গির সূক্ষ্ম কলাকৌশলের চেয়ে দেহের স্থূল গতি-বিধি বড় হয়ে দেখা দেয়। দেশজ ঢাক, ঢোল, কাঁসি, খোল, বাঁশি, করতাল একতারা, তুবড়ি, খমক, সারিন্দা, ধমনা, জুড়ি, শঙ্খ, ভেঁপু, শিঙ্গা প্রভৃতি লোকসঙ্গীত ও নৃত্যে ব্যবহৃত হয়। লোকনৃত্যের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে

দলবদ্ধতা। নৃত্যের মধ্যে দলগত ঐক্যচেতনা ফুটে ওঠে। তা অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ায় এর মধ্যে জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। বাঙলার লোকনৃত্যের কোন-কোনটিতে প্রাচীন সংস্কার কোথাও ধর্মের এবং কোথাও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মীয় নাচের মধ্যে গম্ভীরা, জারি, গাজন, বোলান, ছৌ, বাউল, বেলানাচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সামাজিক নাচের মধ্যে পড়ে চালি নাচ, রাযবেঁশে, পাইক প্রভৃতি। আনুষ্ঠানিক নাচ বলতে ঘাটু, ভাদু, টুসু প্রভৃতি। কোন কোন নাচ প্রতীকধর্মী যেমন ছৌনাচ, বুড়াবুড়ি নাচ প্রভৃতি। কিছু নাচকে বলা যায আচারধর্মী, যেমন ব্রতনাচ, বৌনাচ প্রভৃতি।

যদিও ইসলামধর্মে নাচ-গান নিষিদ্ধ তবু বাঙালী মুসলমান নাচ ও গানের দ্বারা লালিত। জারি, ঘাটু প্রভৃতি নাচ মুসলমান প্রতিপোষিত। জারিগানের প্রেরণা কারবালার বিষাদময় কাহিনী। মুর্শিদী ও ফকিরি নাচের প্রেরণাও ইসলাম। বাউল নাচও ইসলামের মধ্যে প্রচলিত। মাদার নাচ অনুষ্ঠিত হয় ঢোল সহযোগে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। মাদারের অনুরূপ নাচ চেলা নাচ। সারি নাচ অনুষ্ঠিত হয নৌকাবাইচের প্রতিযোগিতায। মহরমপর্বে অনুষ্ঠিত হয় লাঠি নাচ। এই সব নাচ ও লোকসঙ্গীতে যেসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয ইতিপূর্বেই তার কিছু উল্লেখ করেছি। ধর্মকর্ম, উৎসব অনুষ্ঠান, মেলাখেলা, শবযাত্রা, শোভাযাত্রা, যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি নানা ব্যাপারে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। ঘণ্টা, শঙ্খ প্রভৃতি হিন্দুধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। ঘুঙুর নাচের অন্যতম সঙ্গী। লৌকিক ও ক্লাসিক উভয়প্রকার নাচে ঘুঙুরের ব্যবহার হয়। সরকারী নির্দেশ বা বিবৃতি প্রচারের নিমিত্ত এবং বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে ঢেরা বা ঢোলকের ব্যবহার দেখি। সাপুড়ে তুবড়ি বাজায, বানর, ভালুক প্রভৃতি নাচে ডুগডুগি; ফেরিওয়ালার পায়ে ঘুঙুর, হাতে ঘণ্টা, বৈরাগীর হাতে জুড়ি, বাউলের একতারা, দোতারা প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। শিঙা ফুকিয়ে ভিক্ষা চাওয়া হয় আবার শিরাণীও শিঙা ফুকিয়ে বৃষ্টির আহ্বান জানায়, বৃষ্টি বন্ধের জন্য চেষ্টা করে। সানাই মাঙ্গলিক বাদ্য, বিবাহে এর উপস্থিতি দেখি। আসলে বাদ্য-বাজনা, বাজী পোড়ানো প্রভৃতি কাজ কুশক্তিকে সতর্ক করে দেবার ব্যাপার।

লোকসঙ্গীতের কোন কোন গানে একক শিল্পী নিজেই বাদক এবং গায়ক। বাউল একতারা যোগে, ভাওয়াইয়া দোতারা যোগে, সারি সাবিন্দা যোগে গাওয়া হয়। দোহাররা ধূয়া গায়, ঘটে নাচে ঘুঙুরের ব্যবহার দেখি। নানা ধরনের লোকসঙ্গীত বাঙলায় জনপ্রিয়। কয়েকটি গানের উদাহরণ দিচ্ছি, প্রথমটি হাসন রাজার গান, এটি শ্রীহট্ট অঞ্চলে জনপ্রিয়।

"লোকে বলে বলে রে গরবাড়ী ভালা নায় আমার
কি গর বানাইমু আমি শূন্যেরি মাজার
লোকে বলে বলে রে গরবাড়ী ভালা নায় আমার।
বালা করিয়া গর বানাইয়া কয়দিন থাকমু আর
আযনা দিয়ে চাইয়া দেখি পাকনা চুল আমার,
এই না ভাবিয়া হাসন রাজায় গর দুয়ার না বান্দে
কোথায় গিয়া রাখব আল্লায় এর লাগিয়া কান্দে
হাসন রাজায় জানও যদি বাচব কতদিন
দালান কোঠা বানাইত করিয়া রহীন।"

দ্বিতীয় গানটি ভাওয়াইয়া, এই গান উত্তরবঙ্গে জনপ্রিয়।

"পথম যৌবনের কালে না দিলা মোর বিয়া
আর কতকাল রহিস্ ঘরে একাকিনী হায় রে বিধি নিদয়া।
হাইলা পৈল সোনার যৌবন মালয়ার ঘড়ে
মাও বাপে মোর হইল বাদী না দিল পরের ঘরে, রে বিধি নিদয়া।
বাপক না কও সরমে মুই, মাওক না কত লাজে
ধিকি ধিকি তুসির আগুন জ্বলছে দেহির মাঝে, রে বিধি নিদয়া।
পেট ফাটে তাও মুখ না ফোটে লাজ-সরমের ডরে
খুলিয়া কোলে মনের কথা নিন্দা করে পরে, রে বিধি নিদয়া।
এমন মন মোর করে রে বিধি এমন মন মোর করে
মনের মত চেঙড়া দেখি ধরিয়া পালাও দূরে, রে বিধি নিদয়া।
কহে কবে কলংকিনী হানি নাইকো মোর তাতে,
মনের সাধে করিয়া ফেলি পতি নিয়া সাথে, রে বিধি নিদয়া।

তৃতীয় গানটি ভাদু, বীরভূম জেলায় প্রসিদ্ধ।

"ভাদু ভাবিস ক্যানে। পাঁচ বিঘা জমি চাষ কৈরেয়েছি এই সনে।
তিন বিঘাতে ঝুলুর ধান গো। দু বিঘাতে বাসমতী।
ফসল হলো ভাবনা কিসের। কিনে আইনব তোব পতি।
ভাদু ভাবিস ক্যানে—
গৌব ববণ বব আনিব। দেখবেক গাঁযেব দশজনা
বযেস হবে ষোল বছর। কি মানাবেক বব-কৈন্যা।
ভাদু ভাবিস ক্যানে—
বনের পলাশ পাতা আনো। আইগনের ছাপড়া বানাব
বাবুদেব গ্যাস বাতি আনো। ছাপডা তলে জ্বালাব।
ভাদু ভাবিস ক্যানে—
ববেব আলোয গ্যাসেব আলোয। ফুটবেক কতো পদ্মফুল
সেই ফুল দেখো উ পাড়ার বিটি। দেখবেক চ'খে সইর্ষা ফুল।'

চতুর্থ গানটি টুসু, বীবভূম বাঁকুড়া মেদিনীপুব ও পুরুলিয়ায জনপ্রিয।

"টুসু সিনাছেন গা দোলাছেন হাতে তেলেব বাটি,
সুইযে সুইযে চুল পাড়ছেন, গলায ঝিঝিব কাঠি।
হাতে ত দিব শঙ্খ। বেশ লাগ্যেছে
গলায় ত গজমতি। বেশ সাজ্যেছে।"

পঞ্চম গানটি ভাঁজো গান, উত্তর বাঢেব লোকসমাজেব মধ্যে প্রচলিত।

"গোয়ালেতে গরু নাই ভাই ঘুঙুর কেন বাজে
চাল পানে চেয়ে দেখি কেষ্ট ঠাকুব নাচে।
ওপারে গাই বেযলে গাই-এর নাম হাসি
বাগলেকে গড়িয়ে দেবো পিতল বাঁধা কাঁসি।
ও লাজের মাথা খাও। পিতল বাঁধা কাঁসি।
শালুক ডাটাব ঘর করিলাম, নোকর পোকর করে।
কাল আনলাম পরের বেটি। ও লাজের মাথা খাও জলে ভিজে মরে।
কাঁতরা ভেঙে শাক বুনলাম, শাক দলমল করে।
শাক বিচে শেঁকা পেলাম সতীন কেঁদে মরে, ও লাজের মাথা খাও।

মোড়লের বাড়িতে ওল ফুললাছে, খেয়েছে কি না খেয়েছে
ও লাজের মাথা খাও গলা লেগেছে
আম ধরে থোকা থোকা তেঁতুল ধরে বেঁকা। হায় হায় তেঁতুল ধরে বেঁকা
নামাল দেশে দেখে এলাম, ও লাজের মাথা খাও, রাঁড়ীর হাতে শেঁকা।
মোড়লের বাড়িতে ভাই শত ঝুড়ি আকড়া। মোলনে কে কাঁকে নিয়ে
ও লাজের মাথা খাও। মোড়ল বাজায় লাকড়া।
বেউল বাঁশে বাঁকখান তেউর লতার শিকে। কেষ্ট কাঁধে ভার দিয়ে চলিল রাধিকে
ও লাজের মাথা খাও—
ভাঁজুই লো সুন্দরী মাটির গো সরা। আমার ভাঁজুইকে দেব ও মজার আবছা বেশ
পঞ্চফুলের মালা, ও লাজের মাথা খাও।
ও পারের নিম গাছটি নিম ঝলমল করে। কেষ্ঠঠাকুরের কোঁচা দেখে
ও লাজের মাথা খাও, মন ছটফট করে।
আলুন্দার বিলেরে ভাই সবেগি চরে। বগার পায়ে জোঁক লেগেছে, ও লাজের
মাথা খাও, বগি হেঁকে মরে।"

আরও উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকটি গানের কথায় যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে তা গানের সুরের মধ্যেও এসে গেছে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যহীন গান লোকসঙ্গীতের বিষয় নয়। লোকসঙ্গীতের একটি অংশ আচার-আচরণের সঙ্গে যুক্ত। আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার তাগিদে সে সঙ্গীত ও আচারের সৃষ্টি। এই জাতের সঙ্গীতে নারীসমাজের স্থানই মুখ্য।

সম্মান প্রাপ্তি, নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য আচার বিধিনিষেধ ও বিশ্বাস, মানসিক, উৎসর্গ, বাছবিচার প্রভৃতি নারীসমাজই পালন করেন। এগুলির অধিকাংশই ম্যাজিক ও যাদু লক্ষণাক্রান্ত। গর্ভবতী নারীর রাত্রে একা বাইরে যেতে নেই বা চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময় তাকে কোন জিনিষ কাটাকুটি করতে নেই—এ ধরনের সংস্কারের পিছনে পণ্ডিতেরা যাদুবিশ্বাস লক্ষ্য করেছেন। সন্তান লাভের আশায় পীরের দরগায় প্রার্থনা, সিরণী দেওয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখতে পাই। এজন্য পূজা, ব্রতানুষ্ঠান, মানসিক ইত্যাদিরও রেওয়াজ আছে। মুসলমান সমাজে বন্ধ্যা নারী সন্তান কামনায় 'সাইটোর' অনুষ্ঠান প্রতিপালন করেন। অনেকে বলেন ষষ্ঠী থেকে সাইটোর শব্দের উৎপত্তি। হিন্দুর চিন্তায় ষষ্ঠী দেবী হচ্ছেন সন্তান-

দাত্রী। বাঙালীর বিবাহে যে সব আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয় তা 'বাঙালী জীবনে বিবাহ' গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

আনুষ্ঠানিক ভাবে হিন্দু বিবাহের প্রকৃত সূচনা হয় হিন্দু সমাজের পাকা দেখায়। মুসলমান সমাজের কাবিননামায় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর অনুরূপ আচরণের দ্বারা। বিবাহপূর্ব যে অনুষ্ঠান তাতে গায়ে হলুদ, মেহেদী তোলা, খুবড়াকোটা, সোহাগ মাখা, খাওতা ভাঙান, বরস্নান, দুধের ধার শোধা প্রভৃতি নানা আচার দেখতে পাই। বিবাহকালীন আচরণ বরবরণ, শা-গজড় ইত্যাদি। বিবাহ-উত্তর অনুষ্ঠান বধূবরণ, পাকস্পর্শ, পাশাখেলা, বাসিবিবাহ প্রভৃতি। প্রত্যেকটি আচরণেই গান গাওয়ার রেওয়াজ আছে। দু একটি নমুনা উদ্ধৃত করছি। প্রথমে হিন্দু বিবাহের জলভরার গীত—

"ও তোরা আয় গো আয় সকলে। রাম সীতাকে স্নান করাবো সুশীতল জলে।
কস্তুরী মিশাযে জলে ঢেলে দাও গো রামের শিরে। সখি সকলে আয়গো মাজ কেটে আরো।
কুর হরিদ্রা বেটে আনো। ধোপার ছেলে ডেকে আনো সখি সকলে।
ছুতারের পিঁড়ি আনো। কুমারের কুম্ভ আনো।
গঙ্গা জল ভরে আনো সখি সকলে। কুমারের মুছি আনো
চারকোণার ছন আনো। আই-ও গণে ডেকে আনো সখি সকলে।

মুসলমান সমাজের বিয়ার গীত—

"পালকী আসেরে লিরলে লিরলে। হাতি আসে ঝিমিতে ঝিমিতে ববাতি আসে দুমালে দুমালে। পালকি না দেকিয়া বিবির বাপরে লাগিয়া দেবে বান্দানের ক্যাওয়াটরে। নাইকো মোরার ব্যাটিরে নাইকো মোরার পাটিরে। নাইকো মোরার হজরতের বিচানারে। ট্যাকা না দিমু শয়েরে শয়েরে। ট্যাকা না দিমু নিক্তির ওজনে য্যাইওনা কথা ও বিবির বাপরে শুনিয়া। খুলিয়া দিল বান্দানের ক্যাওয়াটরে আচে মোরার পাটিরে। আছে মোরার পাটিরে আছে মোরার হজরতের বিচনোরে।"

বিয়ের সময় চট্টগ্রামে এই গান গাওয়া হয়—

মা বাপ মোরে কি গইর্ল্যা। হাছছত টেগ্না খরচ গড়ি। কালা বউবা আইনলা।
বউ কালা আমার শরীল কালা। এইবার যাইয়াম বৈদেশে

কালা বউয়র জীবন থাকতে। না আইসাম আর দেশে।
কালা বধূর চুল কালা। সীতা পাড়ে বধূ মন পাকালা
সীতাপাড়ি কালাবধূ সুর্মা দিতে চায়। কালা বউযর মুখখান দেইলে পারাণ ফাড়ি যায়।
কালা চুলি অ-বন্ধুযা মোরে কিল্লাই ইঙ্কাবছ। ছদরঘাটর ভইন সোন্দরী ধাই গেইযে মরত।
মাযে দিল গঙ্গী কিনি আরঅ দিল বাতাসা। গেছেল গইত্ব কিনি দিল সাবান জলভাসা।

বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিবাহাচার খুবই জনপ্রিয়।

বাঙলার লোকসমাজ আরও নানাভাবে আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালন করেন, ব্যাধি ও মৃত্যুকে নিয়েও আছে নানা আচার-আচরণ। রোগ চিকিৎসায় দেবদেবীর পূজা, মানত, জলপড়া, সিবনী, ঝাঁড়ফুক, কবচ তাবিজ ধারণ ইত্যাদি। মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য হিন্দুরা পালন করেন শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য সংস্কার। মুসলমান পালন করেন কেয়ামত। তাঁরা মৃতের নামে দোয়া-দরুদ পড়েন ও দান খয়রাত করেন। যাঁরা এসব লোকাচারে অনুৎসাহ দেখান লোকসমাজ তাঁদের করুণার চোখে দেখেন। সুতরাং সামাজিক হতে গেলে এসব আচার অনুষ্ঠানকে অবজ্ঞা করতে পারেন না শহরের অত্যাধুনিক ব্যক্তিরাও।

জীবনবৃত্তের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন চাষাবাদকে সফল করার জন্যও আছে বিভিন্ন লোকাচার। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য লোকসমাজ বহুবিধ আচার-আচরণ পালন করেন। বৃষ্টির আহ্বানে ব্যাঙবিয়া, পুতুল বিয়া, বদনা বিয়া, হুকুম দেয়া, মেঘারাণী, বসুধারার ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বৃষ্টি থামাতে বাটি পোতা, ছড়া, আবৃত্তি ও অন্যান্য আচরণ অনুষ্ঠিত হয়। 'রেইন ইন ইণ্ডিয়ান লাইফ অ্যাণ্ড লোর' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

জমিচাষ, বীজবপন, ফসল রক্ষা, ফসল তোলা প্রভৃতির জন্যও আছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। খনার বচনে কৃষিকার্যের বিবিধ রীতিপদ্ধতি জানতে পারি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কীটপতঙ্গের অত্যাচার থেকে ফসল রক্ষার আচারও অনেক। কীটনাশে কৃষকেরা 'আলোডালো' অনুষ্ঠান পালন করেন। ফসল কাটার অনুষ্ঠান 'আওনি

বাওনি' ও 'বাতাডুনল', মুসলমান রাখালেরা পালন করেন 'মাগন'। চাষের সঙ্গে গবাদি পশুর যোগ অভিন্ন। গবাদি পশুর উন্নতির উপর চাষের উন্নতি অনেকটাই নির্ভরশীল। সুতরাং গবাদিপশু রক্ষাকল্পেও আছে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান। চাঁদবদনী, গো-বরণ, বাধনা, গো-ফাল্গুনী, গোরক্ষনার্থের সিরনী প্রভৃতি গরু রক্ষার্থে অনুষ্ঠিত হয়। বিড়ালকে তোষামোদ করা হয় ষষ্ঠী পূজায়। কাককে নিমন্ত্রণ জানানো হয় নবান্নে। সুফীপীরেরাও বহু আচার প্রবর্তন করেছেন বাঙলায়। সত্যপীর, গাজী-বিজয়, বনবিবির জহুরনামা প্রভৃতিতে পীর ও গাজী সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। পীরের উরস, মেলা প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয়। পীরের কেরামতি নিয়ে বাঙলায় বহু লৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। পীরপূজা পীরস্তুতি ও পীরাচার বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গে পরিণত হয়েছে। পীর উৎসবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যোগদান করেন।

নানাভাবে বিশ্বাস ও সংস্কারের জন্ম হয়েছে বাঙলায়। ওঝা, বৈদ্য, গুনীন, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, বেদে, ধাত্রী প্রভৃতি বাঙালীর নানা বিশ্বাস ও আচারের উদ্গাতা। মন্ত্রের সাহায্যে সাপের বিষ নামানো, ভূত তাড়ানো, গাছগাছড়া ও তুক-তাকের সাহায্যে চিকিৎসা, বশীকরণ, বাঘের আক্রমণ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য 'বন্ধন' হাতচালান, বাটি চালান, নখ দর্পণ, বাণমারা প্রভৃতিও বাঙালী জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে।

লোকগল্প ছড়া ধাঁধা প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি একদিকে বাঙালীকে সচেতন করে শিক্ষিত করে অন্যদিকে আনন্দ আহ্লাদে মাতায়। লোকবৃত্তের এমন কোন উপাদান নেই যা বাঙালীকে তার জীবন ভাবনায় উদ্দীপিত করে নি। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি শারীর ক্রীড়া অবসর বিনোদন ধর্মাচার আমোদ-প্রমোদ শিক্ষা থেকে জীবন সংগ্রামের যাবতীয় কৃত্য—কৃষিকাজ শিক্ষার কায়িকশ্রম বাঁচার আন্দোলন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—সর্বত্রই লোকবৃত্ত নানাভাবে এসে গেছে এবং তা রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক শাসন-শোষণ তর্জন-গর্জনকে স্বীকার করেও নিজ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে। নানা পথ ও মতের সমন্বয় সাধন করে বাঙালীর

লোকসমাজ নিজস্ব ঢঙে এগিয়ে চলেছে। তাই এখানে একের আনন্দে সমাজের আনন্দ একের অভাবে সমাজের অভাব, ব্যবহারিক জীবনে সকলে সকলের সঙ্গে জড়িত ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ঐক্যভাবনা সম্পন্ন। যখন এই ঐক্য বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দেয় তখন লোকবৃত্ত লোক সমাজকে শাসন করে। লোকবৃত্তের এই শাসন সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

জীবনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও বিপর্যয় যতদিন থাকবে, ব্যবহারিক জীবনে যতদিন থাকবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য ততদিন অসহায় মানুষ নানা ধরনের লোকবৃত্তের মধ্যে আশ্রয় খুঁজবেই। তাই শুধু গ্রামেই নয় কলকাতার পথে পথে শনিপূজার ধূম পড়ে গেছে, মোড়ে মোড়ে নানা ধরনের দেবতার থান নির্দিষ্ট হয়েছে, জ্যোতিষ, হস্তরেখা বিচার, কবচ তাবিজ, গ্রহরত্নাদির চাহিদা বেড়ে গেছে। লটারী অদ্ভুত জনপ্রিয় হয়েছে। টোটকা, চিকিৎসা, সরকারী ভাবে হাতুড়ে ডাক্তাদের মান্যতা দিতে হয়েছে, ওঝা, গুনীন, পীর, বৈদ্য প্রভৃতি এখনও জীবন্ত। পরীক্ষা বা মামলা অথবা অন্য যে কোন রূপ সাফল্যলাভের জন্য আরোগ্য লাভের জন্য মানত, চুলরাখা প্রভৃতি মানিয়ে নিতে হয়েছে। আঁটকুড়ে নাম ঘোচাবার জন্য সন্তানের জন্য—ছেলে অথবা মেয়ের জন্য, বিয়ের জন্য আচার অনুষ্ঠানের অন্ত নেই। উপবাস, প্রার্থনা, দণ্ডিকাটা, ভোলাবাবা পার করোদের ভীড় বেড়েই চলেছে।

সাধারণ মানুষ নানা ধরনের সংস্কার মান্য করে চলে। জ্যৈষ্ঠমাসে জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে দেয়া যায় না, মেয়েদের জোড়াকলা খেতে নেই, সন্ধ্যাবেলা মেয়েদের বিশেষ করে গর্ভবতী মেয়েদের এলোচুলে থাকতে নেই, বৃহস্পতিবার বা লক্ষ্মীবার টাকা লেনদেন করতে নেই, ভাত খেয়ে পাতে জল ঢালতে হয়, রাত্রে তিনবার না ডাকলে সাড়া দিতে নেই, উত্তর দিকে মুখ করে শুতে নেই, মাসের প্রথম দিনে যাত্রা করতে নেই, অশ্লেষা-মঘা অমান্য করতে নেই, শুভদিন বিচার না করে শুভকাজ করতে নেই, প্রভৃতি বিধিনিষেধের শেষ নেই। আধুনিক শিক্ষিত কিছু লোকের কাছে এসব বুজরুকী। কিন্তু তাঁরাও প্রয়োজনের সময় এসব অমান্য করেন না। সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রার শিল্পীদের মধ্যেও এ ধরনের সংস্কারের অভাব নেই। এই সংস্কারের বহু ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে অনেকে দাবী করেছেন। বহু সংস্কারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না তার বৈজ্ঞানিক বিচার করা হয় নি। বিশেষ করে জল-

আবহাওয়া সম্পর্কিত সংস্কার, কৃষিকাজ সম্পর্কিত সংস্কার, খাদ্যাখাদ্য বিচার সম্পর্কিত সংস্কারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে অনেকে মনে করেন। "The homeopathic magic of many cures in folk medicine has, of course, scientific basis of immunization through inoculation." কুসংস্কারের সংজ্ঞা নির্ধারণের ব্যাপারে সত্য কি অসত্য তা বিবেচ্য নয়। আরোগ্যের ব্যাপারে অনেক সময় মিথ্যা আরোগ্যও নানা রুগীদের আরোগ্য বিধান করে। "Another factor to be considered is that scientific truth is itself relative. In fact, much of the scientific truth of the past such as astrology lives on in the form of superstition. Who knows which of the present day scientific truth will withstand the test of time?"—আলান ডাণ্ডিসের এই মন্তব্যটি মনে রাখতে হবে।

লোকবৃত্তের প্রগতিশীল ধারা

প্রগতিশীলদের অনেকে মনে করেন যে মানুষের চৈতন্য তার অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে না, করে মানুষের সামাজিক চৈতন্য। সমাজের যে সত্তা, জীবনযাত্রার যে পদ্ধতি তদনুসারেই সমাজের চিন্তা, ভাবাদর্শ ও ধারণা গড়ে ওঠে এবং সমাজের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে জীবনধারণ ব্যবস্থার বিভিন্ন ধরনের প্রকরণ ও ধরন লক্ষ্য করলেই ভাবধারার যুগবৈচিত্র্যের কারণ বোঝা যায়। সমাজ-বাস্তবতার মূল সত্যটি ধরতে হলে লোকবৃত্তের ভিত্তি অনুসরণ করেই এগোতে হবে। কারণ সমাজের মননধারা সমাজের জীবনযাত্রা-ব্যবস্থারই প্রতিচ্ছায়া।

লোকবৃত্তে প্রতিফলিত হয় জীবনের বাস্তবতা। নাগরিক সমাজ-ব্যবস্থায় যে অনন্বয় লোকসমাজের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যুগবৈচিত্র্যের মধ্যে তা কখনও কখনও লক্ষিত হলেও অনিবার্য নয়। সমাজ-বাস্তবতার মূল সত্যটি ধরতে হলে তাই লোকবৃত্তের ভিত্তিতেই এগোতে হয়। জীবন সমাজ-নিরপেক্ষ নয় এবং সমাজ অর্থ-ধর্ম-রাজনীতিরই বাস্তবরূপ। সুতরাং লোকবৃত্ত আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয় রাজনৈতিক পরিবেশ সঙ্গে করেই এগোয়। তার মধ্যে আদর্শ এবং নৈতিকতার বীজ নিহিত থাকে।

লোকজীবন, লোকসংস্কৃতি ও লোকবৃত্তের আলোচনায় ঘটনার কার্যকারণ বিশ্লেষণ সম্ভব। চিন্তার সঙ্গে সত্তার সম্পর্ক, আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, জীবনের সঙ্গে আর্থ-ধর্মনীতির সম্পর্ক, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিবেশ নদনদীর সম্পর্ক, বৃত্তির সঙ্গে শিক্ষা ও চৈতন্যের সম্পর্ক—এ সবই লোকবৃত্তে প্রকটিত। তাই লোকবৃত্তকে অস্বীকার করে লোকজীবন তথা সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

লোকবৃত্তের প্রাণপ্রাচুর্য, ভাবৈশ্বর্য, রস-সৌন্দর্য, জীবনবৈচিত্র্য, চেতনা ও বাস্তবানুভূতি লোকজীবনকে আবৃত করে রাখে। তাই টলস্টয় বলেছেন আমাদের সকল সৃষ্টির উৎস নিহিত আছে জনজীবনের গভীরে। তা ধ্রুপদী শিল্প ও সাহিত্যের প্রেরণা, নতুন সৃষ্টির প্রেরণা, যে সৃষ্টির সঙ্গে মাটি ও মানুষের সম্পর্ক থাকে।

সঠিক উপকরণ চেনা না গেলে কোন্ উপকরণ কিভাবে কাকে অনুপ্রাণিত করে, গঠনমূলক, সৃষ্টিশীল ও প্রেরণামূলক কাজে প্রকৃত লোকবৃত্তের উপযোগিতা কোথায়, তা বোঝা যায় না। অতীত যুগ থেকেই লোকবৃত্ত নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ধ্রুপদী শিল্পকৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্য সৃষ্টির কাজে সব দেশেই উন্নত সমাজ লোকবৃত্তকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজিয়ে চলেছে। ব্রতচারী আন্দোলন করতে নেমে গুরুসদয় দত্ত লোকঐতিহ্যকে নাচ-গান কুচকাওয়াজে ব্যবহার করেছেন, সাহিত্য-কাব্য সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ-তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-সমরেশ বসু-জসীমউদ্দীন প্রভৃতি লোকবৃত্তের নানা অংশ ব্যবহার করেছেন। আব্বাসউদ্দীন-শচীনদেব বর্মণ-পঙ্কজকুমার মল্লিক-অপরেশ লাহিড়ী থেকে আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়-সলিল চৌধুরীরা লোকসঙ্গীতের ভাবে ও সুরে গান শুনিয়ে অনেককে উদ্দীপ্ত করেছেন। সমকালীন ভাবভাবনা, চিন্তাচেতনার আলোকে তাঁরা লোকঐতিহ্যকে নিয়ে এগিয়েছেন। রামায়ণ-মহাভারত যেমন প্রাচীন লৌকিক চেতনার প্রতিফলন, কার্ল মার্কসের দর্শন যেমন প্রাচীন আর্থ-সামাজিক চিন্তাচেতনার সংকলন, তেমনি উচ্চতর ও ধ্রুপদী বহু রচনায় প্রতিফলিত হয় লোকবৃত্ত। এমতাবস্থায় লোকবৃত্তবিদ্ অতীতের উপকরণ নিয়ে যেমন বিব্রত, তেমনি বিব্রত হন সমকালীন উপকরণকে নিয়েও।

মনে রাখতে হবে সাতশ বছরের অধিক বৈদেশিক সংঘাতের ফলে ভারতের উন্নত সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ব্যাহত হলেও লোকসংস্কৃতি নিজস্ব পথে এগিয়ে যেতে পেরেছে। পেরেছে বলেই ভারতবর্ষের লোকবৃত্ত সারা বিশ্বের লোকবৃত্তবিদ্দের আগ্রহ ও অধ্যয়নের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। লোকগল্পের আলোচনা ও বিশ্লেষণের দ্বারা

বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের মধ্যে সাংস্কৃতিক নিবিড়তা ও মনের ঐক্য খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

ভারতের একেক স্থানে একেক জলবায়ু, পরিবেশ ও পরিস্থিতি। এই অসম সহ অবস্থানের দরুন এদেশের মানুষ যেমন বিচিত্র, ততোধিক বৈচিত্র্য তাদের জীবনধারায়। প্রকৃতি যেখানে অকৃপণ সেখানে জীবনধারা উন্নত, যেখানে কৃপণ—সেখানে মানুষের জীবন নিদারুণ। তা থেকে মানুষে মানুষে নানা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি-গত ব্যবধান, যোগাযোগের ব্যবধান, চেতনার ব্যবধান, শহর ও পল্লীর ব্যবধান, পল্লী ও বন-পাহাড়াঞ্চলের ব্যবধান, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান, আমলা ও জনতার ব্যবধান, জাতিতে জাতিতে ব্যবধান, ধর্মীয়বোধ ও বিশ্বাসে ব্যবধান—নানাদিকে ব্যবধান, নানাদিকে বিচ্ছিন্নতা। এই ব্যবধানের মধ্যে, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, অনন্বয়ের মধ্যে, সমন্বয় ও সমতা কি ভাবে সম্ভব, তা লোকবৃত্তবিদের বিবেচনার বিষয়। তার জন্য তাঁকে লোকবৃত্ত ও লোকজীবনের গভীরে প্রবেশ করতে হয়, শুধুমাত্র কতকগুলো তাত্ত্বিক কথা বা ধার করা বনেদ অর্থাৎ "mere conceptual abstract analysis isolated from rural masses" কোন কাজে আসে না।

লোকজীবনের সমস্যা ও ঐক্যবোধ্য

লোকজীবনের প্রকৃত সমস্যা জানতে ও বুঝতে হলে লোকসমাজ, লোকজীবন, লোকবৃত্ত ও লৌকিক পরিবেশ সঠিকভাবে জানতে হয়। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের পার্থক্য, ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার পার্থক্য, লোকসমাজের সঙ্গে নাগর সমাজের পার্থক্য, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে লোক ও নাগর সমাজের মধ্যে যে ফারাক বা 'gaps and dichotomies' তাকেও জেনে নিতে হয়। তা করতে এসে অনেকে গ্রাম ও শহরকে নিশানা করেছেন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি লোক, লোকবৃত্ত ও লোক-জীবনকে চিহ্নিত করার আধুনিক মাপকাঠি গ্রাম ও শহর নয়। গ্রাম বলতেও সকলের ধারণা স্বচ্ছ নয়। সমস্ত গ্রাম ও সমস্ত গ্রামবাসীকে একই মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। গ্রামে গ্রাম্য সঙ্কীর্ণতা আছে, এই সঙ্কীর্ণতা থেকেও ঐক্য আসে। ঐক্যভাব দেখা যায় একান্নবর্তী পরিবার-ব্যবস্থার মধ্যে। পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তি এখানে কর্তা, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর সমস্ত পরিবার চালিত। গ্রাম চালিত পঞ্চায়েতের দ্বারা।

পঞ্চায়েত গ্রামবাসীর ঝগড়া মেটায়। গ্রামের উন্নতির ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালায়। গ্রামের হয়ে গ্রাম-প্রধান সরকারী লোক বা অন্যদের সঙ্গে কথা বলেন। জাতিভেদ প্রথাও গ্রাম্য ঐক্য বজায় রাখার অন্য মাত্রা। এর দ্বারা বিভিন্ন জাতির লোক এক-সূত্রে গ্রথিত থাকে। জাতির স্বার্থরক্ষায় জাতির সকলে এক হয়ে কাজ করে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, কাজেকর্মে, খেলাধূলায়, মেলা-উৎসবেও ঐক্যবোধ বজায় থাকে। দুর্বিপাক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতিতে ও বিবাদ-বিসংবাদ মেটাতে প্রায়ই গ্রামবাসী এক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এখন ঐক্য-ভাবনা একই বা সাবেক চরিত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই।

গ্রামীণ জীবনের গণতন্ত্র তার নিজস্ব চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয় নি। দারিদ্র্য দূর করার ব্যাপারে যতটা সচেষ্ট হওয়া দরকার গ্রামবাসী ততটা সচেষ্ট নয়। দারিদ্র্যকে অনেকে বিধাতার অভিশাপ বলে মনে করে। অনেকেই আলস্যকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছে না। ঈশ্বর যেটুকু দিয়েছেন তার বেশী পাওয়াকেও অনেকে ভাল চোখে দেখে না। তাই অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো গেলেই গ্রামের উন্নতি হবে, এ কথা যাঁরা বলেন তাঁরা সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম ও গ্রামীণ চরিত্রকে বোঝেন বা জানেন তাও বলা যায় না। অর্থনৈতিক, কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের যেমন দরকার, তেমন দরকার গ্রামীণ মানুষদের চিন্তা-ভাবনা, স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধকে সম্মান করা। চিন্তায় বিপ্লব আনয়ন করা। তার জন্য প্রচেষ্টা চাই।

ব্যক্তি ও সমাজকেন্দ্রিক প্রচেষ্টাকে সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন 'অ্যাচিভমেণ্ট মোটিভেশন', এর দ্বারা নতুন এক ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের বিদ্যালয় সমূহ গ্রামবাসীদের মধ্যে নতুন এক শ্রেণীর ক্ষমতাবান গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে। নতুন ক্ষমতাবানদের অনেকেই তাকিয়ে থাকে শহরের দিকে, শহর ও গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার দরুন তাদের নতুন মর্যাদা। অনেক ক্ষেত্রেই এদের চিন্তা নিজের উন্নয়ন পরিবারের উন্নয়ন ব্যাপারে যত স্পষ্ট, তত স্পষ্ট নয় গ্রামের উন্নয়ন সমষ্টি উন্নয়নের ব্যাপারে। গ্রামীণ সংস্কৃতির চেয়ে শহরের নাগরিক সংস্কৃতির জৌলুস তাদের অধিক আকৃষ্ট করে। গ্রাম উন্নয়নের সুবিধা-সুযোগ এই শ্রেণীরই করতলগত। তাতে গ্রামের সাধারণ মানুষ পীড়িত হয়। এক গ্রামে একাধিক জীবনধারা। বিভিন্ন ধারার বিভিন্ন গতি। সমস্ত ধারা ও গতি সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন না করলে গ্রামীণ জীবনের সার্বিক রূপ স্পষ্ট হয় না। গ্রামবাসী কি চায়, সুখীজীবন বলতে তারা কি

বোঝে, তা তাদের নিজস্ব চেতনা থেকে, নিজস্ব ভাবধারা থেকে না জেনে শহরের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত চেতনার দ্বারা জেনে গ্রাম, গ্রাম্যজীবন এবং গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বোঝবার ও বোঝাবার ফলে এবং সেই ভাবে গ্রামোন্নযন পরিকল্পনা প্রস্তুত করার ফলে বাস্তব অবস্থা ও ভিত্তির সঙ্গে কর্তাদের বোধের ও পরিকল্পনার ফারাক থেকে যাচ্ছে। তার ফলে গ্রামোন্নয়নের নামে অর্থব্যয় হলেও উন্নযন হয না। উন্নয়নের ব্যাপারে কি ধবনের কাজ প্রাধান্য পাবে, কি ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে তা বাস্তবত-সম্মত না হযে পুথিগত বিদ্যার সাহায্যে রচিত হচ্ছে। অবাস্তব পবিকল্পনা কবলে তার ফল এরকমই হবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

মনে রাখতে হবে যে গ্রাম, গ্রামীণ জীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতি বুঝতে হলে সাধারণ মানুষের প্রযোজন-অপ্রযোজনকে বুঝতে হয। মনে রাখতে হয়, তাদের প্রয়োজন-অপ্রযোজনের সঙ্গে প্রকৃতির দান মিলেমিশে আছে। বিভিন্ন তথাকথিত গ্রামসমীক্ষা ও কর্তাদের ভাষণাদিতে যা প্রকাশ তাতে এই মুহূর্তে বেঁচে থাকার জন্য কিছু অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা গেলেই সমস্যার সমাধান হবে। খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থান মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন। কিন্তু তার দ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যায় না। এ জিনিসটাও বুঝতে হবে। মানবিক অধিকার, নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ছাড়া কোন মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। ভুখা মানুষকে অনন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে বন্দীজীবন যাপন করতে দিলে সে পালিয়ে বাঁচে। ঐশ্বর্যের চেয়ে মুক্ত জীবন তার অধিক কাম্য। তাই গ্রাম থেকে আগত শহরের ভিখারীরা ভিক্ষা করে, নানা প্রকার কষ্টসহিষ্ণু কাজ করে, একবেলা খেয়ে, ফুটপাতে শুয়ে জীবন কাটালেও বাবুদের বাড়ীতে কাজ করতে উৎসাহ পায় না। সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরেও কেউ যদি কোন কাজে ঢোকে তবে আবার পালিয়ে যায়। পালিয়ে যায় মুক্ত জীবনের আনন্দ উপভোগ করার জন্য। সে আনন্দের কাছে যে-কোন কষ্ট যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে ওরা রাজী। স্বর্ণ শৃঙ্খলে বন্দী থাকলেও সেখানে আছে শৃঙ্খলিত জীবনের অতৃপ্তি। সকলেই চায় বাঁধন থেকে, শোষণ থেকে মুক্তি। নিজের চিন্তা-চেতনা মাতৃভাষা ও বোধানুযায়ী জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাবার প্রেরণা সকলেরই থাকে। স্বাতন্ত্র্যবোধ, পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও পিতৃপুরুষের ধ্যানধারণাকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে সকলেই চায়। তাই শুধু মজুরী বাড়াবার দ্বারাই শ্রমিকদের সেবা করা যায় না। মজুরী বাড়াতে হবে বাঁচার তাগিদে। কিন্তু শুধু মজুরীর টাকা নিয়ে তারা তৃপ্ত

নয়। টাকার পাহাড়ের উপর বসে থেকেও যদি কেউ মানবিক মূল্যবোধ ও মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয় তবে সে টাকা যেমন কোন সপ্রতিভ লোকের কাম্য হতে পারে না, তেমনি তা গ্রামবাসীরও কাম্য নয়। তারা মুক্তি চায় শোষণ থেকে, অদৃশ্য তাণ্ডবের হাত থেকে, মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে। নিজেদের ভাবনাচিন্তা, সংস্কৃতি ও চেতনাকে প্রসারিত করতে চায়। নিজেদের মতো করে পূজা-অনুষ্ঠান, আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়াকৌতুক, ঐক্যভাবনা নিয়ে শান্তি পেতে চায়। এ সবের দ্বারাই তাদের মোটিভেশন্যাল স্যাটিসফ্যাকশন বা সঞ্চালন শক্তি জনিত পরিতোষ বা তৃপ্তি আসে। এ তৃপ্তি টাকা দিয়ে কেনা যায় না। টাকা দিয়ে মানবিক মূল্যবোধকেও খর্ব করা যায় না। এ ব্যাপারটা বুঝতে হবে। বারট্রাণ্ড রাসেল যথার্থই বলেছেন—"Unless men increase in wisdom as much as knowledge, increase of knowledge will be increase of sorrows."

প্রকৃতি নিজের ইচ্ছামত গ্রামজীবনকে গড়ে তুলেছে। কৃষিকাজ হচ্ছে গ্রাম্য সমাজ সংস্থার মৌলরূপ। তাই কৃষিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানাধরনের আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান। কৃষিকর্মের চরিত্র অনুযায়ী গ্রামীণ সমাজের প্যাটার্ন গড়ে ওঠে। অবসর বিনোদনের ব্যাপারে, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণের ব্যাপারে, আদব-কায়দা ও জীবনবৃত্তের নানা ঢঙে গ্রামবাসী নিজস্ব দ্রব্য বা বস্তুর প্রতি অনুরক্ত, লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও লৌকিক উপাদান-উপকরণের প্রতি আকৃষ্ট, সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রতি, গ্রাম্য দেব-দেবীর প্রতি আস্থাশীল।

গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচীতে সামন্তপ্রথার অবসান, গ্রামীণ সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং অভাব অনটন থেকে মুক্তি দেবার ঘোষণা দেখি। সরকারী পর্যায়ে গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা নেয়া হয় ১৯৫২ সনের ২রা অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য গ্রামের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্তরের উন্নয়ন। কিন্তু গত ত্রিশ-বত্রিশ বছরের পরিকল্পিত উদ্যমের দ্বারা গ্রামজীবনকে কতটা সপ্রতিভ ও নিজস্ব জীবনবোধের দ্বারা চালিত করা যাচ্ছে, তা বিতর্কের বিষয়। গ্রামীণ জীবনের সার্বিক মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেছে বলে মনে হয় না। যা ঘটেছে তা একটি সুযোগসন্ধানী শ্রেণীর সৃষ্টি, যে শ্রেণী প্রাচীন বোধ ও চিন্তাচেতনা থেকে, পরম্পরাগত ঐতিহ্যচেতনা থেকে একটু দূরে সরে যেতে চাইছে শহরের জৌলুস ও চাকচিক্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে। গ্রামের যে প্রয়োজনভিত্তিক উন্নয়ন হচ্ছে না তার অন্যতম কারণ

অনেকের মতে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। দারিদ্র্যের অর্থই হলো ভোটের ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্ক ভাঙতে কেউই উৎসাহী নয়। তাই ভারতবর্ষের শতকরা চল্লিশ ভাগ গ্রামবাসী অতি দরিদ্র। এই দরিদ্রদের কজন উন্নয়ন পরিকল্পনার সুযোগসুবিধা উপভোগ করতে পারছে? সমাজবিজ্ঞানীদের মতে ভারতের বৃহৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শতকরা পাঁচ কি ছভাগের বেশী উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা লাভবান হচ্ছে না, অথচ জাতীয় আয়ের শত-করা পঁযতাল্লিশ ভাগ আসে গ্রাম থেকে। গত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শতকরা সাতাশ ভাগের মতন বরাদ্দ হয়েছে গ্রামের উন্নতির জন্য। অর্থাৎ গ্রাম থেকে আমরা কি পাই এবং তার পরিবর্তে গ্রামকে কি দেই তা তলিয়ে দেখার দরকার আছে। এই অবস্থায় ও স্বাভাবিক কারণে গ্রাম পরিবর্তিত হচ্ছে। গ্রাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সংস্কৃতি ধ্বংস হচ্ছে, লোকবৃত্ত অবক্ষয়িত হয়ে ধ্বংস হচ্ছে, এ ধরনের আর্তনাদ শুনতে পাই। কিন্তু আদতে ব্যাপারটা কি তা তলিয়ে দেখতে চাই না। আসলে বিত্তবান বা বিত্তশালী মানুষেরা গ্রামবাসীর আতঙ্ক। তারা আধ্যাত্মিক উন্নতির বাধা, সংস্কৃতি ও পরম্পরাগত ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীন, পরমার্থের জন্য অর্থাৎ অর্থপ্রাপ্তির জন্য নানা প্রকার অযথার্থ কাজ করতে সিদ্ধহস্ত। অনেকে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করতে গিযে, নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে গিয়ে, অপসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে। গ্রামবাসী তাই আতঙ্কিত। আতঙ্কিত এই বুঝি তাদের সংস্কৃতি ধ্বংস হলো, এই বুঝি পরম্পরাগত ধ্যানধারণার বিদায় হলো, এজন্য। এই কারণেই বহু গ্রামবাসী আর্থিক স্বচ্ছলতা থেকে দূরে থাকতে চায়। আত্মিক উন্নতির চিন্তা গ্রামবাসীর মনের অনেকটা স্থান দখল করে আছে। পরম্পরাগত ঐতিহ্যচেতনা ও পিতৃপুরুষের ধ্যানধারণা তাদের জীবনকে মাতিয়ে রাখে। এই ব্যাপারটাও বুঝতে হবে। বুঝে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা কাজে লাগাতে হবে। গ্রামের মানুষদের আত্মমর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক চেতনাকে মর্যাদা দিতে হবে। শুধু ভাঁওতা দিয়ে নিজেদের প্রযোজনে কিছু 'ডোল' দিয়ে নির্বাচনের আগে কিছু মুনাফা পাইয়ে দিয়ে গ্রাম অথবা গ্রামবাসী কাউকেই বাঁচানো যাবে না। মৌল সংস্কৃতিকেও রক্ষা করা যাবে না। তা করা যাবে তাদের জীবনের সমস্যা ও ঐক্যবোধকে, পরম্পরাগত সংস্কৃতিক চেতনাকে মর্যাদা দিয়ে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তজ্ঞানকে সম্মান করে।

লোকবৃত্ত অনুশীলন কেন

এই অধ্যায়ের নানাস্থানে বারংবার বলেছি যে জনমানসের বিচিত্র প্রকাশ লোকবৃত্তে। স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগের দ্বারা লোকসমাজ নিজেদের মাতিয়ে রাখে। তাতে তাদের নিজস্ব ছাপ ধরা পড়ে। নিজস্ব সংস্কৃতি বিকশিত হয়। নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্ট হয়। এ সংস্কৃতি ও সাহিত্যে জীবনের চিত্র অঙ্কিত থাকে। ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পবিবেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতিব বিকাশ ঘটে, কালচারাল কমপ্লেক্স সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার লোকবৃত্তের বিভাব ও প্রকাশ ঘটেছে। রামায়ণ-মহাভারত, বেদ, উপনিষদ, পুবাণ-উপপুবাণ থেকে বৌদ্ধ-জৈন-ইসলাম, খ্রীস্টান সমাজেব ধর্ম ও জীবনচেতনা বাঙালীর লোকসমাজকে প্রভাবিত করেছে। কি ভাবে কোন্ উপাদান কোন্ পথ অনুসরণ করে লোকসমাজে অনুপ্রবেশ করে, কি ভাবে তা গৃহীত বা বর্জিত হয়ে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগেব সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে লোকবৃত্তের বিশ্লেষণ-মূল্যাযনে তা জানা সম্ভব। তার জন্য ইতিহাস দর্শন পুরাবৃত্ত, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য, মনোবিদ্যা প্রভৃতির জ্ঞান দরকার হয়। ছড়া, গান, গীতিকা, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, ধাঁধা, প্রবাদ, পুরাকাহিনী, ধর্মকথা, মন্ত্রতন্ত্র থেকে বিভিন্ন বস্তু উপকরণের গড়ন, উৎপাদন, ব্যবহার-প্রণালীব ব্যাখ্যায় জানা যায় লোকজীবনের জ্ঞানকে। চেনা যায় সঠিক দেশ ও জাতিকে। সেজন্যই ভারতবর্ষকে জানতে এসে বিদেশী ভারতপথিকের দল লোকবৃত্ত অনুশীলনের দিকে ঝুঁকেছিলেন। ফ্রান্সিস বেকন থেকে ম্যাক্সমূলার, অ্যানড্রুল্যাঙ এবং ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতমণ্ডলী ফ্রানজ বপকে সঙ্গে নিয়ে যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে ইন্দো-জার্মান ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন তাতে লোকপুরাণ বিশেষ মর্যাদা পায়। ম্যাক্সমুলার ভারতীয় ও গ্রীক লোকপুরাণের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে হারানো শব্দের মানে খোঁজার দিকে মনোনিবেশ করলেন তা ভারতের লোকপুরাণ চর্চার একটি জানালা খুলে দেয়। যদিও মূলারকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং শেষ অবধি মূলারের ব্যাখ্যাকে অনেকেই বর্জন করেছেন, তবু তা একেবারে পরিত্যক্ত হয় নি। আধুনিক লোকবৃত্তবিদদের অনেকে আবার ইউরোপীয় লোকগল্পের উপর ভারতীয় লোকগল্পের প্রভাব মান্য করতে আরম্ভ করেছেন। ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার যে ধারা অনায়াসে মহেনজো দারো-হরপ্পা অবধি অনুসরণ করা যায় তা ইউরোপে একমাত্র গ্রীস

ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রীস উন্নতির চরম শিখরে উঠে আধুনিক বিজ্ঞানকে স্বাগত জানাতে থাকলে লোকবিজ্ঞান বা লোকবৃত্তকে অমান্য করে চলে। কিন্তু ভারতবর্ষ লোকবৃত্তের ধারাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। বিদেশী প্রভাব-বিরোধী স্বদেশী প্রত্যয়কে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে ভারতবর্ষ এখনও এগোতে পারছে। ঐতিহ্যানুগত ভারতীয় চিন্তাচেতনা ভারতের লোকবৃত্তে আশ্চর্য সুন্দর ভাবে ধরা দিয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যই আমাদের লোকগল্পকে বিশ্বের দরবারে নতুন মর্যাদা দিয়েছে। ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখে বাঙলার লোকগল্পের আলোচনায় পূর্ব জার্মানীর হাইনৎস মোড়ে বাঙলার লোকগল্পের বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে অর্ধমানব অর্ধদেবতারা হচ্ছে কোন এক প্রাচীন অথবা স্বয়ংপ্রধান জীব যারা পরে দৈত্য-দানোর জগতে বিলীন হয়ে গেলেও আদিম কৌমস্তরের পৌরাণিক ও ধর্মীয় গণ্ডিতে বিকশিত একটি শ্রেণী। বিভিন্ন দেবদেবী যখন বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারদের বাহনে পরিণত করেন, অর্ধমানব-অর্ধদেবতা-অর্ধপশুদের নিয়ে প্রাকৃত মানুষ যে-সব গল্প ও কাহিনী রচনা করে তা সংস্কৃতিগত দিক থেকে পরিমার্জিত উন্নত সমাজের রীতিনীতি ও চিন্তাভাবনার প্রতিফলন। এই কাহিনী জন্তু জীবন থেকে মানব জীবনে উত্তরণের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। ইভলিউশন বা বিবর্তনের ধারা এইসব কাহিনীর মধ্যে লক্ষণীয়। লোকগল্প বিষয়ক অন্য একটি গ্রন্থে (দেশবিদেশের লোকগল্প আলোচনা ও সংকলন) দেখিয়েছি মানব মনের ঐক্য দেখনে লোকগল্পের তুলনা নেই। এই ঐক্যের মধ্যে খেয়াল করা যায় যেমন স্থানীয় বৈশিষ্ট্য তেমনি বিশ্বচেতনার ধারা।

বাঙলার ছড়ার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছড়াকে শারদাকাশের মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর মধ্যে একদিকে প্রকাশিত পরিণত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জীবনকথা, অন্যদিকে কৃষি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান। ছড়ার মধ্যে যে সামাজিক চিন্তা সেই চিন্তা গীতিকা, গাথা, সঙ্গীতাদির মধ্যেও বর্তমান। তবে এইসব উপাদানের মধ্যে সর্বদাই সহজ-সরল লোকচরিত্র পরিস্ফুট হয়, একথা বলা যায় না। গোষ্ঠীচেতনা যেখানে ব্যক্তিচেতনায় পর্যবসিত হয় নি শুধু সেই সব লৌকিক উপকরণের মধ্যেই লোকচরিত্র স্পষ্ট।

বাঙলার লোকবৃত্তে যেমন বৈচিত্র্যের অন্ত নেই, বাঙলার লোকজীবনেও তেমনি নানা বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। নদীর প্রবাহ এবং দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির পরিবেশে স্মৃতি-চারণের প্রয়াস থেকে রচিত হয়েছে ভাটিয়ালী গান পূর্ববঙ্গে। আবার পশ্চিমবঙ্গের

বাঙলার লোকবৃত্ত : আধুনিক ভাবনা

এই অঞ্চল বাঁকুড়া-বীরভূম-পুরুলিয়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং-রাই-জলপাইগুড়ি-কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে এর প্রভাব নেই। সেখানে আছে ভাদু, টুসু, বোলান, ভাওয়াইয়া-চটকা, গম্ভীরা প্রভৃতির কদর। একেক অঞ্চলে একেক রকম লোকসঙ্গীত প্রভাব বিস্তার করেছে। একেক রকম লোকবৃত্ত বিকশিত হয়েছে। যে ধরনের লোকবৃত্ত কোন এক বিশেষ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সে ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোকবৃত্ত অন্য অঞ্চলে পাওয়া যায় না। সেজন্যই লোকবৃত্তের বৈশিষ্ট্য লোকজীবনের বৈশিষ্ট্যকে জানিয়ে দেয়।

আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোকবৃত্তের যোগ অচ্ছেদ্য। কিন্তু লোকগল্প স্বতন্ত্র। সহজেই তা এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়। বিশেষ কোন দেশে উত্তীর্ণ হয়ে সেই দেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্থায়িত্ব পায়। সেজন্যই একেক দেশের লোকগল্প একেক রকম। তা হলেও সব গল্পের অভিপ্রায় বা মোটিফ ঐক্যভাবনা সম্পন্ন। অভি-প্রায়-বিভাগ বা মোটিফ ইনডেক্স লোকবৃত্তবিদ্‌দের কাছে আকর্ষণীয়। শুধু অভিপ্রায় বিভাগ করলেই হয় না। লোকগল্পের জন্ম, আঙ্গিক, বাকরীতি, বার্তা, বিন্যাস-ভঙ্গি, চরিত্র ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করতে হয়। আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে হয় ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন, সংস্কার, বিশ্বাস, লোকপুরাণ, গাথা, গীতিকা, কিম্বদন্তী প্রভৃতি নিয়েও। এ সবের উপর যে কাজ এ যাবৎ হয়েছে এদেশে তাতে সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ পর্যাপ্ত নয়। তাত্ত্বিক আলোচনা অগভীর।

বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের দিকে চকিত চাহনি দিলে দেখা যাবে মধ্যযুগের বাংলায় শাক্তধারা ক্ষীণ হয়ে বৈষ্ণব ধারা অবলম্বনে যে শিল্প সাহিত্য গড়ে ওঠে লোকে তা লোকসাহিত্যের প্রভাব স্পষ্ট। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন "বৈষ্ণব সাহিত্য, প্রধানত বৈষ্ণব পদাবলীর মৌলিক প্রেরণা লোকসাহিত্য থেকে এসেছে। তারপর তা যখন এক সমৃদ্ধ শিল্পসম্মত রূপ ধারণ করল তখন তা আবার লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করল। পশ্চিমবাংলায় তার পরিচয় ঝুমরে, পূর্ববাংলায় তার পরিচয় ঢপকীর্তনে। তা থেকে লোকনাট্য, কৃষ্ণযাত্রা নতুন প্রেরণা লাভ করেছে। গোপিনীখেলা, ধামালী ইত্যাদি পুষ্টিলাভ করেছে এবং লোক সংস্কৃতির কত ক্ষেত্রে যে তার প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তা হিসাব করে বলা যাবে না।

শাক্ত সাহিত্যের প্রথম স্তর লোকসাহিত্য, যেমন চাঁদসওদাগর, ধনপতি সওদাগর কিংবা লাউসেনের কাহিনী সমাজে যখন প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল তখন তা মৌখিক রূপেই

প্রচারিত হযে লোকসাহিত্যের স্তরে আবদ্ধ ছিল। তারপর তাদের সেই মৌখিক রূপ অবলম্বন করে তা কাব্যের আকারে লিখিত হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে লোকসাহিত্যের বহু লক্ষণই আত্মরক্ষা করলো।…লোক সাহিত্য ধর্মীয় বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে তার ক্রমবিকাশের পথ রুদ্ধ হবার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পালি সাহিত্যের জাতক। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীগুলি লোককথার বিশুদ্ধ নিদর্শন ছিল। এই জাতকের রাজ্যে প্রবেশ করে ভারতের বহু প্রাচীন উপকথা যেমন ক্ষুদ্রতর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হযে পরিণামে বিলুপ্ত হয়েছে তেমনই লোককথা রূপকথার ক্ষেত্র থেকেও ব্রত-কথার রাজ্যে প্রবেশ করে বাংলা লোক সাহিত্যের একটি বিপুল অংশ লুপ্ত হযে থাকার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।" লোকসাহিত্যেব বহু গবেষক লুপ্ত অংশ উদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন বলে শুনি, লুপ্ত রত্নোদ্ধার কতোটা হযেছে জানি না।

মনে রাখতে হবে কোন লৌকিক উপকরণ যখন কোন বিশেষ আধারে গিযে আবদ্ধ হয তখন তা পরিবর্তিত জীবনের বার্তা বহনে অপারগ হয়। সে একটি বিশেষ ব্যবস্থার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। লোকবৃত্ত বিশ্লেষণের দ্বাবা লোকবৃত্তবিদেবা এই পরিবর্তন ও বিবর্তনের আভাস দিতে পারেন। লোকবৃত্ত সাহিত্য সংস্কৃতি ও ধর্ম-চেতনাকেও পুষ্ট করে এবং শক্তি যোগায।

লোকসমাজের বিবর্তন মানে চেতনার বিবর্তন। চেতনার বিবর্তন মানে ঐতিহ্য-বিমুখিতা নয়, পরম্পরাগত ধারা থেকে সরে সরে যাওযা নয। তাকে আঁকড়ে সমযেব সঙ্গে তালে তালে এগিযে যাওযা। দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারার পরিবর্তন হয়। কৃষিকর্মের প্রাচীন পদ্ধতির যেমন পরিবর্তন হয় তেমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামী চেতনা নতুন চরিত্র পায়। শিল্পাগ্রসরতার জন্য বাঙলার গ্রামের অনেক কৃষি জমি শিল্পনগরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বন কেটে বসত বানাবার ফলে, পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে, উদ্ভিদ উৎখাতের জন্য পশ্চিমবাঙলার গ্রামীণ জীবন বিপন্ন। সহজ সরল সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত। তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ব্যাহত। মৌলিক সৃষ্টি তাই স্তব্ধ হওয়ার মুখে। কিন্তু কোন মানুষই কূপমণ্ডূক হযে বাঁচতে পারে না। তাই সৃষ্টিও স্তব্ধ হতে পারে না। ঐতিহাসিক কারণে তা নতুন রূপ নেয়। সুতরাং লোকবৃত্ত অবলুপ্ত হবে এ ধরনের চিন্তার দ্বারা আমরা চালিত হতে চাই না। তাই না-বুঝে সংগ্রহের ব্যাপারেও মদত দিতে চাই না। অনেকেই সংগ্রহ কর্মে জ্ঞানত বা অজ্ঞানতাবশত অনেক অপকর্ম করে এসেছেন যা লোকবৃত্তের বহু ঐতিহাসিক

ত থাকে অতলে ডুবিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের সংগ্রহ বা গবেষণা যাতে প্রশ্রয় না পায় তা খেয়াল রাখা প্রত্যেকটি সৎ লোকবৃত্ত-কর্মী ও গবেষকের অবশ্য কর্তব্য।

লোকবৃত্তের সঠিক সংগ্রহ না হলে অথবা সংগ্রাহকের খেয়ালখুশীমত শব্দ বা অক্ষর পরিবর্তনের দরুন কি ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে তার একটি উদাহরণ রাখছি সুকুমার সেনের রচনা থেকে। "টঙ্কা-ভেঙে শঙ্কা দিলুম"·· এখানে শঙ্খ হয়েছে শঙ্কা—টঙ্কার জোরে। হয়তো মূলে ছিল 'টাকা ভেঙ্গে শাঁখা দিলুম'।···কোন কোন শব্দে এতটা বিকৃতি হয়েছে যে মূল রূপে পৌছনো অত্যন্ত কঠিন। যেমন, 'নাচনি গেছে কাচনি পাড়া এখানে থই পেতে হলে পুরাণো সাহিত্যে কিছু জ্ঞানের আবশ্যক হয়, অন্তত "কোঁচিনীর বা বাগদিনীর পালার পরিচয় থাকা চাই। আসলে ছিল 'নাচুনি গেছে কোঁচুনি পাড়া'···'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান'—এখানে সপ্তমীর অর্থে নদী মোটেই ভুল নয়। জানি না কার পরামর্শে রবীন্দ্রনাথ একদা পদটিকে ভুল মনে করে বদলে দিয়েছিলেন' 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান'। ছড়ার বান ডাকে নদীতে, নবদ্বীপে নয়। সেখানে একদা ডেকেছিল ভক্তির বান।" অর্থাৎ লোকবৃত্তের সংগ্রহ বা সংরক্ষণে কারোর স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়। এক একটি শব্দ ভাষাবিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তোলে। তাঁরা নানাভাবে হারিয়ে যাওয়া শব্দের মানে খোঁজেন। এই পথ দেখিয়েছেন ম্যাক্সমুলার। তিনি দেখিয়েছেন "Zeus, the Great God of Greek mythology, can be etimologically traced to Sanskrit word dyu meaning sky or day and to the sky god, Dayus, of Indian mythology." ই. বি. টাইলরও এই চাবি ব্যবহার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, "the forgotten meaning of a Tamil proverb can be deciphered in a custom of the more 'Primitive' Koravans... While Muller traced the meaning of myths to the distant past in the history of language, and Tylor and Lang uncovered the original meaning of oral literary materials in an earlier evolutionary stage myth-ritual theorists declared that original meaning of traditional narratives derives from their connection to ancient rituals which have die out." এমতাবস্থায় সংগ্রহ সঠিক না হলে বিশ্লেষণে ভুল থাকবেই।

অনেক সময় একই সংগ্রহের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় সংগ্রহের আদিরূপ বুঝতেও অসুবিধা হয়। তখন তা লোকজীবনমুখী বাস্তব চেতনা থেকে বুঝে নিতে হয়। যেমন সুকুমার সেন লিখেছেন "কানার হাতে লাটি, শীতকালের সাটি', মেয়েলী-ছড়ায় সংস্কৃত শব্দ ('শাটী') তো আসার কথা নয়। এল কোথা থেকে? উত্তর সহজ, এসেছে লাটির দরুন। অর্থাৎ লাটির সঙ্গে মিলের খাতিরে। কিন্তু এমন কাণ্ড ছড়ায় হয় কি করে? একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে গোড়ায় যে ছড়াটি ছিল তা হয়ত এই রকম—'কানার হাতের নড়ি, শীতকালের শাড়ি'। একদা সুপরিচিত 'নড়ি' কালক্রমে অপরিচয়ের ও অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে যাওয়ায় তার স্থান নিয়েছিল লাটি, সেই লাটির ঘায়েই 'শাড়ি' শাটি হয়েছে।" অর্থাৎ একটি শব্দ পণ্ডিত-গবেষককে ভাবিয়ে তুলেছে। সুকুমার সেনের ব্যাখ্যাটি চমৎকার হলেও দ্বিতীয় চিন্তায় গ্রহণ করতে বাধবাধ ঠেকছে। কারণ গ্রাম বাঙলার খোঁজখবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন শটি হচ্ছে হলুদ জাতীয় ওষধি বিশেষ। তার কন্দ দিয়ে পালো তৈরী হয়। আলু বা আদার মত এই দ্রব্যটি শীতকালে মাটির নীচে জন্মে। প্রভূত পরিশ্রম সহকারে ও নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রামবাসী শটি থেকে পালো উৎপন্ন করে, যা একদিকে রোগীর পথ্য অন্যদিকে মোহনভোগের ন্যায় সকলের আহার্য। এর আর্থিক মূল্যও যথেষ্ট। শটিকে মিহি করে চূর্ণ করে জলে গুলে মাটির হাঁড়িতে রেখে দেয়া হয়। ঘোলাজলে ফিটকিরি দিয়ে রাখলে যেভাবে মাটি গিয়ে নীচে জমা পড়ে সেভাবে পালো হাঁড়ির নীচে জমা পড়ে। পাঁচ-ছয় দিন এভাবে প্রথমদিনের জমানো পালো ধুইয়ে তার তিতাভাব কাটান হয়। তারপর রোদে দিয়ে শুকিয়ে নিতে হয় আমসত্ত্বের ন্যায়। শটির মানে শুষ্ক (দ্র. পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান)। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে শীতকালের শাটি-কে শটিফুড বা পালো হিসাবে গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। আর তাতে ছড়াটিকে অকৃত্রিম হিসাবে গ্রহণ করতেও অসুবিধা দেখি না।

সংস্কৃতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসাহিত্যের ভাষারও যে বিবর্তন হয় তা তো জানা কথাই। তাই এখন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব। কারণ ভারতবর্ষ খণ্ডিত হলে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিম-বঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় লোকদের মেলামেশার দ্বারা উভয়ের মধ্যে দেয়া-নেয়া চলছে—যেমন এ বাঙলায় তেমন ও বাঙলায়ও। কৌলীন্য বর্জিত ও

কৃত্রিমতামুক্ত লোকভাষা সুপ্রাচীন কাল থেকে মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাষা-বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে এর সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে এর আসল বা আদিরূপ ধরা পড়ে। লোকবৃত্তশাস্ত্রে এই পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি।

লোকবৃত্তের জীবনমুখী ভাব ও ভাবনা

মনে রাখতে হবে দুঃখকষ্ট, ব্যথা জর্জর, অনাচার অবিচার ও শোষণ জর্জরিত সমাজ ও জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তার মধ্যেও মানুষ স্বৈচ্ছিক শিক্ষা নিতে ভোলে না। আনন্দের মধ্যে শিক্ষা, শিক্ষার মধ্যে আনন্দ ধারায় গ্রামবাসী বিহ্বল হয়ে থাকে। প্রধানত ধর্মকে কেন্দ্র করেই গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশ। উৎসবের দিনে তারা গৃহ, উৎসবপ্রাঙ্গণ ও ব্যক্তিগত সাজসজ্জার ভিতর দিয়ে নিজেদের সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয়। সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে রাখে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মচর্চার কোন স্থান রইলো না। উৎসব অনুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতিও গেল বদলে। নাচগানে নতুন চেতনা এল। শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন—"লোকনৃত্য শব্দটির উদ্ভবকালে আমাদের দেশের শহরের কথক, বাইজী, খেমটা বা সেই ঢংয়ের থিয়েটার ও যাত্রার নাচ ছাড়া আর সবই ছিল গ্রামীণ নৃত্য। যাকে আমরা বলছি লোকনৃত্য, চল্লিশ বছর পূর্বেও আমরা কথাকলি, কুচিপুড়ি প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের নাচকে ...ত্য' বলেই জানতাম। কারণ এর চর্চা ছিল একমাত্র অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের ... প্রধানত ছিল তারা।...আমাদের দেশের গ্রাম সমাজে খুবই ...ড়ে আছে দলবদ্ধ সামাজিক নৃত্যগুলি। এ নাচ পেশাদারী করেছেন। তিনি (শেখাবার স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা গ্রামে নেই। নৃত্যের প্রাণবান ...স থেকে কি ভাবে যে নৃত্যে পারদর্শী হয়ে ওঠে গ্রামবাসীরা, ...জেরাও বুঝতে পারে না,...দলবদ্ধ নৃত্য হল একতার বা ঐক্যের নাচ। ...একসঙ্গে এক ভঙ্গিতে অনেকের মিলনের নাচ। নাচের সময় সকলের মন ...এর রসে এমন ভরপুর হয়ে ওঠে যে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না,... ...নৃত্যের গান নাচিয়েরাই সাধারণত সমবেত কণ্ঠে গান গায়। গানের কথাতে ...অর্থই প্রকাশ পাক না কেন, নাচিয়েরা তাদের নৃত্যভঙ্গিতে অভিনয়ের দ্বারা তার ...অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করে না। গান ও বাজনার ছন্দের সঙ্গে নিজেদের দেহভঙ্গির

ছন্দকে মিলিয়ে নেবার প্রতি থাকে তাদের লক্ষ্য। এই সব গানে কলির পর কলির কথার পরিবর্তন ঘটেছে।··

· আমাদের দেশে শহরের শিক্ষিত সমাজে নৃত্যের যে নব আন্দোলন আজ আমরা দেখি তার সূত্রপাত হয়েছিল প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে। স্বাধীনতার পর এর বিস্তৃতি ঘটে নাচের স্কুল কলেজ এবং এযুগের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের দ্বারা। কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি পেশাদারী মনোভাব।" পেশাদারী মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষেরা লোকনৃত্যকে কোথায় নিয়ে চলেছে লোকবৃত্তবিদ্‌দের সেদিকটাও লক্ষ্য করতে হয়।

লোকসংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারের জন্য একটি মান নির্দিষ্ট করে নেবার দরকার আছে। এই সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে যেমন তাকে এগিয়ে নিতে পারি না, তেমনি এর প্রসার ও প্রচারের ভার পেশাদারী কর্মীদের হাতেও ছেড়ে দিতে পারি না। যদি দেই তবে তা হবে শিব গড়তে বানর গড়ার ব্যাপার। বস্তুত এ ব্যাপারটাই দেখতে পাচ্ছি সাম্প্রতিক কালে সরকারী লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকদের কাজে ও কর্মে। রাজ্যস্তরে সরকারী পর্যায়ে যে ধরনের কাজ হচ্ছে তা উল্লেখ না করাই ভাল। কিছু নাচ-গানের অনুষ্ঠান, কিছু উল্টা-পালটা সেমিনার ইত্যাদি। প্রচার ভালোই হচ্ছে। যাঁরা লোকজীবন এবং লোকসমাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তাঁরা একেক সময় একেক ধরনের প্ল্যান ও প্রোগ্রাম নিয়ে বাজার গরম করছেন। সরকারী অর্থ, আপনার আমার অর্থ দিয়ে যে ধরনের 'নবান্ন' তা রীতিমত বাজে খরচা ও দায়িত্ববোধহীন কাজ। যাদের উন্নতির জন্য নানা পরিকল্পনা করা হচ্ছে তারা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই আছে। প্রচারে বলা হচ্ছে তাদের জন্য অনেক কিছু করা হচ্ছে। আসলে এই 'অনেকটা' যে কি তা-ই ওঁরা জানেন না। জানবেন কি করে? তা জানতে হলে যে ধরনের কাজ, যে ধরনের অভিজ্ঞতা ও যে ধরনের জ্ঞানের দরকার তা যে কর্তাব্যক্তিদের আছে এমন কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। হয়তো কারুর কিছু ডিগ্রী আছে. কারুর তাও নেই—কিন্তু ডিগ্রী দিয়ে কি লোকজ্ঞানকে পরিমাপ করা যায়? না যায় না। সর্বত্রই সামান্য-করণের প্রবণতা। ওঁরা অনেক কথা বলেন কিন্তু নিজেদের বলার ব্যাপারটিকে ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক বা সমাজ-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। তাঁদের দাবীর অর্থপূর্ণ বিশ্লেষণ করতে পারেন না—

সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক গণ্ডির মধ্যে বিচরণ করার জন্য! বড় বড় কথা বলেন, বিশ্ব-ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। একদিকে বিশ্বভাবনা নিয়ে বিশ্বশান্তি নিয়ে সোচ্চার, অন্যদিকে সমস্ত ব্যাপারটাকে দলীয় কবজায় রাখার জন্য কুৎসিত দলাদলি, গোষ্ঠীবাজী। এই পন্থা কুটিল পন্থা। বড়দাদাগিরির জন্য, মতপার্থক্যের ছুতোয, শ্রেণী সংঘর্ষের ঘোষিত আদর্শে সকলের সঙ্গে মেলামেশা, সকলকে নিয়ে কাজ করা না কি শক্ত। শোচনীয অবস্থা। লোকসমাজের জন্য সত্যিকারের কিছু কাজ এ যাবৎ সরকারী আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত হযেছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। অবশ্য বহু লোকের সমাহার, কিছু জটলা হতে দেখা যাচ্ছে। এবং তাতে আপনার আমার পকেটে হাত দিতে হচ্ছে। ট্যাক্সের বহর বেড়েই চলেছে। সেই টাকায কিছু লোক করেকম্মে খাচ্ছে। বুঝে না বুঝে নানা ধরনের তত্ত্ব আওড়াতে পারছে। যখন তখন যে-কোন রচনা ও অভিপ্রাযের মধ্যে মার্কিনীগন্ধ, হঠকারিতা, অসামাজিক কাজ, স্বৈরতন্ত্রের গন্ধ, ভাববাদী ও অপ্রগতিশীলতার ধারা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু যা দেখতে পাচ্ছে না বা করতে পারছে না তা প্রকৃত লোকবৃত্ত ও লোকজীবনের সেবা, জনসাধারণের দরিদ্র-শ্রেণীব অর্থেব সদ্ ব্যবহার করতে। নিজেদের অকর্মণ্যতা চাপা দেবার জন্য দায়ী কবছে অপরকে। তাজ্জব ব্যাপাব।

মনে রাখতে হবে লোকজীবনের উন্নতি, লোকবৃত্তের সঠিক বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের জন্য, লোকসংস্কৃতির বিকাশের জন্য, গ্রাম ও শহরের উভযশ্রেণীর সকল গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। হাত মেলাতে গিযে ভেজালের অনুপ্রবেশ না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বুঝতে হবে কিভাবে লোকসমাজকে স্বীয সাহিত্য ও সংস্কৃতিব ব্যাপারে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব, কি ভাবে আদি ও অকৃত্রিম আচার অনুষ্ঠান-উৎসবাদি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব, কি ভাবে অনুকরণপ্রিয়তার ঝোঁককে কমানো সম্ভব। ব্যাপারটার মুখে মুখে সমাধান করা যত সহজ কাজে তত সহজ নয়।

লোকউৎসব ও অনুষ্ঠানের তাৎপর্য

লোকবৃত্তবিদেরা যদি লোকবৃত্তের সঠিক মূল্যায়নের দ্বারা লোকসমাজকে লোকবৃত্তের অমূল্য মূল্যের কথা বুঝিয়ে দিতে পারেন তবে নিশ্চয়ই পরম্পরাগত ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও ধারার বদলে যারা সুগম সঙ্গীত ও সংস্কৃতির পিছনে ছুটতে চাইবে, অপসংস্কৃতির শিকার

হবে। কি ভাবে এই গতি রুদ্ধ করা যাবে তার জন্য লোকাচারানুষ্ঠান, লোকউৎসব, লোকসংস্কৃতির সঠিক মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা তাদের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে; আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক বীরত্ব ও জাতীয় গৌরববোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে কোথায় লোকবৃত্ত তথা লোকসংস্কৃতির সার্থকতা, কোথায় এর প্রয়োজনীয়তা। তার জন্যই লোকবৃত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং লোক জীবন অনুসন্ধান ও লোকউৎসবে যোগদান। মনে রাখতে হবে, লোকউৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য লোকসমাজের জীবনযাত্রাকে, তাদের অর্থনীতিকে উদ্‌বেগহীন করে তোলা। শিকারজীবী মানুষের উৎসব যেমন শিকারকে কেন্দ্র করে, বনকে কেন্দ্র করে, তেমনি কৃষিজীবী মানুষের উৎসব কৃষিকে কেন্দ্র করে, গো-মহিষাদি কেন্দ্র করে। এই সব উৎসবের আলোচনা-পর্যালোচনায় একদিকে যেমন এর ধর্মীয়, আচরণীয় দিকের কথা জানতে পারি, তেমনি অন্যদিকে বুঝতে পারি সমাজ-সচেতনতার কথা। পরম্পরাগত ঐতিহ্যচেতনার কথা।

নাচগান, অকৃত্রিম উদ্‌বেলতা ও প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ মাদকতা উৎসবের অন্যতম অঙ্গ। এর সামাজিক মূল্যও আছে। যেমন সই পাতানো, ধর্মকুটুম পাতানো প্রভৃতি। এ ছাড়াও এর মধ্যে ঐক্য ভাবনা দেখতে পাই, দেখতে পাই আর্থ চিন্তাচেতনার কথা। সামাজিকতার জন্য দরকার হয় দোকানপাট। চলে কেনা-বেচা। তাতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও আসে বিক্রেতার। মেলায় আসে সার্কাস, ম্যাজিক, যাত্রা। অনুষ্ঠিত হয় লাঠিখেলা, জুয়াখেলা ও নেশা। এ সবের মধ্যে আছে নির্মল আনন্দ।

কৃষি ও অর্থনৈতিক জীবনের তাগিদে যে উৎসব তার সঙ্গে ধর্মকেও যুক্ত করে লোকসমাজ। ধর্মকে কেন্দ্র করে যে উৎসব তার মৌল উদ্দেশ্য আর কৃষি ও অর্থনৈতিক উৎসবের উদ্দেশ্য ভিন্ন নয়। লৌকিক দেবদেবীর আরাধনা করা হয় নিরুপদ্রবে বাঁচার তাগিদে। সর্পদেবতা মা-মনসাকে কেন্দ্র করে ঝাঁপান বা মনসা উৎসব, শিবকে কেন্দ্র করে গাজন বা চড়ক উৎসব, ধর্ম উৎসব, টুসু-ভাদু-নবান্ন ইত্যাদি উৎসবের সঙ্গে শনি, সত্যনারায়ণ, পীর উৎসবাদির বহিরঙ্গে কোন তফাত নেই। উৎসবের মধ্যে মিলনের ভাবনা সকলকে উদ্দীপিত করে মিলেমিশে থাকতে। ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত থাকতে। দৈবদুর্বিপাকাদির হাত থেকে উদ্ধার পেতেও আছে নানা রকম উৎসব-আচার-অনুষ্ঠান। তবে সব উৎসব-আচার-অনুষ্ঠানের চেহারা এক নয়। সব উৎসবের ধরনধারণও এক নয়। মেয়েলী উৎসবের সঙ্গে পুরুষালী উৎসবের চরিত্রে

তফাত বিদ্যমান। যুব উৎসবের সঙ্গেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-কিশোর-বালকদের উৎসবের তফাত বিদ্যমান। বহু উৎসব অনুষ্ঠানে আধিভৌতিক বা ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস মিশে আছে। তবে সব উৎসবই লোকসমাজকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে রাখে।

লোকউৎসবাদি পরিচালিত হয় গোষ্ঠীগতভাবে। একদা যে সব পশু পূজিত হতো তা এখন দেবতার বাহনে পরিণত হয়েছে। যেমন কূর্ম ধর্ম দেবতার বাহন, ব্যাঘ্র ক্ষেত্রপাল বা দক্ষিণরায়ের বাহন, এর মধ্যেও বিবর্তন লক্ষণীয়। দক্ষিণরায় ব্যাঘ্র দেবতা বলে পরিচিত হলেও এর অন্য পরিচয়ও আছে। কোনস্থানে এঁর বাহন ব্যাঘ্র, কোন স্থানে অশ্ব। ব্যাপক পূজা হয় ধানকাটা শেষ হলে বা নবান্নের সময়। ধর্মঠাকুর হচ্ছেন অন্যতম প্রসিদ্ধ দেবতা। বিভিন্ন স্থানে এঁর বিভিন্ন নাম। যেমন যাত্রাসিদ্ধিরায়, বাঁকারায়, স্বরূপরায়, চাঁদরায়, কালাচাঁদ, ক্ষুদিরায়, সুন্দররায়, মতিলাল, পুরন্দর প্রভৃতি। অন্য কোন লৌকিক দেবতার এত প্রতিনাম দেখা যায় না। অনেকে ধর্ম পূজা-পদ্ধতিতে বৌদ্ধাচার লক্ষ করেছেন। বিভিন্ন উপায়ে ধর্মঠাকুর পূজিত হন। প্রসিদ্ধ স্থানে বা মন্দিরে নিত্যপূজা হয়। নিত্যপূজায় ব্রাহ্মণ্য বিধান অনুসৃত হয়। কিন্তু লোকাচার অক্ষুণ্ণ থাকে। মানত বা মানসিকে সাদা রঙের পশু বা পক্ষী বলি দেওয়া হয়। পূজায় সাদা ফুল ব্যবহারের রীতি। অনেক স্থানে শিব পূজার সঙ্গে ধর্ম পূজা একত্রিত হয়ে গেছে। যেমন বর্ধমানের বুড়োরাজ। বুড়োশিবের বুড়ো এবং ধর্মরাজের রাজ নিয়ে বুড়োরাজ হলেও এখানে উভয় দেবতাই স্বতন্ত্রভাবে পূজিত। বাবা ঠাকুর পঞ্চানন্দ, পঞ্চানন দেবের পূজা প্রায় শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয় বহু স্থানে। অনেক স্থানে এই পূজায় ব্রাহ্মণ দরকার হয়। শিব বা মহাদেবের সঙ্গে এঁর আকৃতি ও বেশভূষায় মিল দেখা যায়। এঁর বাহন বহু—যেমন বামন, গোভূত, মামদোভূত, মৃগ, বৃষ, ভাল্লুক প্রভৃতি। এঁর অনুচর কোথাও পেঁচোখেঁচো, কোথাও ধনুষ্টঙ্কার। জ্বরাসুরকেও অনেক জায়গায় পঞ্চাননের অনুচর হিসাবে দেখা যায়। বামনী, বাশুলী, বিশালাক্ষী কোথাও তান্ত্রিক মতে, কোথাও ব্রাহ্মণ্য বিধানে পূজিত হয়। রঙ্কিনী ভয়ঙ্করী দেবী, ইনি রক্তমুখী, নররক্তপিপাসু। এঁর উদ্দেশে গত শতকেও নরবলি হয়েছে। মাকাল ঠাকুর আটেশ্বর, ঘাটু, হাড়িসি, সিনি দেবতা, বনবিবি, ওলাবিবি, ওলাইচণ্ডী, সত্যনারায়ণ, সত্যপীর, বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদি পূজা, নদী পূজা, জীবজন্তু পূজা প্রভৃতিও লোকসমাজকে মাতিয়ে রাখে।

লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে বহু আরোগ্যের দেবদেবী। লোকসমাজ কি ভাবে

দেবদেবী, আধিভৌতিক এবং ঐন্দ্রজালিক আচার-বিশ্বাসের দ্বারা ম্যাজিক, তুকতাক, ঝাড়ন, ওঝা, গুণীনদের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলে—লোকধর্মের আলোচনায় ব্রত উৎসব, স্নান উৎসব, নদী উৎসব, পাহাড়-পর্বত পূজা প্রভৃতির বিশ্লেষণে তা স্পষ্টতা লাভ করে। জলপড়া, নুনপড়া, হত্যাদেওয়া, মানত, দণ্ডীকাটা, ভর করা প্রভৃতির মধ্যেও তাদের চিন্তাচেতনা প্রকাশ পায়।

লোকধর্মে প্রকৃতিপূজার প্রাধান্য লক্ষণীয়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষ যে চন্দ্র, সূর্য, তারা ইত্যাদির অর্চনা আরম্ভ করে, বিভিন্ন লৌকিক আচার-বিশ্বাসের মধ্যে অদ্যাবধি তা লোকসমাজে পরিব্যাপ্ত। পৃথিবী পূজা, ক্ষেত্র পূজা, নদী পূজা, তারাব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত ইত্যাদি লোকধর্মের অপর বৈশিষ্ট্য। ধরিত্রী, ধাত্রী, ধরণী নামে পৃথিবী পূজিতা, শস্য-সম্পদ বৃদ্ধিকারক ক্ষেত্রপতির ও বাস্তু পূজারও প্রচলন আছে লোকসমাজে। সাগর, নদী, পুষ্করিণী, হ্রদ, ঝর্ণা প্রভৃতির পূজা হয় উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য। কূপ ও জলাশয় খননকালীন বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান, বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা, প্লাবনের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পূজা ও অনুষ্ঠান, পিতৃপূজা সবই তাৎপর্যপূর্ণ। সকলপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয়-অনুষ্ঠানে পিতৃপূজার দরকার হয়। নবান্ন উৎসবে কাকরূপী পিতৃগণকে ভোজ্য উপহার দিতে হয়। পূজা হয় পশুপক্ষীদেরও। গরু-ষাঁড়ের পূজা, বানর ও হনুমানের পূজা, সাপ ও বাঘের পূজা, বিড়াল পূজা প্রভৃতিও লোকসমাজে জনপ্রিয়। এই সব অনুষ্ঠানের অধিকাংশই যাদুক্রিয়া ও উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ মানুষের কাছে নারী ও জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্রের, পশুকুলের, গাছগাছড়ার এবং মানবকুলের উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য আছে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান। তাছাড়া আছে ষড়্ঋতুকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের ঋতু উৎসব।

ব্রতকে শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় ব্রত হিসাবে ভাগ করা হয়েছে। অশাস্ত্রীয় ব্রত দুপ্রকার—মেয়েলী ও পুরুষালী। মেয়েলী ব্রত আবার কুমারী, সধবা ও বিধবা ব্রতের মধ্যে বিভক্ত। বিধবা ব্রতের সংখ্যা কম, সাধারণত বিধবারা শাস্ত্রীয় ব্রত উদ্‌যাপন করেন। কুমারী ব্রতের অন্যতম উদ্দেশ্য উপযুক্ত বরের জন্য প্রার্থনা। সধবা ব্রতে স্বামীর ও সন্তানের কল্যাণ কামনা করা হয়। তাছাড়া সু-সন্তানের জন্য, সু-সমৃদ্ধির জন্য, কৃষির উন্নতির জন্যও নানাপ্রকার ব্রত আছে।

লোকধর্মের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংক্রান্ত অনেক

তথ্য অবগত হওয়া যায়। যেমন চান্দ্রমাস, চান্দ্রতিথি গণনা, চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র প্রভৃতির পূজা, পুরুষ, প্রকৃতি ও পৃথিবী পূজা, পিতৃপূজা, প্রতীক পূজা, জন্মান্তরবাদ, লিঙ্গ ও যোনিপূজা, বরণ, আলপনা প্রভৃতি অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর দান। লোকধর্মের প্রধান দেবদেবী বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা প্রভৃতির পূজা-পার্বণ, মৃন্ময়মূর্তির পূজা, বৃক্ষ পূজা, বানর পূজা, সর্প পূজা প্রভৃতি দ্রাবিড় সংস্কৃতির দান। তান্ত্রিক সাধনায় ও বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের তত্ত্বে কিরাত সংস্কৃতির কথা জানা যায়। অর্থাৎ অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি লোকধর্মকে পুষ্ট করেছে। লোকধর্মের জনপ্রিয়তা লক্ষ করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আচার্যরা লৌকিক মন্ত্র, কথা প্রভৃতি যুক্ত করে লোকধর্মের অনেক অনুষ্ঠানকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মর্যাদা দিয়েছেন ; যেমন লক্ষ্মীপূজা।

পরবর্তীকালে ইসলামও অনেক নতুন তত্ত্ব ও ক্রিয়াকলাপ যুক্ত করেছে লোকধর্মে —সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর, গাজী, ওলাবিবি প্রভৃতির আগমন ইসলাম প্রভাবের ফসল, লোকধর্মে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব খুবই কম।

বাঙলার লোকধর্মানুষ্ঠান আদিমমানব পরিকল্পিত। বঙ্গসংস্কৃতির মৌলরূপ ও চিন্তা এবং প্রকৃতস্বরূপও এর মধ্যেই বিন্যস্ত। এর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের দ্বারা বঙ্গ সংস্কৃতির স্তর-বিন্যাস ও স্বরূপ উন্মোচন সম্ভব, সম্ভব লোকমানসের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও লোকজীবনের আত্মার সন্ধান।

মনে রাখতে হবে লোকসমাজে ব্যক্তিমন বিকাশলাভ করতে পারে না। যেখানে সমস্ত কর্মকাণ্ড গোষ্ঠীর নির্দেশে ও ব্যবস্থামত চলে সেখানে ব্যক্তির বা এককের স্থান নেই। তাই এ সমাজের কোন সৃষ্টি ব্যক্তির বা এককের সৃষ্টি হলেও কালক্রমে তা গোষ্ঠীর সৃষ্টিতে পরিণত হয়ে সমাজে টিকে যায়। গোষ্ঠীমান্যতা না থাকলে তা লোক-সৃষ্টি বলে গ্রাহ্য হয় না। এখানে আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতি নেই। গোষ্ঠীর জন্যই ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর স্বার্থই ব্যক্তি বা সমষ্টির স্বার্থ। তাই এ সমাজে লোকবৃত্তের কোন সমালোচক নেই। ব্যক্তিগত রসবোধের কোন মূল্য নেই। কিন্তু লোকসমাজের বিবর্তন আছে। বাইরের নানা উপকরণ ও বস্তু ক্রমাগত এ সমাজে অনুপ্রবেশ করতে পারে। তা এ সমাজকে শক্তি যোগায়। সেই শক্তি অনেক সময় প্রচলিত ব্যবস্থাকে আঘাতও করে। আঘাতের ফলে যে রন্ধ্রপথ রচিত হয় তা দিয়ে বাইরের উপকরণ প্রবেশ করে। পরিবর্তনশীলতাকে অব্যাহত রাখে। কিন্তু আদিম সমাজে তা হয় না। আদিম সমাজে কোন গোপন রন্ধ্রপথ তৈরী হতে পারে না। এই সমাজ সব

শক্তি দিয়ে তা বাধা দেয়। যদি কোন আদিম সমাজ বাইরের প্রভাব স্বীকার করে নেয় তবে সে সমাজ আদিম চারিত্র্য হারায়। সে তখন লোকসমাজে পরিণত হয়।

লোকসমাজ গোষ্ঠীবদ্ধ হলেও যে অপরিবর্তনীয় নয় সে কথা বহুবার বহুভাবে উল্লেখ করেছি। তাই প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে লোকসমাজ পরিবর্তিত বিবর্তিত হয়। অনেকে দৃঢ়তা হারায়। এই অবস্থায় গোষ্ঠীস্বার্থও তাদের সঙ্গে গৌণ হয়ে পড়ে, সমাজ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। এই সমাজের যে সৃষ্টি তা জনসমর্থন পায় না। তা লৌকিক উপাদান হিসাবেও গৃহীত হয় না। লোকসমাজের বিবর্তনের এই ধারাটি না জানলে সঠিক লোকবৃত্ত সংগ্রহে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়।

বাঙলায় লোকবৃত্ত সংরক্ষণ ও অধ্যয়নের প্রথমাবস্থা

বিগত শতকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙলায় যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তারই ফলে শিক্ষিত বাঙালী লোকবৃত্ত ও দেশজ সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হন। এক উদ্দেশ্য নিয়ে এ দেশের প্রাচীন ও লোক সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য বিদেশী শাসক সিভিলিয়ান ও পাদরী সাহেবরা উৎসাহ দেখাতে থাকেন, অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে দেশীয় বিদ্বান্ ও সংগ্রাহকেরা এ কাজে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে লোকবৃত্তের আধুনিক চেতনা ও শৃঙ্খলা মান্য করে এ কাজ কেউই করেননি। করেননি, কেননা লোকবৃত্তের অধ্যয়ন-অনুশীলন তখন অবধি বর্তমান চেহারা পায়নি। ছড়া, গীতিকা, প্রবাদ, গল্প প্রভৃতি সংগ্রহ হয়েছে, কিন্তু তার ভিত্তি জানানো হয়নি। তবু অগ্রজদের সংগ্রহ ও আলোচনা দেখিয়ে দিল কি ভাবে বৌদ্ধ প্রচারকেরা তাঁদের আদর্শ, জ্ঞান ও উপলব্ধি জনসাধারণের মধ্যে সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার করতে লোকবৃত্ত ব্যবহার করেছেন, সাধারণ মানুষ সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদ ঘরবাড়ী ও জীবনযাত্রাকে রূপায়িত করে এক নতুন শিল্প-শৈলীর প্রবর্তন করেছেন। তাঁদের অনুশীলন লোকশিল্পের প্রথম মর্যাদাভিত্তিক আত্মপ্রকাশ বললে ভুল হবে না।

বৌদ্ধদের দমন করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজকেও লৌকিক ধ্যান-ধারণাকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে হয়। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, ধর্মসূত্রাদি গ্রন্থ কৃত্রিম বিভেদকে স্পষ্ট রূপ দিতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি, কিন্তু কার্যত সে প্রচেষ্টা যে বাঙলায় সাফল্য অর্জন করেনি তা

পরবর্তী যুগের সামাজিক ইতিহাস থেকে জানা যায়। বাঙলায় উচ্চকোটির অতি মার্জিত সাহিত্য ও শিল্পকর্মের সমান্তরালে নিম্নকোটির সৃষ্টিকর্ম এগিয়ে গেছে। ক্রমে একে অপরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারহুত ও সাঁচীস্তূপের তোরণের খোদাই কাজে লোকজীবনের রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। সেই যুগেরই বেড়াচাঁপা, তমলুক, বাণগড় ইত্যাদি স্থানের পোড়ামাটির পুতুল ও ফলকে লোকজীবন পরিস্ফুট। এই সময়ের শিল্পের মধ্যে বসনভূষণ, গড়নভঙ্গী, উৎসবাদির পরিচয় থাকলেও বিচিত্র বিষয়বস্তুর সমাবেশ দেখা যায় না। পরবর্তীকালে যে পোড়ামাটির কাজ দেখি তার গড়নে ও ঢঙের মধ্যে বিচিত্র বিষয়বস্তুর সমাবেশ লক্ষ করা যায়। লক্ষ্মী-গণেশ থেকে দক্ষিণরায় জাতীয় দেবমূর্তি, বেনেবউ থেকে আহ্লাদী জাতীয় পুতুল বহু সাংস্কৃতিক মনন-কল্পনার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এইসব বিগ্রহ ও পুতুলের মধ্যে সামাজিক বিবর্তনের স্তরও লক্ষ করা যায়। কাহিনীভিত্তিক ফলকের বিষয়বস্তু প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত বা কৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনী। তার সঙ্গে সমসাময়িক জীবনের নানা কাহিনী, নৌকা, জাহাজ, পাল্কি, শিকার, গৃহস্থালী কর্ম, উৎসব, দেশীবিদেশী মানুষ, বিচিত্র পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার এসে গেছে। আখ্যান চিত্র দেখা যায় পটচিত্রে। লোককাহিনী, কৃষ্ণলীলা, বেহুলা-লখিন্দর, রামায়ণ, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে যে সব পটগান বা পটুয়াসঙ্গীত গীত হয় সেগুলোও উল্লেখযোগ্য। গুরুসদয় দত্ত এই গান ধরে রেখেছেন "পটুয়া সঙ্গীতে"। যমপটে দেখি মৃত ব্যক্তির নানা অবস্থার ছবি। প্রাচীনকাল থেকে এই যমপটের রীতি চলে আসছে। সাঁওতাল সমাজে বুড়োবুড়ির কাহিনী-ভিত্তিক বা চক্ষুদান পটের প্রচলন থাকায় মনে হয় পটচিত্রের প্রচলন সমাজের আদিম অবস্থা থেকেই চলে আসছে। চিত্রকলায় যে যাদু-বিশ্বাসের প্রভাব রয়েছে তা আলপনা, কাঁথা প্রভৃতির চিত্রে লক্ষণীয়।

ধর্মের মধ্যে সংস্কার থাকবেই। সাধারণ সংস্কার মানুষকে একটা নিয়মের মধ্যে বাঁধে। উচ্ছৃঙ্খলতার পথ রোধ করে। সংস্কারকে নানাভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা সম্ভব। জ্ঞানীর সংস্কার, ভক্তের সংস্কার, কামনা-বাসনাভিত্তিক সংস্কার, প্রয়োগ-বিশ্বাসগত সংস্কার প্রভৃতি। মানুষ সভ্য হয়ে সংস্কারের উপর একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

অনেক রকম বিধিনিষেধও আমাদের কাছে সংস্কার। পয়া-অপয়া, কবচ-তাবিজাদি ধারণ, এটা করা ওটা না-করা প্রভৃতি অনেকের কাছে কুসংস্কার, অনেকের

কাছে আচরণীয় প্রথা। আদিম চিন্তা থেকে এখনও যে বাঙালী মুক্ত হতে পারেনি সংস্কারের বিশ্লেষণে তা পরিষ্কার করা যায়।

আদিম মানুষ চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিধিনিষেধ মেনে চলত। এই বিধিনিষেধকে ইংরেজীতে বলে ট্যাবু। বিবাহাচার ও জীবনাচারের নানা দিকে ট্যাবু বা বাঁধানিষেধের বেড়াজাল। দার্শনিক মতবাদের পাশাপাশি এর অবস্থান। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ভদ্র-ইতর, স্ত্রী-পুরুষ, সকলের মধ্যেই এর উপস্থিতি। ধারণা ও প্রয়োগ বিধির মধ্যেও আছে ট্যাবু। উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে বিভিন্ন ধরনের ট্যাবু এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী।

বাঙালী জীবনে লোকবৃত্তের প্রভাব পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে লোকবৃত্তের বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপিত করেছি। এর দ্বারা লোকবৃত্ত অধ্যয়ন-অনুশীলনের প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। লোকবৃত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে চলেছে। লোকবৃত্তের নতুন ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের দ্বারা জীবন ও সমাজকে জানার চেষ্টা একটা মহৎ কাজ। লোকবৃত্ত যে জ্ঞানের অন্যতম একটি জগৎ তা এখনও আমাদের বহু বুদ্ধিজীবীর কাছে স্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত লোকবৃত্ত আলোচনার কথা তেমনভাবে কেউ ভাবেননি বাঙলায়। যদিও তাঁর আগেও লোকগল্প, প্রবাদ ইত্যাদির সংকলন হয়েছে, বিশ্লেষণ হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর চোখ ফুটিয়েছেন। তাঁর আশীর্বাদ ও সমর্থন পেয়ে বহু ব্যক্তি লোকবৃত্ত সংগ্রহে এগিয়ে আসেন। দীনেশচন্দ্র সেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শিবরতন মিত্র, জসীমউদ্দীন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মনসুরউদ্দীন প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদপুষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে সংগ্রহ করেছেন, রূপ ও রসবৈচিত্র্যে ডুব দিয়েছেন এবং নানা উপমায়, অলঙ্কারে, প্রতীকে, রূপকে তার ব্যবহার করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ বাঙলার ব্রতকথার আশ্চর্য সুন্দর ব্যাখ্যা শোনালেন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী উপহার দিলেন স্ত্রী-আচার। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্তকে সম্পাদক করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যে শব্দ সমিতি গঠন করেছিলেন তাঁদের চেষ্টায় ১৩০৮ সন থেকে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শব্দসংগ্রহ থেকে সতীশচন্দ্র ঘোষ, রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, রাজকুমার কাব্যভূষণ, মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, এস. বসু, পরমেশপ্রসন্ন রায়, দেবেন্দ্রনাথ বসু, হরিদাস পালিত, অম্বিকাচরণ

গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ ঘোষ, কৃষ্ণনাথ সেন, হরিনাথ ঘোষ, রাখালরাজ রায়, নরেন চক্রবর্তী, মোল্লা রবীউদ্দীন আহম্মদ, গৌরহরি মিত্র, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতির সংগৃহীত বহু লৌকিক শব্দ প্রকাশিত হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৫ সনে 'দাসী' পত্রিকায় যে 'প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গালা' প্রকাশ করেছিলেন, 'কল্যাণী' মাসিক পত্রের ১৯২৬ আষাঢ় সংখ্যায় তা প্রকাশের পর চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 'বঙ্গীয় গ্রাম্য শব্দকোষ' নামে যে প্রবন্ধ রচনা করেন 'কল্যাণী' পূজা সংখ্যা ১৯২৬ সনে, তা অনেককেই অনুপ্রাণিত করে। পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (৩ খণ্ড) উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

হিন্দুমেলার পর্ব থেকে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা, সেই পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বসন্তরঞ্জন রায়, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, নফরচন্দ্র দত্ত, কানাইলাল ঘোষাল, দ্বারকানাথ বসু, কুঞ্জলতা রায়, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, হরিদাস পালিত, বিনয়কুমার সরকার, তসলিমুদ্দীন আহ্মেদ, শরৎচন্দ্র মিত্র, শরৎচন্দ্র রায়, কালীপদ মিত্র, দীনেশচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রমোহন দত্ত, সুকুমার সেন, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, গুরুসদয় দত্ত, মুহম্মদ এনামুল হক, জসীমউদ্দীন, আব্বাসউদ্দীন, সুশীলকুমার দে, আশুতোষ ভট্টাচার্য, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত মুখার্জী, অজিত ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুধীর রঞ্জন দাস, শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রভৃতি চমৎকার সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনে, স্বদেশী চিন্তায় লোকসঙ্গীত ও অন্যান্য লৌকিক উপকরণকে কাজে লাগানো হলো রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও অন্যান্যদের দ্বারা। দীনবন্ধু-মধুসূদন-কালীপ্রসন্ন-প্যারীচাঁদ থেকে প্রমথ চৌধুরী নানাভাবে লোকভাষাকে ব্যবহার করেছেন। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে, জীবনানন্দ-জসীমউদ্দীন কাব্যে মুন্সীয়ানার সঙ্গে লোকজীবনকে চিত্রিত করলেন। তবু লোকবৃত্ত চর্চা, লোকসাহিত্যের অধ্যয়ন-অনুশীলনকে জাতে ওঠানো যায়নি। নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাসে' যে পথ দেখালেন, বিনয় ঘোষ 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'-তে যে পথ দেখালেন সে পথ ধরে অগ্রসর হয়ে যাঁরা কিছু কাজ করেছেন তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম। লোকজীবন ও লোকসমাজের মূল্যবোধ ও

জীবনচেতনার পর্যালোচনায় লোকবৃত্তের প্রতিষ্ঠিত মানের কাছে যেতে পারে এমন কাজ আধুনিক কোন 'অ্যাকাডেমিক' গবেষক করেছেন বলে জানি না, কারণ তাঁরা অধিকাংশ স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়েব গবেষণা সেলে বন্দী। যাঁদের কথা জানা গেছে তাঁদের মধ্যে অগ্রজদের বাদ দিলে নির্মলেন্দু ভৌমিক, সুধীর করণ, ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, পীযূষকান্তি মহাপাত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নিবেদিত গবেষকদের প্রতি আহ্বান

লোকবৃত্তের নিবেদিত গবেষক ও কর্মীদের মনে রাখতে হবে, শুধু সংগ্রহের জন্য সংগ্রহে অনেক বিপত্তি। কি সংগ্রহ, কাদের জন্য সংগ্রহ ইত্যাদি সঠিকভাবে না বুঝে যে সংগ্রহ তা অবৈজ্ঞানিক। অবৈজ্ঞানিক সংগ্রহ থেকে সকলেরই দূরে থাকা উচিত। কিছু কিছু গবেষক লোকবৃত্ত অথবা লোকবৃত্তের বিজ্ঞান কোনটাই না বুঝে 'বৈজ্ঞানিক অধ্যযন, বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন' বলে চীৎকার করছেন। তাঁদেব বোধ ও বিবেচনা এমনই অস্বচ্ছ যে কোথায় তাঁরা আছেন, কোথায পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে কোন ধারণা নেই। মনে রাখতে হবে পরিবর্তনের ধাক্কায় লোকসমাজ বদলালেও তাদের আচার-আচরণ ঐতিহ্য-সংস্কৃতি একই খাতে প্রবাহিত হয়। লোকবৃত্তবিদ্‌দের কাজ প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্যযুক্ত সাংস্কৃতিক ও মানবিক উপাদানেব চর্চা হলেও তাঁদের আসল আগ্রহ আধুনিকযুগের লোকসমাজ তথা লোকজীবনের প্রতি। লোকবৃত্ত-বিদেরা লোকবৃত্ত চর্চা ও লোকজীবনের বিশ্লেষণের দ্বারা আধুনিকযুগেব লোকসমাজের বার্তা পরিবেশন কবেন। আলান ডাণ্ডিস বলেছেন : "Folklorists should study folklore, not for its own sake (though it is fascinating) but because folklore offers an unique picture of folk. In folklore one finds people's own unselfconscious picture of themselves." সে জন্যই লোকবৃত্তকে অর্থহীন উদ্‌বর্তন হিসাবে দেখা হয় না, "Rather folklore is a rich and meaningful source for the study of cognition and values. Once this is accepted, then it is likely that the discipline of folklore will become of increasing interest in academic circles." বিদ্যাজগতের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক ও গবেষকরা এদিকে দৃষ্টি রেখে লোকবৃত্ত চর্চায়

মনোনিবেশ করলে বিষয়কে সমুন্নত করতে পারবেন, বৈজ্ঞানিক চেতনা-সম্পন্ন গবেষকদের বিষয় অধ্যয়নে আকৃষ্ট করতে পারবেন। ভুলভ্রান্তি নিয়েই মানুষ, ভুলটাকে বড়ো করে না দেখে গুণটাকে বড়ো করে দেখলে কর্মী-গবেষকদের উৎসাহিত করতে পারবেন, নিজেদের চিত্তশুদ্ধিজনিত শান্তি পাবেন। বাঙালী জীবনে লোকবৃত্তের ভূমিকা বোঝাতে গিয়ে বহু কথাই এখানে বলা হয়নি। যা বলা হয়েছে তাতে বাঙলার লোকবৃত্ত অধ্যযন-অনুশীলনেব মোটামুটি একটা ধারণা হয়তো পাওয়া যাবে। এই ধাবণার সঙ্গে লোকবৃত্ত অধ্যযন-অনুশীলনে আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও ভাবনাকেও সংক্ষেপে উপস্থাপিত করতে চেয়েছি। সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও সাধ্য নিয়ে উৎসাহিত কবতে চেযেছি যোগ্য গবেষককে আবও অধিক জানতে ও বুঝতে। পরবর্তী অধ্যায়ে 'লোকবৃত্তের ভবিষ্যৎ' শিরোনামে আরও কিছু আলোচনা করবো।

৩.

লোকবৃত্তের ভবিষ্যৎ

এই পুস্তিকায় যা বোঝাতে চেয়েছি তা হচ্ছে লোকবৃত্ত একেকটি মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি। এই মানবগোষ্ঠী একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে। একই জীবনাভ্যাস, ভাষা, জীবিকা ও ঐতিহ্যানুবর্তী। ঐতিহ্যে বিশ্বাসী মানুষ মুখে মুখে লোকবৃত্ত সৃষ্টি করে কখনও একক, কখনও দলবদ্ধভাবে। লৌকিক বস্তু-সংস্কৃতি বা শিল্পকলাদিও এই মানুষদের দ্বারা একক বা দলবদ্ধভাবে সৃষ্ট। লোকজীবনের যাবতীয় কর্মকৃত্যাদি লোকবৃত্তে প্রভাবিত। দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে এই লোকবৃত্ত বিবর্তিত হয়। বিবর্তিত লোকবৃত্তের মধ্যে ঐতিহ্য-পরম্পরাগত ধারা বজায় থাকে। তাই লোকবৃত্ত অমর। গ্রামোন্নয়ন ও জীবনের মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে লোকবৃত্তের ধ্বংস অসম্ভব। যা সম্ভব তা হচ্ছে নতুন দিনের নতুন জীবনের প্রয়োজনে রচিত বিবর্তিত লোকবৃত্ত। এই লোকবৃত্ত লোকবৃত্ত-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারেই সৃষ্ট। সুতরাং লোকবৃত্ত ধ্বংস হচ্ছে, ধ্বংস হবে বলে যাঁরা চীৎকার করছেন তাঁরা ব্যাপারটা না বুঝে অনেকটাই ভাবাবেগবশত তা বলছেন। বিজ্ঞানের সঙ্গে ভাবাবেগের বোধ হয় কোন সম্পর্ক নেই। মুখে মুখে লোকবৃত্ত এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়ায়, অশিক্ষিতপটুত্ব নিয়ে সাহিত্য ও বস্তুসামগ্রী সৃষ্টি করে। তাতে পরম্পরাগত চেতনা ধরা পড়ে। এই চেতনা বিশ্বের সমগ্র লোকশিল্পীর চেতনা আশ্রয় করে পরিপুষ্ট হয়। লৌকিক সৃষ্টিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য দেখা গেলেও বিষয় নির্বাচন ও প্রকাশ ভঙ্গিমার নৈকট্য লক্ষ করা যায়। এ কারণেই লোকবৃত্তের মধ্যে বিশ্বভাবনা বা 'ওয়ার্লড ভিউ' দেখতে পান বিশেষজ্ঞরা।

সমাজের সমস্ত মানুষ লোকবৃত্তকে একান্তই আপনার জিনিস বলে মনে করে। এতে একক মালিকানার স্থান নেই। বদ্ধাবস্থায় বাস করেও, নাগরিক সুখ-সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হয়েও কি ভাবে লোকসমাজ বিশ্বভাবনা দ্বারা চালিত হয়, লোকবৃত্তের বিভিন্ন অংশের মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা করে পণ্ডিতগণ তা তুলে ধরেন। বাঙলার লৌকিক উপকরণের মধ্যেও 'বিশ্বভাবনা' বর্তমান। বাঙলার লোকবৃত্ত এবং লৌকিক বস্তু-সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের অনুরূপ সৃষ্টির সৌসাদৃশ্য বর্তমান। এর দ্বারা বুঝতে পারি সারা পৃথিবীর লোকসমাজ তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন-না-কোন

এক স্থানে একটা ঐক্য, একটা সমভাবনা বিদ্যমান। ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক বিভাগের দ্বারা মনের এই ঐক্যকে শাসন বা বিভাজন করা যায় না।

বহু মানুষের মিলনক্ষেত্র এই বাঙলা। এর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছে ভিন্নমুখী চিন্তা-চেতনা ও কলাকৌশলের আদর্শধারা। মিশ্রণ ও বিভিন্নতার দরুন, গতিহীনতার দরুন, লোকসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও দাপটের দরুনই বাঙলায় গড়ে উঠেছে লোকবৃত্তের জীবন্ত ভাণ্ডার। যুগ যুগ ধরে এ ভাণ্ডার সঞ্চিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে। এর শিকড় গভীরে। তবু অনেকে আতঙ্কিত হচ্ছেন এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। কিন্তু আমরা লোকবৃত্তের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত নই।

মনে রাখতে হবে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ অবধি ভারতীয় লোকজীবন ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংশাসিত। কৃষিপ্রধান গ্রামগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল জন-জীবনধারা। সে দিনের গ্রাম ছিল জাতিভেদ-প্রথায় সংগঠিত আর জাতিগুলো ছিল যৌথ-পরিবার ভিত্তিক। এই জীবনধারা দীর্ঘকাল ধরে অনুসৃত ছিল বলেই লোক-সংস্কৃতি ও লোকসমাজের কাঠামো সুসংগঠিত ও দৃঢ়ভিত্তিক হয়ে উঠেছিল। জীবন-যাত্রার কাঠামো অক্ষত ছিল। এ সমাজ ছিল গ্রাম্য রাত্রির মতো স্থির, শান্ত ও অচঞ্চল। হিন্দু ও মুসলমান যুগে রাজনৈতিক তরঙ্গের আঘাতে অথবা রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ে লোকসমাজের শান্তি বিঘ্নিত হয়নি। গ্রামের কৃষক, কারিগর, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও অন্যান্যরা বংশ-পরম্পরায় কৌলিক বৃত্তি পালন করতো। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লোক-জীবন নির্দিষ্ট ছন্দ ও সুরে বাঁধা থাকতো। এই ছন্দ ও সুর হচ্ছে সামাজিক প্রথা এবং ঐতিহ্য বা পরম্পারগত ধারা। প্রথা ও ঐতিহ্যের নাগপাশে এ সমাজের অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি এমন বজ্রআঁটুনীতে আঁটা থাকতো যে হঠাৎ কোন পরিবর্তনের ঢেউ সজোরে আঘাত করলেও সে বন্ধন ছিন্ন হতো না। চাষী, কামার, কুমার, জেলে, নাপিত, ছুতার, ধোপা, মুচি, মেথর, তাঁতি, জোলা, গোয়ালা, চৌকিদার, দফাদারেরা গ্রামের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতো। বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত লোকদের ও পুরোহিত ব্রাহ্মণদের পারিশ্রমিক দেওয়া হতো বাৎসরিক হিসাবে, পণ্যে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট জমি ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হতো। গ্রামের মধ্যেই সব কিছু পাওয়া যেতো। রাস্তাঘাট সুগঠিত বা হাটবাজার ব্যাপক ও সংগঠিত ছিল না। কালে-ভদ্রে দূরদেশ থেকে পণ্য ও ক্রেতার আগমন ঘটতো। কিন্তু উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন না থাকায় বাজার গড়ে ওঠে না। ভোগ্যপণ্যেরও প্রাচুর্য বা বৈচিত্র্য ছিল না। সমাজের

কাজে যে সব কাস্তে, লাঙ্গল, করাত, চরকা, কুঠার, তাঁত, হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতির দরকার হতো তা বংশ ও জাতিগত বৃত্তির লোকেরা মেটাতো। সকলেই ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। কেউ কাউকে ফাঁকি দিতো না। কেউ বেশী লাভ করতে চাইতো না। ফড়েদের অস্তিত্ব ছিল না। উৎপাদনের এক বিরাট অংশ ভোগ করতো রাজ-দরবারগুলো। তারা তা দিয়ে কর্মচারী, পারিষদ ও অমাত্যদের পুষতো। উদবৃত্ত অংশ মঠ, মন্দির, মসজিদ নির্মাণে ও ভোজ, ভ্রমণ ও বারোমাসে তেরোপার্বণ, দান-খয়রাত, আত্মীয়স্বজন পোষণ, লোক-লৌকিকতায় ব্যয় হতো।

জমিতে কৃষকদের ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না, অধিকার ছিল গোষ্ঠীগত। ঐতিহ্যের ন্যায়ই ভূমিব্যবস্থা গোষ্ঠীগত। কৃষি ও কুটির শিল্পের প্রসার হওয়ার দরুন বাঙলা সপ্তদশ শতাব্দীতে অন্যতম ধনী দেশ। বাঙলার কার্পাস ও পশম দ্রব্যের ছিল পৃথিবীব্যাপী সুনাম। ইংরেজ আমলের আগে অবধি লোকসমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল কুলবৃত্তিনির্ভর। কুলবৃত্তির জন্যই ব্রাহ্মণ অসম্ভব প্রতাপশালী, বিত্তের জন্য নয়। বিত্তহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সামাজিক প্রভাব বিত্তবান্ বণিক্ বা কৃষকের চেয়ে অনেক গুণ বেশী ছিল। এই সমাজ ছিল মন্থর। উনিশ শতকে কৃষক-ক্ষেতমজুরদের অনেকে শহরে-নগরে আসতে থাকে জীবিকার অন্বেষণে। শহরে তারা দিনমজুর, গৃহভৃত্যের কাজ নেয়। কারুশিল্পীরা মজুর ও দক্ষ শ্রমিকে পরিণত হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়ে মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ীর স্তরে উন্নীত হয়। বিনয় ঘোষ লিখেছেন, যাঁরা শহরমুখী হয়েছেন তাঁদের সম্পূর্ণ urbanization সম্ভব হয়নি, অর্থাৎ তাঁরা পুরোপুরি শহুরে বা শহরবাসী হতে পারেননি। যেমন গ্রাম থেকে শহরে এসে যাঁরা মজুর হয়েছেন তাঁরা সম্পূর্ণ proletarianised হননি। তেমনি গ্রামের জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী যাঁরা শহরমুখী হয়েছেন এবং মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে গৃহীত হয়েছেন, তাঁরাও সম্পূর্ণ urbanised হননি। শহরমুখী প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের এক পা ছিল গ্রামে, এক পা শহরে। গ্রামের জমিদার ও মধ্য-স্বত্বভোগী শহুরে জীবন বা চাকরি-ব্যবসার জন্য তাঁদের জমিদারী বা তার উপস্বত্বের আয় বাড়াতে পারেননি এবং নাগরিক জীবনের প্রতিষ্ঠা, বিলাসিতা, শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য গ্রাম্য আয়ের উপর (যার সবটুকুই প্রায় অনুপার্জিত আয়) নির্ভর করেছেন বেশী। আর কৃষক-কারুবর্গ যারা শহরে দিনমজুর, গৃহভৃত্য, কারখানার মজুর, অথবা ছোট ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে সপরিবারে সম্পূর্ণ

শহরবাসী হওয়া আর্থিক কারণেই সম্ভব ছিল না। তাঁদের কেউ গ্রামে কেউ শহরে বসবাস করতে থাকেন। এইভাবে নাগরিক জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বাঙলার গ্রাম্য সমাজে। শহরে সাহেবের খানসামা-খিদমদ্‌গার, নাগরিক অভিজাত পরিবারের ভৃত্য, গ্রামে গেলে মনিবের প্রতিনিধির মতো ব্যবহার করা গ্রাম্য সমাজে বিশেষ মর্যাদা পায়। এদের নিকট থেকে গ্রামের লোক পুরনো রামায়ণ গান ও কথকতার মতো নগর জীবনের নতুন রূপকথা ও কথকতা শোনে।

মনে রাখতে হবে, সব গ্রামের অবস্থা এক নয়। শহরের কাছের কোন গ্রাম আর শহর থেকে দূরের গ্রামের অবস্থা আলাদা। 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন : "দূরস্থিত জনপদ সকলের লোকদিগের বিলাস-বাসনা অল্প। সামান্য আহার, সামান্য পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা সুখে দিনযাপন করে। কিন্তু সহরের নিকটবর্তী স্থানে নিত্য নতুন নতুন বিলাসসামগ্রী দেখিতে পাওযা যায়। তাহাতে লোকের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে।" এইভাবে শহরের পরিবর্তনশীল ফ্যাশানের সঙ্গে গ্রামের লোকও তাল দিয়ে চলতে চায়। ফলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছেন : "বঙ্গ সমাজে দিন দিন যত ইংরাজ জাতির আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি প্রবিষ্ট হইতেছে, ততই আরও দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে।" এই অবস্থায় গ্রাম ও গ্রামীণ জীবনে পরিবর্তন এসেছে।

শহরের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। এখনও প্রায় সত্তর শতাংশ লোক গ্রামের বাসিন্দা। এবং কৃষিনির্ভর জনসমষ্টির এক বিরাট অংশ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর অথবা অতিক্ষুদ্র জোতের মালিক। এদের প্রায় প্রত্যেকেই জোতদার-মহাজনদের দাদন বা সুদ-বন্ধকী ঋণের জালে আবদ্ধ। যদিও সরকারের তরফ থেকে বারেবারে ঘোষণা করা হচ্ছে এই ঋণগ্রস্তদের কুসীদজীবী মহাজনদের উৎপাত থেকে উদ্ধার করার সংকল্প, সেইমতো পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তাতে অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন এখনও হয়নি। লোকসমাজ হাজার বছর পূর্বের জীবনাভ্যাস ও পদ্ধতির প্রতি গভীর আস্থাশীল। গ্রাম্যতা পরিহার করে পুরোপুরি নাগরিক হবার বাসনা অধিকাংশ গ্রামবাসীর নেই। বাসনা যাদের আছে তাদেরও শহরে বাস করার ক্ষমতা নেই। মানসিকতার দিক থেকে বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও শহরের বহু নাগরিককে গ্রামবিমুখ করা যায়নি। গ্রামবাসী গ্রাম্যতা পরিহার করেনি। তারা আবহমানকালের জীবনাভ্যাসকে বদলে ফেলতে চায় না। তবু যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ ও রিক্রিয়েশনে নানা পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন পুরাতন জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে আসেনি,

পুরোপুরি ঐতিহ্যানুগত থেকে শহরের কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধার অংশীদার হতে চাইছে। শহরবাসীদেব মধ্যেও গ্রাম্য চেতনা নিঃশেষিত হয়নি। তাই শহরবাসী নানা দময়ে গ্রাম্য আচার-অনুষ্ঠানে মাততে পাবে। পারে, কেননা পুরাতনকে ভোলা সহজ নয়, অনেকক্ষেত্রে সম্ভবও নয।

শহুরেয়ানার প্রভাব ও আত্মসমালোচনা

ইংরেজ আগমনের পূর্বে বাঙালী কৃষি এবং হস্ত ও কুটির শিল্পকে সমান্তরাল ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিল। শিল্পে-বাণিজ্যেও প্রভূত উন্নতি করেছিল। তবু তাদের লোকবৃত্ত হারিয়ে যাযনি। কুটির শিল্প ধ্বংস করেছে ইংরেজ। তারা যে নতুন মানসিকতার আমদানী করে তাতে কলকাতা ও ঢাকা 'সিটি', বাঙলার অন্যান্য শহর বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রাম মানেই পাড়াগাঁ। সে ভাবেই ছোট্ট শহরে গ্রাম্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি রযে গেছে। নাগরিকতা লোকবৃত্তকে ধ্বংস করতে পারেনি। ইংরেজ বণিকদের প্রয়োজনে যে সব শিল্পের প্রসার হয তাতে বাঙালীর সাবেক জীবনধারাব অনেকটা বদল হয ঠিকই, কিন্তু ঐতিহ্যচেতনা নষ্ট হয় না। টাকার আমদানীতে নতুন জীবনবোধ আসে। অনেকে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসতে থাকে। কেউ কেউ সাহেবীয়ানার দিকেও ঝুঁকতে থাকে। তবু পিতৃপুরুষের চিন্তাচেতনাকে অস্বীকার করতে পারে না। শহরের এই শ্রেণী শিক্ষায়, মননে, সাধনায় ও কর্মে অগ্রণী ভূমিকা নিতে থাকে সমাজবিপ্লবের প্রতিটি ক্ষেত্রে। টাকা মানুষকে শাসন করে চলে। তাতেও বাঙালী নিজস্ব সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আঁকড়িয়ে থাকতে ভোলে না। তাই সমাজবিপ্লবের প্রতিটি ক্ষেত্রে লোকসমাজ রচনা করতে পেরেছে তাদের সুখ-দুঃখ, অভাব-বেদনার কাহিনী, গল্প, গান-গীতিকা, ছড়া-গাথা, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি। লোকবৃত্তের এই সব শাখার যেখানে ঐতিহ্য এবং সমষ্টির কথা স্থান পেয়েছে সে সব উপকরণ টিকে গেছে, অন্যেরা হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে কারণ, তা পরম্পরাগত ব্যাপার নয়, সাময়িক বা খণ্ডিত, তাই তাদের আবেদনও আংশিক সময়ের।

ইংরেজের প্রায় দুশো বছরের শাসন ও শোষণে ভারতীয় সমাজ বিপর্যস্ত। পাঁচশো বছরের মুসলমান রাজত্বে নবাব, সুলতান, রাজাদের জমির উপর মালিকানা স্বত্ব ছিল না। তাঁরা উৎপাদনের একটা অংশ রাজস্ব হিসাবে পেতেন। ইংরেজ আমলে নতুন ভূমি

ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। নতুন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে কর্নওয়ালিস ও তাঁর সমর্থকেরা ভেবেছিলেন এর দ্বারা চাষবাসের উন্নতি হবে, কিন্তু ফল হলো উল্টো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের এমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় যাতে তাঁরা নিজেদের আখের গোছাবার ব্যবস্থা করতে পারেন। "জমিদারেরা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ঠিক প্রজাদের মতো নয়, কতকটা ক্রীতদাসের মতো। তাঁরা নিজেদের রাজা-মহারাজাদের মতো মনে করেন, প্রজাদের কাছে খাজনাদি যা তাঁদের ন্যায্য পাওনা তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁরা নানা কৌশলে আদায় করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে নিজেদের নানারকমের কাজে প্রজাদের খাটিযে নেন। তাছাড়া অত্যাচার যে কতরকমের তা বলে শেষ করা যায় না," লিখেছেন আলেকজাণ্ডার ডাফ। এই জমিদারদের অত্যাচার-উৎপীডনে বাঙলার গ্রামে হাহাকার পড়ে যায়। রায়তওয়ারী ব্যবস্থাতেও চাষীদের কোন উপকার হয় না। বরং এই ব্যবস্থায় মুদ্রায় খাজনা ধার্য হলে কৃষকদের দুর্দশা আরো বাড়ে, ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সৃষ্টি হয। নিজেদের বাঁচাতে তারা চা-বাগিচা শ্রমিকের কাজে দূর দূর দেশে চলে যেতে থাকে। কৃষিব্যবস্থার এই অবস্থার মধ্যে কুটির শিল্পও ধ্বংস হয়। এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকেরা ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের দলে ভিড়ে যায়। এই শ্রেণীর কৃষকদের সংখ্যা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কৃষিনির্ভরশ্রেণীর প্রায ষাট শতাংশ। তাদের অনেকের মধ্যেই চলছে সহযোগিতার অভাবে সংঘর্ষ। কিন্তু সকলেই যুগসঞ্চিত সংস্কারের বশ্য। এ সংস্কার ধর্মের, এ সংস্কার আচার-আচরণের, এ সংস্কাব শোষণেব, এবং প্রভুত্ব ও আধিপত্য অর্জনের। শোষণ, অত্যাচার ও উৎপীড়নের হাত ধরে আসে বঞ্চনা ও অবসাদ। সর্বত্রই একটা অবসাদ। এখানে শতকরা সত্তর জন লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন। দারিদ্র্য দূর করার জন্য প্রয়োজন শিল্পের প্রসার। শিল্পের প্রসারে বিদ্যুতীকরণ। শহরেই যেখানে চলেছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট সেখানে রাজ্য সরকার গ্রাম বিদ্যুতীকরণের প্রস্তাব নিয়েছেন। কিন্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গে শতকরা সাতটির বেশী গ্রামে বিদ্যুৎ যায়নি। হরিয়ানায় ৯৯টি গ্রামে, পাঞ্জাবে ৯০টি গ্রামে, তামিলনাড়ুতে ৮০টি গ্রামে ও মহারাষ্ট্রে ৬০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের যে স্বল্পসংখ্যক গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে গেছে তার বর্তমান হাল যে কি, তা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে খুলে না বলাই ভালো। রাস্তাঘাটের অবস্থারও উন্নতি হয়নি। তবে যে সব গ্রামের উপর দিয়ে বাস চলাচল করে সে সব গ্রামের রাস্তা কিছু সংস্কার করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থারও হাল অনেকটাই

সাবেকী। স্বাস্থ্যকেন্দ্র অধিকাংশ গ্রামেই নেই। যে সব গ্রামে আছে সে সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থাও করুণ। অর্থাৎ আমাদের অধিকাংশ গ্রাম এখনও পূর্বের চেহারায় বর্তমান, গ্রামবাসী সাবেকী চিন্তা ও চেতনা, ধর্ম ও সংস্কার নিয়ে শাসিত।

ইউরোপীয় সভ্যতায় যারা আলোকপ্রাপ্ত তাদের নিয়ে গঠিত শিক্ষিত সমাজকে ইউরোপের অগ্রণী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং তাদের মধ্যে আর যাই থাক দেশজ চিন্তা-চেতনা-ঐতিহ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তবে একথা মানতেই হবে যে স্বাধীনতা সংগ্রামে ওদের একদল গোপনে বিপ্লবী ও স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। কীসের লোভে তারা একাজ করেছিল স্বাধীনতা-লাভের পরেই তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমরা এই সব ব্যক্তি বা তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এই মুহূর্তে উৎসাহী নই। সুতরাং এই সমাজে লোকবৃত্তের কোন ভূমিকা আছে কি নেই তা নিয়েও আমাদের মাথাব্যথা নেই।

সাধারণ মানুষ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বে যে তিমিরে ছিল এখনো প্রায় সেই তিমিরেই আছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৭টি গ্রামে বিদ্যুৎ গেছে এবং এখানকার কৃষিনির্ভর জনসংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ, যার বিরাট অংশ ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর বা ক্ষুদ্রজোতের মালিক, এবং জমির মালিকদের শতকরা ৭০·৯ ভাগ এক একরের চেয়ে কিছু কম জমির মালিক। হিসাবটা সরকারের। দরিদ্রশ্রেণীর মানুষেরা দেশীয় ধারা ও ধাঁচে গড়ে উঠেছে। 'র‍্যাশনাল' যুক্তিতর্ক বা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অথবা সংখ্যাতত্ত্বের পদ্ধতি অনুসারে ওদের ঐতিহ্যচেতনা, বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও ধর্ম-চেতনা বিশ্লেষণ করা না গেলেও ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-গবেষকেরা দেখিয়েছেন যে এসবের বাস্তব ভিত্তি আছে। প্রাকৃতিক চিকিৎসা, কৃষি ও খনার বচন ও বহু সংস্কারের মধ্যে সত্য লুক্কায়িত, লুক্কায়িত শুধু এদেশেই নয় বিদেশেও। কিছুদিন পূর্বে চীনদেশে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, কেন সেখানে কর্তারা লোকজ্ঞান এবং পশুপক্ষীর আচরণকে পাত্তা দেননি তা নিয়ে বিশ্ববিজ্ঞানী মহলে হইচই উঠেছিল। লৌকিক মনোভাবের মধ্যে অনেকে প্রিমিটিভ চেতনা দেখতে পান। তাতে লোকসমাজের কিছু আসে-যায় না, লোকসমাজ নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্য এবং সংস্কারকে মান্য করে চলতে চায়—তার জন্য কারো কাছে প্রিমিটিভ বা বর্বর হতেও তাদের আপত্তি নেই।

লোকসমাজ পিতৃপুরুষদের আচরণীয় কৃত্যাদি গর্বের সঙ্গে মান্য করতে চায়। গ্রামবাসী লোক এবং শহরের পরম্পরাগত ধারায় বিশ্বাসী লোক—উভয়ের পক্ষেই একথা

সত্য। তাই মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে লক্ষ লক্ষ শহরবাসী গঙ্গায় যান পিতৃতর্পণে। শহরের স্থানে স্থানে শীতলা-মনসা-শনি প্রভৃতি পূজার ধুম, মানত, ধন্না। পীরের জলের জন্য, মুনপড়া, জলপড়ার জন্য শহরের মানুষ গ্রামে গিয়ে ভিড় বাড়ান। বিজলী-ঝলমল কার্তিক রাত্রে আকাশবাতি জ্বালেন। দীপাবলীর রাত্রে বিজলী বাতির সঙ্গে মোমবাতি অথবা প্রদীপের মালা সাজান। অরন্ধন, ব্রত, উপবাস ইত্যাদি পালন করেন। এ সবই লৌকিক ক্রিয়াকর্ম। এরা লোকবৃত্তের অন্তর্গত বিষয়। লোকবৃত্তের এই গুরুত্বের কথা অনেক কৃতী ও দিগ্‌বিজয়ী বাঙালী বুঝেছেন, তাই তাঁরা এর চর্চার ব্যাপারেও উৎসাহ দেখিয়েছেন। উপমা প্রযোগের ক্ষেত্রে, মরমিয়া বা আত্মগত ভাবসাধনায়, দেশজ মেজাজ ও সুর রচনায় অনেক কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিক লোকবৃত্তের সমুদ্রে ডুব দিয়েছেন বাঙলায়। নৃত্যপরিচালনায়, সংগীতের সুরসৃষ্টিতে, ছন্দের চপলতার খেলায়, কল্পনার স্বপ্নপ্রয়াণে, লোকনাট্যের সৃষ্টিতে, গণনাট্য ও গণসংস্কৃতির চৈতন্য উদয়ে, বস্তুগত চেতনার বৈচিত্র্যকরণে ও আরও নানাভাবে ঐতিহ্যানুগত কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিককে নিমজ্জিত হতে হযেছে ও হচ্ছে লোকবৃত্তের গহীন গাঙে। দেশমাতৃকাকে ভালবাসতে গিযে কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে ও হচ্ছে শহরবাসীকে গ্রামবাসীদের সঙ্গে। কিন্তু এই লোকবৃত্তের চর্চায যাঁরা রত, যাঁরা তবু লোকবৃত্তবিদ্ তাঁদের অনেকেই বড়ো মাপের লোকদের কাছে খাটো। এ ব্যাপারে বিষয়ের গবেষকদেরও দায় ও দায়িত্ব আছে। বুঝে না-বুঝে যা পাই তা সংগ্রহ করে, যেভাবে খুশি সেভাবে সংগ্রহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে তাঁরা ব্যাপারটাকে সস্তা ও হালকা করে তুলেছেন, তাই মর্যাদা পাচ্ছেন না। আক্ষেপ করে লাভ নেই—যা দরকার তা সংশোধন, তা আত্মসমালোচনা।

পথ ও উপায় নির্দেশের ইঙ্গিত

মনে রাখতে হবে, লোকবৃত্ত প্রধানত দুটি খাতে প্রবাহিত। একটি নিরক্ষর, ঐতিহ্যে বিশ্বাসী জনগণের মধ্যে; আরেকটি আধুনিক বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যে। নিরক্ষর জনগণের মধ্যে যে লোকবৃত্ত প্রচলিত তা জনগণের ঐতিহ্যের ধারা আশ্রয় করে জীবিত, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত। ফলে লোকবৃত্তের অবয়ব, ভাব, ভাষা ও ছন্দের পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু ঐতিহ্যচেতনা বলবৎ থাকে।

আধুনিক নাগরিক সমাজের মধ্যে যে লোকবৃত্ত প্রচলিত তা ঐতিহ্যবর্জিত বস্তু-উপকরণ। মার্কিন পণ্ডিত রিচার্ড এম. ডরসন এই লোকবৃত্তকে বলেছেন 'ফেকলোর' বা লঙ্ঝড়বৃত্ত। আকাশবাণী, দূরদর্শনের লৌকিক অনুষ্ঠান, শহরের সাংস্কৃতিক মণ্ডপে অনুষ্ঠিত লোকউৎসব ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর বা লঙ্ঝড়বৃত্ত। আকাশবাণী থেকে প্রাচীন লোকসংগীত প্রচার করা হয়। প্রাচীন বর্ণনা থেকে লোকসংগীত অথবা কোন আধুনিক সংগীতকারের রচিত লোকসংগীতও পরিবেশিত হয়। লোকসংগীত গবেষক বা শিল্পীদের কেউই লোকসংগীতকে প্রাচীন বা আধুনিক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন বলে জানি না। তাছাড়া 'প্রাচীন লোকসংগীত' বা 'প্রাচীন রচনা থেকে লোকসংগীত' বলে যা প্রচারিত, তা শোনামাত্র বোঝা যায় যে ঐ সংগীত কোন আধুনিক সংগীতকারের রচনা। সেথানে প্রাচীনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কী পদ্ধতিতে আকাশবাণী এই ভাবে শ্রেণীচিহ্নিতকরণ বা পৃথকীকরণ করেন, তা অনেকের পক্ষেই বোঝা কষ্টসাধ্য। অমুকের রচিত লোকসংগীত কি প্রকৃত লোকসংগীত? লোক-সংগীতের প্রথম শর্ত গোষ্ঠীর সৃষ্টি, গোষ্ঠীর বা সমাজের নিজস্ব জিনিস। অবশ্য কোন এককের রচিত সংগীতাদিও লোকবৃত্ত হতে পারে যদি তা কালে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হিসাবে মিশে যায়। অর্থাৎ সেইসব উপকরণে কোন ব্যক্তির স্বত্বাধিকার বা 'কপিরাইট' থাকে না। কিছুদিন পূর্বে আকাশবাণী জেলা-সংস্কৃতির বিবরণ প্রচার করেছেন সংস্কৃতিচর্চার নামে। এর মধ্যে আঞ্চলিক বা লোকসংস্কৃতির কতটা প্রতিফলিত হয়েছে জানি না। এই বিবরণী যাঁরা শুনেছেন তাঁদের অনেকেই বলেছেন যে এসব হচ্ছে সাজানো-গোছানো সরস বা সুগম অনুষ্ঠান। এ ব্যাপার শুধু আকাশবাণীই করে এমন নয়, দূরদর্শন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও উৎসবে হামেশাই দেখা যায়। বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে যেসব লোকসংগীত ও নৃত্যাদি পরিবেশিত হয় নানা আধুনিক ঢঙে, দেশে ও বিদেশে পরিবেশন করার জন্য লোকশিল্পীদের নৃত্যরীতিকে একটু আধুনিক করে, সাজপোশাককে একটু আধুনিক করে নৃত্য-গীতাদি পরিবেশনের যে কায়দা অনুসৃত হচ্ছে কিছুদিন থেকে, তার মধ্যে স্পষ্টই দেখি আধুনিকতা ও নাগরিক প্রভাব। লোকসমাজ ও লোকশিল্পীকুল এই আধুনিকতার দাপটকে অশালীন ও ভেজাল আমদানি করার প্রচেষ্টা হিসাবেই গ্রহণ করেন। এইসব প্রচেষ্টার দ্বারা প্রকৃত লোকবৃত্ত ও লোকজীবনকে জানা ও বোঝা যায় না, যা যায় তা হচ্ছে প্রকৃত ও সত্যকে ভুলে ভেজালের শিকার হওয়া। ঘিয়ের কাজ বনস্পতি দিয়ে চালাবার প্রচেষ্টা। এই

প্রচেষ্টা সহজেই জনপ্রিয় হয়। আর তাতে মার খায় সত্যিকারের দরদী কর্মী ও সৎ উদ্যম। বর্তমান পরিস্থিতিতে এইসব অনুষ্ঠান ও কাজকর্মেরও একটা স্থান আছে। স্থান আছে সেইসব কাজকর্মেরও যা লোকবৃত্তের বিভিন্ন উপাদান-উপকরণকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক-শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে অথবা প্রচার-মাধ্যম হিসাবে। একদিক থেকে এইসব কাজকর্ম লোকবৃত্তের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। লোকবৃত্তের শক্তি ও লোকবৃত্ত চর্চার যৌক্তিকতার বাস্তব স্বীকৃতি ঘোষণা করে। তবে এইসব কাজকর্মকে লোকবৃত্ত-শাস্ত্রানুগত অনুশীলন হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। তথাকথিত শিক্ষিত নাগরিক ও ঐতিহ্যবিরোধী ব্যক্তিদের কাছে এইসব উৎসব-অনুষ্ঠানের যে মূল্য, এদের সে মূল্য স্বীকৃতি পায় না লোকসমাজের কাছে। আবার লোকসমাজ কর্তৃক গৃহীত না হলে কোন উপাদান বা বস্তুকে লোকবৃত্তবিদ্ লোকসমাজের দ্রব্য বা উপকরণ হিসাবেও গ্রহণ করতে পারেন না। বিরোধ এখানে। এই বিরোধকে অর্থাৎ শহরের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে, নাগরিক রুচির মনোরঞ্জনে, আকাশবাণী, দূরদর্শন ও ছায়াছবির পর্দায় অথবা প্রচার-মাধ্যম হিসাবে ও বিভিন্ন আন্দোলনে যাঁরা বিভিন্ন প্রকার লোকবৃত্তের ব্যবহার করেন তাঁরা লোকবৃত্তকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়শই ব্যবহার করতে পারেন না। যদি কেউ ব্যবহার করেন তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য অনেকসময়েই সিদ্ধ হয় না। লোকবৃত্তবিদেরা চান কি না-চান, লোকবৃত্তের জন-উন্মাদনার জাদুশক্তির দরুন অর্থাৎ লোকবৃত্তের আবেদন, শিক্ষা, জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের জন্য বৃহৎ জনসমষ্টিকে সঙ্গে করে এগোবার তাগাদা থেকে শহরের তথাকথিত সংস্কৃতিপ্রেমী ও প্রচারবিদেরা লোকবৃত্ত অর্থাৎ উপাদান-উপকরণকে তাঁদের মতো করে ব্যবহার করবেনই, যুগের হাওয়াকে অস্বীকার করা যাবে না। তাই এঁদের কাজকর্মকেও মানিয়ে নিতে হবে। তার জন্য একটা নির্দিষ্ট মান ঠিক করার দরকার আছে। রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে ওদের অচ্ছুৎ করে যেমন রাখা যায় না, তেমনি শাস্ত্রীয় ভিত্তিতেও ওদের গ্রহণও করা যায় না। ততঃ কিম্? লোকবৃত্ত অনুশীলনের এই দুইটি ধারাকে আলাদা করে দেখতে হবে, আলাদা করে উভয়ের মূল্য বিচার করতে হবে। উভয়কে মিলিয়ে ফেললে চলবে না। এবং কোন ধারাকে অস্বীকার করেও এগোনো যাবে না। কীভাবে এ কাজ করতে হবে তা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নেবার এখনই প্রয়োজন। তা না করে আমাদের পণ্ডিত-বিদ্বানেরা শুধুই চীৎকার করে চলেছেন—গ্রাম ধ্বংস হচ্ছে, লোকবৃত্ত ধ্বংস হচ্ছে, যা পারো এখনই সংগ্রহ করে ফেলো। এর ফলে এমন সব দ্রব্য

ও উপকরণ উদ্ভাবিত হচ্ছে যা আসল না নকল, তা অনেক ক্ষেত্রেই বিবেচনাসাপেক্ষ। সর্বপ্রথম যা দরকার তা লোক, লৌকিক, লোকবৃত্ত, লোকসমাজ ও লোকজীবন সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান। গ্রাম ও নগরের সংস্কৃতিবিষয়ক জ্ঞান। প্রচার-মাধ্যম, আন্দোলন ইত্যাদি ও নাগরিক সমাজপুষ্ট লোকসংস্কৃতির চর্চার চাহিদা সম্পর্কিত জ্ঞান।

নাগরিক চাহিদা আর লোকসমাজের চাহিদা এক নয়। তবু নাগরিক সমাজে লোকসংস্কৃতি তথা নাগরিক লোকসংস্কৃতি চর্চার একটা উৎসাহ এসেছে। এই উৎসাহকে সঠিক ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে যাওয়া গেলে অনেককে প্রকৃত লোকসংস্কৃতি ও লোকবৃত্ত চর্চায় উৎসাহী করা সম্ভব, এবং সেটা হবে লোকবৃত্তবিদ্‌দের উপরি পাওনা। তাই এই ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে, আচরণ-ব্যবহারের মধ্যে যাঁরা লোকবৃত্তের কঙ্কাল দেখতে পান, আমরা তাঁদের সঙ্গে সহমত পোষণ করি না। বরং আমরা মনে করি, লোকবৃত্তের জনপ্রিয়তার মূলে ওদেরও একটা ভূমিকা আছে। এই ভূমিকাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য লোকবৃত্তবিদ্‌দের যে ধরনের কাজকর্ম করা উচিত ছিল এখন অবধি বিষয়ের বিদ্বান্, পণ্ডিত ও গবেষকেরা সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এই সব অনুষ্ঠানের প্রতি কখনও অনীহা প্রকাশ করে চলেছেন, কখনও ক্রোধ প্রকাশ করে চলেছেন। আবার কখনও এদের স্বাগত জানাচ্ছেন যদি সেখানে তাঁদের উপস্থিতি ও নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়, সম্মান দেখানো হয়। অর্থাৎ কোন তথাকথিত পণ্ডিত হিসাবে খ্যাত কোন লোকবৃত্তবিদ্ যদি শহরের তথাকথিত সংস্কৃতিপ্রেমীদের ন্যায় কোন কাজকর্ম ও অনুষ্ঠানের শরিক হন তবে তাঁর কাছে তা সঠিক, কিন্তু সে কাজ যদি তাঁর অপছন্দের কোন ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয় তবে তা বেঠিক—আমরা এই মনোবৃত্তিকে সুস্থ মনোবৃত্তি বলে মনে করি না। তাই নির্মলেন্দু চৌধুরী, সলিল চৌধুরী, রুমা গুহঠাকুরতা, পূর্ণদাস বাউলদের সমালোচনা করতে কুণ্ঠাবোধ করি। কারণ, একটা আন্দোলন যখন চলে তখন এভাবেই তা ব্যাপকতা লাভ করে। ধীরে ধীরে তা নিজস্ব গতি পায়। সে গতি বা দিক ঠিক করেন তাঁরা যাঁরা আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকেন। লোকবৃত্ত আন্দোলনের নেতৃত্বাসীন ব্যক্তিদের অনেকেরই বিষয়ের প্রতি গভীরতা নেই। তার উপর আছে সহজে নাম কেনার, নগদ বিদায়ের প্রবণতা। তার ফলে এখনও লোকবৃত্ত খোলামাঠ। তা থাক, এর মধ্য থেকেই নতুন নেতৃত্ব আসবে, বিষয়ও তার সঠিক পথে এগোতে পারবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বাঙলার লোকবৃত্তের ভূমিকা

বাঙলার লোকবৃত্তের ভবিষ্যৎ-বিষয়ক আলোচনায় কৃত্রিম লোকবৃত্ত বা লক্করঝড়বৃত্তের পৃষ্ঠপোষকদের ভূমিকা কী, তা অন্য আলোচনার বিষয়। কিন্তু ওদেরও যে বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজন আছে, তা যে অস্বীকার করি না সে কথা আগেই বলেছি। ওদের অস্বীকার করতে পারি না, কারণ ওদের পেছনে একদল লোকের সমর্থন আছে। ওদের চেনা যায়। কিন্তু যাঁরা লোকবৃত্তের আদি ও অকৃত্রিম গবেষক বলে নিজেদের যত্রতত্র প্রচারিত করছেন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে লোকবৃত্তশাস্ত্র-পদ্ধতি অবহেলা করে নিজ-নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যা-খুশি তা লোকবৃত্ত বলে চালাচ্ছেন স্ব-স্ব পদাধিকার বা তোষামোদ ও কানকথার সুযোগ নিয়ে, তাঁরা আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ। এই সব অবুঝ ও তরল গবেষকদের উলটোপালটা কাজ রোখা না গেলে লোকবৃত্ত শাস্ত্র হিসাবে গতি পাবে না, বুদ্ধিজীবী চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও বিষয়ের গভীরে নিয়ে আসা যাবে না।

আরবানাইজেশনের ভয়ে অথবা গণসংস্কৃতির দাপটে অথবা শহুরে রুচির সেবা করতে যাঁরা কৃত্রিমতা আমদানি করেন, তাঁদের কিংবা প্রচারমাধ্যম হিসাবে আন্দোলনে ব্যবহারকারীদের কাজকর্ম আমাদের মোটেই আতঙ্কিত করে না। গবেষকরা যদি একটু সুস্থ ও শান্ত ভাবে বিষয়টাকে দেখতে ও বুঝতে শেখেন, সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে, বাস্তব বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিষয়টাকে বুঝতে আরম্ভ করেন, তবে তাঁরা উলটোপালটা কাজ করে নিজেদের বিশেষজ্ঞ ও নিবেদিত লোকবৃত্তবিদ্ বলে জাহির করতে লজ্জা পাবেন। আসলে কোন মানুষই নিজের কাছে চালাকি করতে পারে না। নিজের কাছেই জিজ্ঞেস করে দেখুন, বিশেষজ্ঞ হবার যোগ্যতা বা অধিকার কার কতটা আছে?

সকলেই জানেন, কৃষিজীবী সমাজের লোকবৃত্তের স্রষ্টা কৃষিজীবী সমাজ, শিল্পায়ত সমাজের লোকবৃত্তের স্রষ্টা কলকারখানার মেহনতী মানুষ—শ্রমিক, মজুর ইত্যাদি। তাছাড়া জেলে, ধোপা, নাপিত, তাঁতি, কুমার, কামার, ছুতার প্রভৃতি বৃত্তিভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণীর লোকবৃত্তের স্রষ্টা সেই-সেই শ্রেণী। আদিবাসী উপজাতি ও অনুন্নত সমাজের লোকবৃত্তের স্রষ্টা তারা। নারীসমাজের মধ্যেই লোকবৃত্তের বাহুল্য। তারা তাদের জীবনচর্যা ও ধারার মধ্য দিয়েই লোকবৃত্তকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

প্রত্যেক গোষ্ঠী ও শ্রেণীর লোকবৃত্তের নিজস্ব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, নিজস্ব কাঠামো ও পূর্বসূত্র বিদ্যমান, তা জানতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লোকবৃত্ত এবং জনজাতীয়বৃত্ত বা ট্রাইবাল লোরকে একই নিরিখে বিচার করা যায় না। জনজাতীয় জীবনধারা আলাদা, তাদের লোকবৃত্তও আলাদা। তবুও প্রায়শই তা করা হয়। এর ফলে সমস্ত জিনিসটা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। লোকবৃত্ত ও জনজাতীয় জীবনবৃত্তকে একই নিরিখে বিচার করার ব্যাপারে নৃবিজ্ঞানীরা বেশী আগ্রহ দেখান। সাহিত্যের ছাত্রেরা বিজ্ঞানী বনতে গিয়ে, নৃবিজ্ঞান না বুঝেই, তাঁদের ব্যবহৃত উপাদান-উপকরণকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানী সাজছেন। নৃবিজ্ঞানীরা তাঁদের শিক্ষাগত মান থেকে জানেন কী ভাবে জনজাতীয় লোকবৃত্ত ব্যবহার করতে হবে, সংগ্রহ করতে হবে। সাহিত্যবিষয়ক গবেষকরা তা প্রায়শই জানেন না, তবু বিজ্ঞানী হতে গেলে ওঁদের মতো চলতে হবে এই চেতনা থেকে অনেকেই সমস্ত ব্যাপারটাকে এত হালকা করে ফেলছেন যা ভাবা যায় না।

কৃষক যখন লোকবৃত্ত রচনা করেন তখন তাঁর চারপাশে যেসব ধনিক, জমিদার, জোতদার, মহাজন, দারোগা, পুলিস, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, সুদখোর, বেনিয়া ও মুৎসদ্দী, গ্রাম বা অঞ্চল প্রধান প্রভৃতি থাকে তাদের কথা থাকে। স্থানীয় ঘটনা-প্রবাহ, আন্দোলন, দেবদেবী, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, কিংবদন্তী, জমায়েতের কথা থাকে, নিজেদের অভাব-অভিযোগ, হাসি-কান্নার কথা স্থান পায়, চাহিদা ও অভাববোধ তাতে প্রতিফলিত হয়। লোভ-লালসা, প্রেম-ভালবাসা, সামাজিক-আর্থনীতিক অত্যাচার-শোষণ-অবিচারের কথাও স্থান পায়। সেখানে থাকে প্রকৃতির উপর নির্ভরতার চরিত্র, জীবনের একঘেয়েমি ও বৈচিত্র্য, মাঠের সুর, পশুপাখির সান্নিধ্য, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিশ্বাস, অলস চিন্তা, আষাঢ়ে গল্প, স্বপ্ন, জাদু, তুকতাক, মন্ত্র, বিশ্বাস, ভূতপ্রেতাদির কার্য, ওঝা-পীরের কেরামতি ইত্যাদি।

শ্রমিক ও মজুরের চারপাশে থাকে বণিক ও মালিক শ্রেণী, তাদের বশংবদ কর্মচারী, ফোরম্যান, কলকারখানা, হাটবাজার, দালাল, গুণ্ডা, ইউনিয়ন প্রভৃতির কার্যকলাপ। তাই তাদের রচিত লোকবৃত্তে পাই শোষণ ও বঞ্চনার কথা, অত্যাচার ও লাঞ্ছনার কথা, চিমনির শব্দ, ধোঁয়ার গন্ধ, বয়লারের তাপ, কয়লার স্পর্শ, পরিশ্রমের বদলে বঞ্চনার গ্লানি, কর্তাদের খামখেয়ালি ও স্বেচ্ছাচারের বর্ণনা প্রভৃতি, বন্ধনাবদ্ধ প্রমীথিউসের শিকলছেঁড়ার তৃষ্ণা ইত্যাদি।

নারীসমাজের লোকবৃত্তে পাই নানাবিধ সামাজিক ঘর-গৃহস্থালির বার্তা, দেব-দেবীর কাহিনী, অলৌকিক জিনিস, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-মহান্তদের কথা, সংস্কার, বিশ্বাস, আচার, আচরণ, ব্রত, উপবাস, মানত, ধন্না, কবচ, তাবিজ, গৃহবিবাদ, কলহ, রঙ্গরসিকতা, স্ত্রী-আচার, হর্ষ ও বিষাদের চিত্র। জীবন-বৈচিত্র্যের সন্ধান ও হাহাকারও এই লোকবৃত্তে প্রতিফলিত।

লোকশিল্পী, চারু-দারু-কারু-শিল্পী, ছুতার, মিস্ত্রী, ঘরামী, রাজমিস্ত্রী, কামার, কুমার, তাঁতি প্রভৃতিও নিজ-নিজ ঐতিহ্য, সমাজচেতনা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অভাববোধ এবং পাওয়ার আনন্দ থেকে লোকবৃত্ত রচনা করেন। সমস্ত মানুষই শিল্প, সাহিত্য ও শিল্পকর্মাদি নিয়ে এগিয়ে চলেছে স্ব-স্ব চেতনা ও চিন্তাকে সঙ্গে করে। এগিয়ে চলেছে সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদিকে মান্য করে। এগিয়ে চলেছে নাগরিকতা, প্রযুক্তি বিদ্যা ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে সঙ্গে নিয়ে। হয়ে চলেছে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার। এই যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকবৃত্তও বিবর্তিত হচ্ছে। নতুন চিন্তাচেতনা ও জীবনবোধ নতুন সৃষ্টিতে ধরা পড়ছে। কিন্তু সেই সৃষ্টি যদি ঐতিহ্যানুগত না হয়, তাতে যদি গোষ্ঠীমান্যতা না থাকে তবে তা টেকেনা।

যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির পরিবর্তন কী চরিত্র পায় তার কটি নমুনা :

ও আল্লা রাস্তাঘাটে কত মানুষ কান্দিয়া পাগল
দেশের তরে ভাষার তরে রক্ত গঙ্গাজল।
মানব না আর টিক্কা খান, তামাক খান, হুক্কা খান, ভাই,
(আর) মুক্তিসেনা খুঁজে লও, সংগ্রাম করতে যাই।
ও ভাই, মুজিব ভাই ডাক দিয়াছে, থোও ফালাইয়া কাজ,
আও সকলে সংগ্রাম করতে পরইয়া রণ-সাজ—
চলো যাই, মা জননীর দুর্দশা ঘুচাই।

অথবা—

নীলবানরে সোনার বাংলা কল্লে এবার ছারখার,
অসময়ে হরিশ মলো, লঙের হলো কারাগার।
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার।

বা—

কি হলোরে জান, পলাশী ময়দানে নবাব হারালো পরাণ।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে লাখে,
একলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়,
হাঁটু গেরে মারছে তীর মীরমদনের গায়।
কি হলোরে জান, পলাশীর ময়দানে নবাব হারালো পরাণ।
নবাব কাঁদে সিপুই কাঁদে আর কাঁদে হাতী,
কলকেত্তাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী।
কি হলোরে জান, পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানী নিশান।
ফুলবাগে ম'ল নবাব, খোসবাগে মাটি,
চাঁদোয়া টাঙ্গায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটী।
কি হলোরে জান, পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী নিশান।

১৭৫৭ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৬০ সালের নীল বিদ্রোহ ও ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গানে যুগচেতনা ধরা পড়েছে। এই সব গানের শব্দচয়ন, ছন্দ ও বাচনভঙ্গির মধ্যে দেশজ ঐতিহ্যের স্বাদ পাই এবং পরিবর্তিত সমাজজীবনে কী ভাবে সংগীতাদি গড়ে ওঠে তা আন্দাজ করতে পারি।

কিন্তু পরিবর্তিত লোকসমাজভিত্তিক এই সব সংগীতকে আধুনিক লোকসংগীত বলতে পারি কি? লোকসংগীতকে আধুনিক ও প্রাচীন এই পর্যায়ে ভাগ করা যায় কি? অন্তত বিষয়ের গবেষক ও বিদ্বানেরা এ ধরনের কোন প্রস্তাব রেখেছেন কি?

ঐতিহ্যানুগত চেতনা ও সৃষ্টি

বিলাতে লোকবৃত্তের কাজ শুরু হয় গতশতকের মধ্যভাগে, কিন্তু আমাদের দেশে *'লোক'-সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা বৈদিকযুগের শেষভাগ থেকেই শুরু হয়ে যায়।* ভরতের নাট্য-শাস্ত্র পড়লে জানা যায় যে সুদূর অতীতেই উচ্চকোটির মধ্যে এক ধরনের চিন্তাবিপ্লব জাগ্রত হয়েছিল। এই বিপ্লবের মূল বার্তা ছিল অনুন্নত অবহেলিত শ্রেণীর নৈতিক

শিক্ষা। সমাজশাসকদের বৃহৎ অংশের বিরোধিতায় এ বিপ্লব বেশীদূর অগ্রসর না হলেও নাটককে লোকগ্রাহ্য করার প্রচেষ্টা দেখি, তার মধ্যে এই বিপ্লবের সার্থকতার কথা বুঝতে পারি। লোকগ্রাহ্য নাটকের লোকধর্মিতা অর্থাৎ স্বভাব দ্বারা উপগত বা লোকক্রিয়ার মধ্যে লোকজ্ঞান পরিবেশিত হতে দেখি। লোকধর্মী অভিনয় আর্টের দিক থেকে উন্নত নয়, কিন্তু তা লোকসমাজের বিবরণপুষ্ট। বাৎসায়নের-কামসূত্রে 'নাগরিকতার' বিপরীত 'লৌকিক' অবস্থানের কথা অনুমান করতে পারি। অর্থাৎ তখনও লৌকিক বিষয় গ্রাম্য বলে অবহেলিত নয়। বিবর্তনের পথে পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন ঘটে গায়নপদ্ধতি ও রচনাপদ্ধতিতেও। তারও নানা রূপান্তর ঘটেছে, ঘটে চলেছে। অবশ্য "লোকগীতির এবং পরিশীলিত সমাজের গীতি, এ দুটির রচনা ও বিবর্তনে যেমন পার্থক্য আছে তেমনি ঐক্যও আছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির পারিপাট্য নিয়ে যে সমাজ গান রচনা করে তাতে সব দিক থেকেই নিয়ন্ত্রণ এবং কারুকলার সীমিত ও শোভন প্রচেষ্টা দেখা যায়। তার লিরিক রচনা করার নিয়ম এবং তা গাইবার নিয়মেও একটা বিশিষ্ট শৃঙ্খলাবোধ আছে যা তার সমাজের উপযোগী। কিন্তু তার বাইরে যে সমাজ তার আদর্শ এতটা কৃত্রিমতা মেনে চলে না। সে তার গানকে তার উন্মুক্ত পরিবেশের মতোই প্রকৃতির সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করে। সে যে গান রচনা করে তার বিষয়বস্তু, তার তুলনা, অলঙ্কার আর সংগঠন, তার প্রকাশকে সার্থক করে তুললেই হ'ল—সে আর বেশী-কিছু দাবী করে না। তথাপি তার ক্ষেত্রেও একটা শাসন আছে ; সেও বাঁধনহারা প্রগল্‌ভতাকে প্রশ্রয় প্রদান করে না। একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বলি যে, উপজাতীয়, আদিবাসী বা পল্লীবাসীদের মধ্যে যা কিছু আমরা গান বলে সংগ্রহ করি তাই গান পদবাচ্য নয়।...জনপদে প্রচলিত সঙ্গীত নামক তাবৎ বস্তুই নতুনত্বের দিক থেকে মূল্যবান্ হতে পারে, কিন্তু লোকশিল্পের দিক থেকে নয়" (রাজ্যেশ্বর মিত্র)।

লোকসংগীত প্রধানত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংগঠিত হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য লোকবৃত্তের সমস্ত শাখায় প্রতিফলিত। ভাটিয়ালি, ভাদু, টুসু, ভাওয়াইয়া, চটকা, ঝুমুর, মনসাগান, রাখালিয়া গান, ভাঁজো, বাঁধনা প্রভৃতি গান আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে আছে। প্রসঙ্গত, বাউলকে অনেকেই লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করতে রাজী নন। অনেকে বাউল ছাড়া লোকসংগীত ভাবতে পারেন না। সুকুমার সেন বাউলসংগীত

সম্পর্কে বলেছেন : "ওগুলি যত্নকৃত রচনা, যে রচনায় প্রাচীনতর ধারার সযত্ন অনুকৃতি আছে এবং এ রচনা যাঁদের দ্বারা হয়েছে তাঁরা অনামা থাকলেও ডিসিপ্লিন পেয়ে তবে ওসব রচনা করতে পেরেছেন।" পরিশীলিত নাগরিক কাব্যসংগীতের অনেক অংশের সঙ্গে বাউলসংগীতের মিল আছে। বাউলসংগীতের মতোই কীর্তনও লোকসংগীত নয় অনেকের মতে। এর রচনা ও পরিবর্ধনে লোকরীতি অনুসৃত হয়নি। কীর্তন রাগসংগীতের ধরন-ধারনই মেনে চলে। তবে উভয় সংগীতের শ্রোতার অভাব নেই, ম্যাস পার্টিসিপ্যেশনের দিক থেকে উভয় সংগীতই পল্লী বা লোকসংগীতের সহযোগী হয়ে পড়েছে।

লোকসমাজ ও নাগরিক সমাজ কী ভাবে একে অন্যকে প্রভাবিত করে, তার একটি উদাহরণ তুলে ধরছি রাজ্যেশ্বর মিত্রের রচনা থেকে : "পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে একপ্রকার সংগীত আছে যাকে মনোহরসাই নামে অভিহিত করা হয়। এই মনোহরসাই পদাবলী কীর্তনের মনোহরসাই নয়। এটি এমন একটি রীতি যাতে কীর্তন এবং বিভাস রাগের একটা মিশ্রণ ঘটেছে। বিভাস সকালের রাগ। এই রীতিতে অনেক গান রচিত হয়েছে। নীলকণ্ঠের একটি পদে আছে 'তোমায় হেরে অঙ্গ জ্বলে, তুমি কি আশায় এখানে এলে, ফিরে যাও হে চিকনকালা, বাসিফুলে কি মধু মেলে'। এটি এই ঢঙের গান। আগমনীর অনেক গান আছে যা পল্লীবাসীরা বিভাসে গাইতেন। পল্লীতে প্রচলিত বহু গানই একসময় এই রাগে গাওয়া হয়েছে যার ফলে বিভাস একটি পর্যায় রূপে গণ্য হয়ে গেছে। যাত্রার গানগুলি নাগরিক এবং পল্লীগীতির মিশ্রণের উদাহরণ। 'তোরা যাসনে যাসনে যাসনে দূতি' এই গানটির কথা বোধকরি অনেকেই জানেন। এটি নিতান্ত সরল ভৈরবীতে গাওয়া হত। কিন্তু কলকাতায় অনেক বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকা এটি রীতিমত ওস্তাদী ঢঙে গাইতেন। গোবিন্দ অধিকারীর 'আমায় দে গো মোহনচূড়া বেঁধে' গানটি একটি রাগসংগীত। একদা জয়দেবের মেলায় যাবার সময় অণ্ডালে একটি পল্লীবাসীর মুখে আমি এই গানটি নিতান্ত গ্রাম্য ঢঙে শুনেছিলাম।··· এক সময় কলকাতায় যখন টপ্পা গানের প্রচলন হয় তখন তার প্রভাবও পল্লীসংগীতে পড়েছে। বহু পল্লীগায়ক আগমনী, শ্যামাসঙ্গীত সরল টপ্পার প্রয়োগে গাইতে চেষ্টা করতেন।···টপ্পা রীতির সঙ্গে দাদরা, খেমটা, কার্ফা প্রভৃতি বহু বিচিত্র তালের গান আমাদের কাব্যসঙ্গীতে পাওয়া যায়। এগুলোর বহুল প্রভাবও লোকসঙ্গীতে পড়েছে।···আসলে মানুষের স্বভাব এই যে, মনের মত

হলেই তাকে কোনও-না-কোন প্রকারে গ্রহণ করে।...ধীরে ধীরে আধুনিক সঙ্গীত থেকেও অনেক কিছু তাদের সঙ্গীতে যুক্ত হযে যাবে এবং সেটা তাদের রীতির মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে।...এর মধ্যে একটা বিচার আছে। এই মিশ্রণের কতটা কৃত্রিম আর কতটা স্বাভাবিক সেটা নির্ণয করা দরকার।" এটাই ঠিক কথা। প্রতিনিয়ত আকাশবাণী, গ্রামোফোন রেকর্ড, দূরদর্শন, ছায়াছবি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যে সব লোকসংগীত শুনতে পাই তাব অধিকাংশই পুনর্জাত, যদিও লোকসংগীতকে পরিবর্তন বা সংস্কার করার অধিকার কোন শিল্পীর থাকা উচিত নয়।

লোকসংগীতের যে পরিবর্তন হয তার জন্য দায়ী পরিবেশ ও আরও নানা ধরনের অবস্থা। এই সংগীত, রাজ্যেশ্বর মিত্রের ভাষায়, "আমাদের কাব্যসঙ্গীতের মতই একটা ভিন্ন পর্যায় যা লৌকিক নিয়মে নিবদ্ধ হয় এবং আচরিত হয়। এর অনুষ্ঠানের ধারা স্বতন্ত্র। হয়ত তা স্থূল এবং শ্লথ, প্রযোগের দক্ষতা এবং চাতুর্যে পরিশীলিত কাব্যসঙ্গীতের মত নয। কিন্তু সে গান একান্তভাবেই মানবিক, অকৃত্রিম এবং বিভিন্ন আবেদনে পরিপূর্ণ, লোকগ্রাহ্য। যা লোকগ্রাহ্য তার মধ্যে এমন বস্তু আছে যা সর্বসম্প্রদায়ের গ্রাহ্যতার মধ্যে পরিমাণিত হয়।" যে সংগীতের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্যতার আবেদন থাকে না তা লোকসংগীত হতে পারে না। তাই শহরের শিল্পীদের গাওয়া কোন লোকসংগীত যদি পল্লীবাসীর গ্রাহ্য না হয় তবে তা লোকসংগীত পর্যায়ভুক্ত হবে না। কোন এককের রচনাও লোকসংগীত নয় যতদিন না তা গোষ্ঠীর রচনায় পর্যবসিত হয়। যেমন প্রাচীন সাহিত্য আর লোকসাহিত্য এক নয়, তেমনি প্রাচীন সংগীত আর লোকসংগীতও এক নয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন : "শিল্পসাহিত্য সম্পর্কেই আমরা প্রাচীন, মধ্যযুগীয় বা আধুনিক কথাগুলি ব্যবহার করে থাকি, লোকসাহিত্য সম্পর্কে তা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রাচীনকালে কিংবা মধ্যযুগে লোকসাহিত্যের কি রূপ ছিল তা আমরা জানিনা, বা জানার কোন উপায়ও নেই। আমরা এখনকার সমাজের স্মৃতি থেকে লোকসাহিত্যের যে রূপের সন্ধান পাচ্ছি, তা এখনকার রূপ, সুতরাং আধুনিক।" তথাপি আধুনিক লোকসংগীত হিসাবে কোন সংগীত কি গ্রাহ্য করা যায়?

লোকবৃত্ত অমর : সে নিজের নিয়মে এগিয়ে যায় বহতা নদীর মতো

উপরের আলোচনায় যা বোঝাতে চেয়েছি তা হলো লোকবৃত্ত আধুনিক নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্ত হবে, এ সিদ্ধান্ত অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু লোকবৃত্তের বৈজ্ঞানিক চর্চার নাম করে যাঁরা লোকবৃত্তকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের মুখে এ কথা বার বার ধ্বনিত হয়। লোকসংগীত ও লোকসংস্কৃতির যে আধুনিক বিবর্তন তা ঠেকানো যাবে না। তাকে লোকবৃত্ত চর্চার অঙ্গ হিসাবেও গ্রহণ করা যাবে না। তার জন্য অকৃত্রিম বা নাগরিক সমাজে প্রচলিত লোকবৃত্তকে অন্য কোন নামে চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ আকাশবাণী, ছায়াছবি, দূরদর্শন, শহরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গণ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সংগীত ইত্যাদিকে লোকসংগীত বা লোকবৃত্ত চর্চার বা লোকবৃত্তশাস্ত্রের আওতায় আনা ঠিক হবে না।

প্রচার-মাধ্যম হিসাবে লোকবৃত্তের ব্যবহার, বিভিন্ন আন্দোলনে লোকবৃত্তের ব্যবহার চলছে, চলবে, তা লোকবৃত্তের শাস্ত্রঘেঁষা কাজ নয়। তবু এ কাজ অস্বীকার করা যাবে না। লোকবৃত্তের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির মূলে এদেরও ভূমিকা আছে। সুতরাং এসবকে 'লোক'-অভিধার বদলে অন্য কোন উপযুক্ত নামের দ্বারা চিহ্নিত করা হোক। লোকবৃত্তশাস্ত্র তার নিজস্ব শৃঙ্খলা, বোধ, পদ্ধতি ও প্রকরণ নিয়ে এগোক। এই উভয় ধারা নিজ-নিজ ঢঙে চলুক। উভয়ের মধ্যে যখন সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে তখন উভয়কেই স্ব-স্ব চরিত্রে বিচার করা হবে। বিশুদ্ধ গবেষণা ও চালাকি এবং ঢঙ-সর্বস্ব কাজকে একই নিরিখে বিচার করা যায় না, করা ঠিকও হবে না।

মনে রাখতে হবে, সমাজের জন্য যা প্রয়োজনীয় তা নষ্ট হয় না। সমাজের পক্ষে যা অপ্রয়োজনীয় তা নষ্ট হলেও কোন ক্ষতি নেই। তাই সঠিক পরিপ্রেক্ষিত না বুঝে, পূর্বপ্রসঙ্গ না বুঝে, উলটোপালটা সংগ্রহের চেয়ে বরং সংগ্রহ না করাও ভালো। সঠিক সংগ্রহ না হলে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সঠিক হয় না, এ কথাটা মনে রাখতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে।

লোকবৃত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে লোকবৃত্তবিদের দায়িত্ব আর অন্যদের দায়িত্ব এক নয়। এর ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই। লোকবৃত্ত আছে ও থাকবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টাইম ও স্পেস অনুযায়ী তা বিবর্তিত হবে ও পরিবর্তিত হবে। এটাই জীবনীশক্তি, এটা অবলুপ্তির চিহ্ন নয়।

লোকবৃত্তের প্রভাব বহুমুখী। সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য যথেষ্ট। আমাদের

দেশে সাহিত্যের ছাত্রেরাই লোকবৃত্তের ব্যাপাবে অধিক উৎসাহ দেখান। কিন্তু তাঁদের অনেকেবই চিন্তা ও চেতনা অস্পষ্ট। লোকবৃত্তের সাহিত্যিক মূল্য এখন অবধি বিজ্ঞানভিত্তিতে বিচার করে দেখা হয়নি, যদিও লোকবৃত্তের সাহিত্যিক মূল্য অপেক্ষা সমাজবৈজ্ঞানিক মূল্য অধিক। কিন্তু সেদিকেও আমাদেব লোকবৃত্তের গবেষকে.া অনেকটাই উদাসীন। তাঁরা বিজ্ঞান-বিজ্ঞান বলে সরব হন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের কথা বলেন, কিন্তু কাজ করেন না, বৈজ্ঞানিক কাজ করাব জন্য ছাত্রদের শিক্ষিত বা উৎসাহিত করতেও পারেন না। সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে লোকবৃত্তের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়নকে এগিয়ে নেওয়া গেলে কৃত্রিম লোকবৃত্তেব সংগ্রহ বন্ধ হবে। কৃত্রিম লোকবৃত্তকে অন্যভাবে বিচার করারও সুযোগ পাওয়া যাবে।

সাহিত্যের ছাত্রেরা লোকবৃত্তের প্রভাব বিশ্লেষণ কবতে এগিয়ে আসবেন, এটাই কাম্য। সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রে আছে লোকবৃত্তের প্রভাব। সাহিত্যিক, শিল্পী ও কবিগণ লোকবৃত্তের বিভিন্ন উপাদান-উপকরণ ব্যবহার করেন। কোন্ স্রষ্টা কী ভাবে লোকবৃত্তের কোন্ উপকরণ ব্যবহার করেন, লোকসমাজ ও নাগরিক সমাজকে এই সব উপকরণ কী ভাবে মাতাতে পাবে, তা-ও গবেষক লক্ষ করবেন। সাহিত্যিক ও কবিরা যেসব লোকবৃত্ত ব্যবহার করেন তা খুঁজে বের করে তার উপর বিচার-বিশ্লেষণ করবেন। সাহিত্যিক-শিল্পী-কবি ব্যবহৃত লোকবৃত্ত যদি অকৃত্রিম না হয়, তবে তা কৃত্রিম লোকবৃত্তের দলে ফেলেই বিচার করতে হবে। বিচার মানে কিছু উদাহরণ-উপকরণের তালিকা প্রণয়ন নয়, কোন্ উপকরণ, কোন্ প্রতীক কী ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তারও বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।

অকৃত্রিম লোকবৃত্তের সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সবসময়েই আছে, কারণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ লোকবৃত্তবিদদের অন্যতম প্রধান কাজ। কিন্তু এ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ হবে নির্দোষ ও বৈজ্ঞানিক মান-সমন্বিত। ভেজাল বা কৃত্রিম সংগ্রহের চেয়ে সংগ্রহ না করাও ভালো। তবে কৃত্রিম ও অকৃত্রিম, আসল ও ভেজাল চেনার মাপকাঠি কী? মাপকাঠি লোকগ্রাহ্যতা। মাপকাঠি আঞ্চলিকতা। মাপকাঠি পূর্বসূত্র ও কাঠামো। মাপকাঠি ঘটনার প্রামাণিকতা ও মাপকাঠি সহজ সরল মনেব সমষ্টির অভিব্যক্তি। ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করলে লোকবৃত্তকে শাস্ত্রে উন্নীত করা যাবে না, যদিও স্বাধীন শাস্ত্র হিসাবে লোকবৃত্তের কার্যকরিতার কথা ক্রমেই

জনপ্রিয়তা লাভ করে চলেছে। এই জনপ্রিয়তা থাকতে-থাকতেই বিষয়কে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিষয় এগিয়ে যায় বহতা নদীর মতো—নিজের খেয়ালে, নিজের ঢঙে। এই বিষয় অর্থাৎ লোকবৃত্ত হচ্ছে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির যোগফল। 'লোক'-কে যেমন গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, তেমনি লোকবৃত্তকে শুধুমাত্র মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। যদিও মৌখিক সাহিত্যই হচ্ছে লিখিত সাহিত্যের আদিরূপ। লোকবৃত্তের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক যে গভীর, তা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক রূপরেখাকেও বোঝা দরকার। তার জন্য শুধু সোর্স বা মূল অথবা আদিরূপ জানার ব্যাপারে অথবা সমান্তরাল খোঁজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে চলে না। কারণ, পূর্বেই বলেছি, লোকবৃত্ত হচ্ছে পরম্পরাগত সংস্কৃতির বাহক। সংস্কৃতির রসে জারিত জীবনসংগ্রামের যাবতীয় বস্তু এর অন্তর্গত। তার মধ্যে পাই পরম্পরাগত অ্যাকশন। গ্রহণ-বর্জন করে এগোয় বলে একে গ্রহণের দ্বার হিসাবেও চিহ্নিত করা যায়। একে বলা যেতে পারে ব্যাপ্তিশীল সাংস্কৃতিক তত্ত্ব, যা ঐতিহ্যচেতনা নিয়ে পুনরুক্ত এবং বিবিধ, চলমান এবং পরিবর্তনশীল। এর চালচলন ছাঁচ নিয়ন্ত্রিত। এই ছাঁচ লক্ষ করা যায় একটি গৃহে, একটি অনুষ্ঠানে, আহার ও পানীয়ের মধ্যে, বসন-ভূষণের মধ্যে, গৃহসামগ্রীর মধ্যে, বিবাহাচার, বিশ্বাস, ছড়া, কথা, কাহিনী, ব্রতকথা, রূপকথা, গান, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচনের মধ্যে, বাসস্থান, বাসগৃহ, আসবাব ও যন্ত্রপাতি এবং জীবন-সংগ্রামের নানা পদ্ধতিতে।

প্রত্যেকটি আচার-অনুষ্ঠান-কৃত্যের যেমন একটা সিটিউএশন বা প্রসঙ্গ অথবা কনটেক্সট বা পূর্বসূত্র আ , তেমনি প্রত্যেকটি লোকবৃত্তের উপকরণেরও পূর্বসূত্র আছে, যার সঙ্গে লৌকিক উপাদান-উপকরণ সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্ক কোথাও কর্তার সঙ্গে, কোথাও সৃষ্টিকর্তা ও শ্রোতার সঙ্গে, কোথাও উৎপাদিত বস্তু ব্যবহারকারীদের সঙ্গে। একটি-সাধারণ-ছাঁচের মধ্য দিয়ে এই সব উপাদান-উপকরণ বা দ্রব্য অথবা প্রডাক্ট বেরিয়ে আসে। সে উপাদান বা বস্তু হতে পারে কোন রচনা, কোন শব্দ বা কোন প্রতীক অথবা উপকরণ। কিন্তু যাই হোক না কেন, তার ছাঁচ বা প্যাটার্ন নির্দিষ্ট থাকার দরুন দেখামাত্র চেনা যায়। যে প্রসঙ্গ বা সিটিউএশনে যে উপাদান বা দ্রব্য সৃষ্ট হয় তা সঠিক ভাবে চিহ্নিত করার জন্য যে কনটেন্ট বা আধেয় অথবা ফর্ম বা আকারের

প্রয়োজন তা মিডিয়ম বা মাধ্যম। তাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে সেই সমাজ ও জীবনের কথা অনেকটাই অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় যে সমাজ এদের স্রষ্টা।

লোকবৃত্ত ক্রমোন্নতির ব্যাপারে প্রসঙ্গ ও মাধ্যম নির্ভর। এ দুয়ের ফলশ্রুতি হচ্ছে উপাদান বা দ্রব্য। লোকবৃত্তের সিটিউএ্যশন এবং মাধ্যমের বর্ণনাগত এবং কাঠামোগত দিক আছে। লোকবৃত্তকে কৃত্রিম উপায়ে শ্রেণীবিভক্ত করে কী ভাবে কাঠামো বা স্ট্রাকচারের বিশ্লেষণ করা যায়, তা বহু বিদ্বান্ দেখিয়েছেন। আমাদের অগ্রজ বিদ্বানেরা পূর্বে উপাদান ও দ্রব্য নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, সমকালের বিদ্বানেরা প্রসঙ্গ, পূর্বসূত্র, কাঠামো প্রভৃতি নিয়ে মাতাতে উৎসাহী। কিন্তু সুযোগ কোথায়?

লোকবৃত্তের সাহিত্য অংশ বিশ্লেষণ করার জন্য সৃষ্টিশীল সাহিত্য কাজে আসে। সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকেরা কতভাবে লোকবৃত্তের ব্যবহার করেন, কতভাবে লোকবৃত্তের প্রভাবের দ্বারা চালিত হন, তা অন্য একটি গ্রন্থে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি (দ্র. 'লোকবৃত্ত ও সাহিত্য')। আমাদের সমালোচকদের যাঁরা সাহিত্যে লোকবৃত্তের প্রেরণা লক্ষ করতে গিয়ে লোকবৃত্তকে প্রডাক্ট বা উপাদান হিসাবে লক্ষ করেছেন, তাঁদের অনেকেই বিষযকে সঠিক চরিত্র সহ তুলে ধরতে পারেননি। লোকবৃত্তের প্রেরণা ও প্রভাবকে বুঝতে ও বোঝাতে হলে লোকবৃত্তের বহুমুখী চরিত্র, এর কাঠামো, পূর্বসূত্র প্রভৃতি জেনেই এগোতে হয। মনে রাখতে হয়, লোকবৃত্ত সর্বত্র সঞ্চরণশীল। এটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক সার্বিক। যেহেতু প্রত্যেক লেখক-শিল্পী বা কবিই কোন-না-কোন সংস্কৃতি দ্বারা পুষ্ট, সেহেতু সৃষ্টিশীল রচনা তৈরি করতে গিয়ে তাঁরা জ্ঞানত বা অজ্ঞানত লোকবৃত্তের কোন-না-কোন অংশ ব্যবহার করতে পারেনই, বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য হন। কোন কোন লেখক-শিল্পী-কবি লোকবৃত্তের দ্বারা অধিক প্রভাবিত। কোন কোন লেখক-শিল্পী-কবি কম প্রভাবিত। কিন্তু কেউই লোকবৃত্তের প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন না। কেউ সজ্ঞানে তাঁর দেখা জগৎকে সাহিত্যে রূপ দিতে গিয়ে লোকবৃত্তের সমুদ্রে অবগাহন করেন, কেউ সজ্ঞানে গ্রহণ না করলেও এড়াতে পারেন না। কেউ উপাদান-উপকরণ সরাসরি সংগ্রহ করেন, কেউ সংকলিত গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেন, কেউ পূর্ব-অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্যানুগত শিক্ষার পথ ধরে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সকলকেই লোকবৃত্ত ব্যবহার করতে হয়, তবে সকলকেই ব্যবহারের জন্য প্রসঙ্গ, পূর্বসূত্র, কাঠামো প্রভৃতি জানার দরকার হয় না। কারণ, যে জীবন ও জগৎ তাঁর জানা, সে জীবন ও জগতের কথা বলতে গেলে ইচ্ছায় হোক-কি-

অনিচ্ছায় হোক, তার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সাহিত্যিক-শিল্পী-কবিরাও এড়িয়ে যেতে পারেন না।

লোকবৃত্তবিদ্‌দের কাজ প্রসঙ্গ, কাঠামো, পূর্বসূত্র ইত্যাদি লক্ষ করা। সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে উপাদান-উপকবণের ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা দেখা। তার জন্য লোকবৃত্তকে স্বচরিত্রে চিনতে, জানতে ও বুঝতে হয়। লোকবৃত্ত চিহ্নিতকরণের জন্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক সাক্ষ্য দরকার হয়। বলতে হয়, কোন্ উপকরণ কেন লোকবৃত্ত, কোন্ উপকরণ কেন লোকবৃত্ত নয়, কোন্ উপকরণের কী কাজ এবং কী ভাবে তার ব্যবহার করা হয়েছে, তা সবই লক্ষ করেন লোকবৃত্তবিদ্। বিভিন্ন সমান্তরাল তুলে লেখকের লোক-চেতনাকে পরিষ্কার করা যেতে পারে। সে চেতনা সরাসরি, না ধার-করা, তা-ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সাহিত্যিকদের রচনায় লোকবৃত্ত সম্পূর্ণভাবে বা খণ্ডিতাংশে ব্যবহৃত হতে পারে। যে ভাবেই গৃহীত হোক না কেন, সেখানে টেক্সট পাওয়া যায়। যা পাওয়া যায় না তা কন্‌টেক্সট, তা সিটিউএশন। তবে কোন কোন রচনায় কন্‌টেক্সট বা প্রসঙ্গও লক্ষ করা যায়, যেমন কোন অনুষ্ঠানের বর্ণনায়, গল্প বলার ব্যাপারে, প্রবাদ-ধাঁধার ব্যবহারে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিবরণে, শোষণ বা উৎপীড়নের চিত্রাঙ্কনে কন্‌টেক্সট থাকে। লোকবৃত্তবিদেরা এই ধরনের উপকরণকে বা কন্‌টেক্সটিউয়াল বা সিটিউ-এ্যাশনাল লেভেলকে ইণ্টারনাল এভিডেন্স হিসাবে গ্রহণ করেন না, কারণ লেখক বা কবি অনেক সময়েই লোকবৃত্তের সঠিক চরিত্র অনবগত হয়ে তা ব্যবহার করেন। তাই লোকবৃত্তের সঠিক বাতাববণ সৃষ্টি করতে পারেন না। ইচ্ছা ও খেয়াল অনুযায়ী ব্যবহার করতে গিয়ে উপাদান-উপকরণকে বিকৃতও করেন। তবুও তাঁদের সৃষ্টির সিটিউএশন অনেক সময়ে অনেক জট খুলতে সাহায্য করে। এ ভাবেই লোকবৃত্তের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নকেও এগিয়ে নিতে হয়—লোকবৃত্তের অমরত্বকে মানিয়ে নিতে হয়—বহতা নদীর মতো লোকবৃত্ত যেভাবে এগিয়ে যায় তা জানতে ও বুঝতে হয়।

লোকবৃত্ত ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিত ও অনুশীলনের ধারা

লোকবৃত্তের ব্যবহার সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে হচ্ছে কিনা তা বোঝার এবং বোঝাবার জন্য সুশিক্ষিত লোকবৃত্তবিদ্ ও সাহিত্যসমালোচকের দরকার হয়। আমাদের দেশে এযাবৎ সংগৃহীত লোকবৃত্ত সবই এসেছে দ্রব্য, প্রডাক্ট বা টেক্সট হিসাবে। কন্‌টেক্সট

ব্য প্রসঙ্গ আলোচনা প্রায় হয়ইনি। যে আলোচনা হয়েছে তা মূলত রস ও ভাবপ্রবণ। তাঁরা একে "of situation, of the communicative process" হিসাবে দেখেননি। কিন্তু তা "yields a multiplicity of information about the relationship of the individuals involved to one another, circumstances of encounters, duration, time, place and a variety of other elements।" তবে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকেরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সিটিউএশন সৃষ্টি করেন। তাঁদের চিত্রকল্পও যে লোকবৃত্তবিদ্‌দের কাজে আসে সে কথাও মনে রাখতে হয়। লোকবৃত্তবিদ্‌দের অন্যতম অনুশীলনের বিষয় মৌখিক সাহিত্যের বাক্‌রীতি ও স্টাইল। সুনীতিকুমার, সুকুমার সেন, শহীদুল্লাহ্‌, এনামুল হক প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা করতে এসে লোকভাষা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তবু তাঁদের উৎসাহ ভাষাবিজ্ঞানের দিকে যত প্রবল, লোকবৃত্তের ব্যাপারে তত শক্তিশালী নয়। তাঁদের উৎসাহ হারানো-খোয়ানো শব্দের মানে উদ্ধারে যত শক্তিশালী, লোকভাষার স্টাইল ও সাউণ্ড লক্ষ করার দিকে তত সুদূরপ্রসারী নয়। মৌখিক স্টাইল ও সাউণ্ড সাধারণত formulaic, repetitive এবং episodic বলে তা লিখিত সাহিত্য থেকে আলাদা। স্টাইলের ও সাউণ্ডের ক্ষেত্রে লোকসাহিত্য 'suggestive, tentative corroborative evidence', এর চিহ্নিতকরণের জন্য তাই নির্ভর করতে হয় 'on the theoretical sophistication of general folklore theory'-র উপর। অর্থাৎ লোকসাহিত্যের গঠন, মূল এবং প্রসঙ্গ, অবস্থান, মাধ্যম ও উপকরণ সবই লক্ষ করতে হয়।

লৌকিক উপাখ্যান সাহিত্যে প্রবেশ করে উপকরণ হিসাবে এবং অবস্থার দাসে পরিণত হয়ে। গীতিকার যে সাধারণ সংজ্ঞা তাতে এই দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। কোথাও সাহিত্যসৃষ্টিতে উপাখ্যান ও গীতিকাকে ব্যবহার করা হয়েছে, আবার কোথাও রচনার চিত্রকল্প ও পরিবেশে সমান্তরাল কলাতত্ত্ব হিসাবে তা ব্যবহৃত হয়েছে। কবি, শিল্পী বা সাহিত্যিককে লোকবৃত্তের অবস্থান, মাধ্যম ও উপকরণের সব কিছু ব্যবহার করার দরকার হয় না। মার্ক টোয়াইনের মতো যদি কেউ তা অকৃত্রিম ভঙ্গিতে ব্যবহার করতে চান করতে পারেন, কিন্তু সাধারণত কেউ তা করেন না। একজন লেখক স্বীয় সমাজের লোকবৃত্ত সমাজস্থ লোকের নিকট থেকে পেতে পারেন, অথবা প্রকাশিত সংগ্রহ-সংকলনাদি থেকেও গ্রহণ করতে পারেন। অনেকটা অনায়াসে তিনি এইভাবেই উপকরণ পেয়ে যান। কিন্তু একজন লোকবৃত্তবিদ্‌কে অনেক পরিশ্রম করে তা সংগ্রহ

করতে হয়। সংগ্রাহক সাহিত্যিক লোকবৃত্তশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করে লোকবৃত্তের সংগ্রহে বা ব্যবহারে উৎসাহ পান না। তিনি লোকবৃত্তকে ব্যবহার করেন প্রয়োজনের তাগিদে, সৃষ্টিকে জীবনঘনিষ্ঠ করার প্রেরণায়। এই উপকরণ সাধারণত তাঁর কাছে আসে পূর্ব-সংগ্রহ থেকে। আবার এই সংগ্রহের ব্যবহারের সময়ও তিনি অবিকলভাবে ওসব ব্যবহার না করতে পারেন। অর্থাৎ তিনি শুধু ততটুকু উপাদান-উপকরণকেই কাজে লাগান যা তাঁর প্রয়োজনে আসে।

সাহিত্যে লোকবৃত্ত-বিষয়ক আলোচনা-সমালোচনা মানবতা ও সমাজবোধ-বিষয়ক অধ্যয়ন। একজন বহিরাগত লেখক বা গবেষক যখন অন্য কোন সমাজের জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁর পক্ষে সেই সমাজের যাবতীয় খুঁটিনাটি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। যিনি তা পারেন তাঁর রচনা তত জীবন্ত, তত গ্রহণীয় হয়। খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত জানার জন্যই লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির ব্যাপারে অবগত হতে হয়। ভাসাভাসা জ্ঞান নয়, প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে খুঁটিনাটি অবধান করা যায় না।

সাহিত্যে লোকবৃত্তের প্রভাব বিশ্লেষণে সাহিত্য সম্পর্কে অবগত থাকতে হয়। সাহিত্য এবং লোকবৃত্ত উভয়কে জেনে না নিলে সাহিত্যে লোকবৃত্তের প্রভাব স্পষ্ট করা যায় না। কী ভাবে, কোন্ পথ দিয়ে, কী চরিত্র নিয়ে লোকবৃত্ত সাহিত্যে আশ্রয় পেল, তা-ও বোঝা যায় না। সাহিত্যে লোকবৃত্তের প্রভাব বিশ্লেষণের গোড়াতেই দরকার হয়, যে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে সে সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞান। এই জ্ঞানের সঙ্গে চাই লোকবৃত্ত বিষয়ে জ্ঞান। এই জ্ঞানের আলোকেই করতে হয় ব্যবহৃত লোকবৃত্তের সনাক্তকরণ। তারপর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, ব্যবহার-পদ্ধতির ব্যাখ্যাও করতে হয়। এই অধ্যয়নে লোকবৃত্তকে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। বিচার বা পরীক্ষা করার প্রামাণিকতা নির্ভর করে পরীক্ষক বা বিশ্লেষকের উৎসাহ, দক্ষতা ও কার্যধারার উপর। কেউ ফাংশন বা বৃত্তি-কৃত্যাদির ব্যাপারে উৎসাহী, তিনি সেভাবে কাজ করবেন। কেউ পরিবেশ ও মাধ্যমের ব্যাপারে উৎসাহী, তিনি সেভাবে কাজ করবেন। কেউ আঞ্চলিক জীবন, ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে উৎসাহী, তিনি সেভাবে কাজ করবেন। অর্থাৎ যাঁর যেদিকে উৎসাহ তাঁর কাজের ধরন হবে সেদিক ঘেঁষা।

সাহিত্যে লোকবৃত্তের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লোকবৃত্তবিদ্ যেমন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবেন, তেমনি সাহিত্যকেও অনেক সময় লোকবৃত্তের উৎস হিসাবে

লক্ষ করতে পারেন। বিশেষত, লোকবৃত্তের ঐতিহাসিক ভিত্তি জানতে হলে সাহিত্যের সাহায্য না নিলে চলে না। ভ্রমণকাহিনী. আঞ্চলিক অধ্যয়ন প্রভৃতির মধ্যে লোকবৃত্ত মজুত থাকে। স্থানীয় ইতিহাসের মধ্যেও বহু লৌকিক উপকরণ পাওয়া যায়। এদের সাহায্য নিয়ে লোকবৃত্তের প্রাচীনতা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

লোকবৃত্তের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সাহিত্যের স্থানটি মহিমান্বিত, যদিও আমরা সাহিত্যের চেয়ে সমাজ-বৃত্তান্ত ও জীবন জানতে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে থাকি।

শিক্ষাজগতে লোকবৃত্তের প্রথম স্বীকৃতি আসে হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেই সর্বপ্রথম পঠন-পাঠনের জন্য লোকবৃত্ত বিভাগ খোলা হয়। এখন পৃথিবীর নানা দেশে এর স্বীকৃতি এসেছে। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় এখন লোকবৃত্ত অধ্যয়ন-অনুশীলনের বিষয়। লোকবৃত্ত এখন বিশ্ব নৃতাত্ত্বিক কংগ্রেসের একটি শাখা, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন, এমন কি ইতিহাস কংগ্রেসেও এখন লোকবৃত্তের বিভিন্ন শাখা নিয়ে আলোচনা হয়। সরকারী পর্যায়ে লোকবৃত্তের স্বীকৃতি এসেছে লোক-শিল্পকলার সংরক্ষণ এবং প্রচারমাধ্যম হিসাবে। পারফর্মিং আর্টস-হিসাবে সংগীত নাটক অকাদেমি, সংগীত ও নাটক বিভাগ ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বা বিভাগ এবং সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও আদিবাসী-উপজাতি বিভাগের দ্বারা লোকবৃত্ত চর্চার ব্যবস্থা আছে।

এক-এক প্রতিষ্ঠান এক-এক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, এক-এক ভাবে লোকবৃত্তের মূল্য বুঝতে চাইছেন, কোন কেন্দ্রীয় নির্দেশ বা সেণ্ট্রাল ডাইরেকটিভ নেই। বিদ্যাজগতের এক-এক বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকেরা একদিকে চলছেন, সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-গবেষক একদিকে চলছেন, নৃবিজ্ঞানের ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক-কর্মী একদিকে চলছেন, সরকারী গবেবক ও আমলারা একদিকে চলছেন, প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং সংগ্রহশালার সঙ্গে যুক্ত ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী ও আমলারা একভাবে চলছেন। ম্যাস কমিউনিকেশন, প্রচার ও তথ্য দপ্তর, আকাশবাণী, দূরদর্শন, ছায়াছবি একদিকে চলছেন, শহরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গণসংস্কৃতি-জাতীয় আন্দোলন আরেক দিকে চলছেন, অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা একদিকে চলছেন। কোন নির্দিষ্ট গতিপথে এর চর্চা হচ্ছে না। যার যেমন খুশি তেমন চর্চা করে চলেছেন। তাই বলা হয়, লোকবৃত্ত এখন খোলামাঠ। কিন্তু সকলের কাজকে এক নিরিখে ওজন করা যায় না। এসব কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

বাঙলা লোকবৃত্তের দিগন্ত ও প্রসার

দেশীয়দের মধ্যে লালবিহারী দে লোকগল্পের সংকলন প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই যে সাড়া আনতে পেরেছিলেন, প্রায় তদ্রূপ সাড়া এনেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন 'ময়মনসিংহ গীতিকা' প্রকাশ করে। দীনেশচন্দ্রের আগে এফ. জে. চাইল্ড 'ইংলিশ-স্কটিশ পপিউলার ব্যালাড্‌স' প্রকাশ করে বিলাতে যে সাড়া এনেছিলেন তার ধাক্কা এদেশেও এসে পৌঁছেছিল সংগত কারণে। ১৮৮২-৯৮ ষোল বছরের অধিক কাজ করে চাইল্ড ৩০৫টি গীতিকা প্রকাশ করেছিলেন। প্রত্যেকটি গীতিকার পাঠভেদ উদ্ধার করেছিলেন। চাইল্ড যে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পথ দেখালেন তা বিশ্ববাসীকে আকৃষ্ট করে।

আমাদের দেশে এই চেতনা আনেন রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র-দীনেশচন্দ্র সেনেরা। তাঁরা আমাদের সাহিত্যিকদেরও উদ্‌বুদ্ধ করেন। বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মীর মশায়রফ হোসেন থেকে আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যিক ও কবিরা নানাভাবে লোকসমাজকে, লোকজীবনকে চিত্রিত করতে গিয়ে লোকবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। এ দেশের লোকবৃত্ত অধ্যয়ন-অনুশীলনের আরম্ভ উন্নত মানসম্মত ছিল। কিন্তু যত দিন এগিয়ে যেতে লাগলো, তত বিষয়টা খেলো হয়ে চললো। সুনীতিকুমার, শহীদুল্লাহ্‌, বিনয়কুমার সরকার, প্রবোধকুমার বাকচী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, দীনেশচন্দ্র সেন, গুরুসদয় দত্ত, শরৎচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র মিত্র, কালীপদ মিত্র, সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রভৃতির কাজের তুলনায় পরবর্তী কাজ জলো হতে থাকে। যদিও বিষয়ের প্রতি উৎসাহী ছাত্রের সংখ্যা বাড়ে। অধ্যয়ন-অনুশীলনের আগ্রহ বাড়ে। বিনয় ঘোষ লিখেছেন : "স্বাধীন দেশে লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতির প্রতি বাহ্ অনুরাগ ও কৌতূহল বেশ খানিকটা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তা কতটা লোকশিল্প ও শিল্পীর কাজে লেগেছে তা জানি না। শহরের সামিয়ানার তলায় লোকসংস্কৃতির উৎসব হচ্ছে, ডকুমেণ্টারী ছবি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট সন্ধানীরা গবেষণা করছেন। সদাশয় গভর্নমেণ্ট জাতীয় পুরস্কার দিচ্ছেন, লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা করেছেন, বিদেশী টুরিস্টরা কিছু লোকশিল্পের নিদর্শন কিনছেন। কিছু বাইরেও রপ্তানী হচ্ছে এবং তার ফলে দেশে বিদেশী মুদ্রাও আসছে। অনেক কিছুই হচ্ছে এবং তাতে অনেকেরই সুবিধা হচ্ছে—কেউ ব্যবসা করে টাকা পাচ্ছেন, কেউ গবেষণা করে ডিগ্রী পেয়ে চাকরি পাচ্ছেন। কেউ বা লোকসংস্কৃতির

বিশেষজ্ঞরূপে নানারকম সরকারী-বেসরকারী সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু যাদের নিয়ে এত সোরগোল, সেই লোকশিল্পীদের অদৃষ্টে কি জুটছে এবং তার ফলে লোকশিল্পের ভবিষ্যৎই কতটা উজ্জ্বল হয়েছে, তা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়।" মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বাঙলায় যে কাজ আরম্ভ হয়েছিল, তাতে ভাব ও রস যতটা প্রাধান্য পেয়েছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তত প্রাধান্য পায়নি। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্য সংগীত ও ছড়া সংগ্রহ করেছেন। ছড়াকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলেছেন : "উভয়েই পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত। বায়ুস্রোতে ভাসমান—দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক।" কিন্তু তা গভীর অর্থবহ। ভাব-রস ও অনুভূতির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ লোকজ্ঞানকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কারণ, "জ্ঞানের কথা একবার প্রচার হয়ে গেলেই উদ্দেশ্য শেষ হয়। ফলে যা পণ্ডিতের অগম্য ছিল আজ তা অর্বাচীন বালকের কাছেও নতুন নয়।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "রচনার মধ্য দিয়েই লেখক বেঁচে থাকেন, সাহিত্যের মা যেমন করে কাঁদে প্রকৃত মা তেমন করে কাঁদে না। তাই বলে সাহিত্যের মার কান্না মিথ্যা নয়। সাহিত্য দুরকম আনন্দ দেয়। সত্যকে মনোহর রূপে দেখায়, সত্যকে গোচর করে দেয়। পানাপুকুরকে চোখে অনেক দেখেছি, তাকে ভাষার ভিতর দিয়ে দেখলে নতুন করে দেখা হয়। ভাষার বিশেষত্ব সে মানুষের নিজের জিনিষ, বাইরের যে কোন জিনিষকে সে আমাদের সামনে নিয়ে আসে।" এই ভাষার চর্চা করতে হয় বৈজ্ঞানিক নিয়মে। সাহিত্যের চর্চায়ও বৈজ্ঞানিক মনের দরকার হয়। অন্ততপক্ষে সমালোচক ও গবেষককে বৈজ্ঞানিক মনন-সমৃদ্ধ না হলে চলে না। লোকবৃত্তবিদ্‌দের এ কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হয়। কারণ লোকবৃত্ত এখন বিজ্ঞান, কিন্তু লোকবৃত্ত যে-বিজ্ঞান সে-বিজ্ঞান বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়—সমাজ বা মানবিক বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞানে সাহিত্যেরও স্থান আছে।

লোকবৃত্তবিদ্‌কে বৈজ্ঞানিক রীতি-পদ্ধতিকে মানতে হয়। একটা প্রসেস বা স্ট্রাকচারকেও মানতে হয়। অনেকটা অঙ্কের ফরমূলার মতো করে জিনিসটাকে বুঝতে হয়, বোঝাতে হয়। মনে রাখতে হবে : "The folk are going to keep exactly what they want in a story, not what we might like or expect them to keep. They are going to preserve what they feel to be the important thing, that 'emotional core' that sometimes typifies what they feel the world is all about." লোকবৃত্ত অনুশীলনের প্রধান কথা

লোকজীবনের চর্চা। ট্রিসট্রাম পটার কফিনের উপদেশ: "Don't forget that when the lore is related to the conflict it has usually been adapted from material already in wide circulation. Don't forget that tales and songs about war heroes and war situations are most apt to enter oral tradition after the war is over and then for deeply human, certainly not patriotic, reasons. And don't forget either that mass media is the 'oral tradition' of our own concrete society. As education and communication eliminate the genuine folk pockets, fakelore, phoney and pre-packaged, takes over the job of transferring the bulk of our culture from one generation to the next." লোকবৃত্তের জগৎ তাই অনুসন্ধিৎসার জগৎ। সভ্যতা ও ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিচিত্র জীবন ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে সাংস্কৃতিক উজ্জীবন তা লোক-ঐতিহ্য জানিয়ে দেয়। সেজন্যই এযুগে লোকবৃত্ত মূল্যবান্ অধ্যয়নের বিষয়। বিজ্ঞান কোন জিনিসকে বা কোন তথ্যকে উপেক্ষা করে না। বিজ্ঞানের কথা—

"যেখানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়া দেখ তাই,
পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

অমূল্য রতন খোঁজ করার চেষ্টা চলে আসছে সুপ্রাচীন কাল থেকে।

লোকসাহিত্যের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "আমাদের মনের মধ্যে বিশ্ব-জগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি বিচ্ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের মধ্যে রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শিকড়, পৃথিবীর বাষ্প—এই আবর্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন যন্ত্রাংশসকল সর্বদাই নিরর্থক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ···আমাদের মন নামক পদার্থটি এত অধিক প্রভুত্বশালী যে, সে যখন সজাগ হইয়া বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার প্রভাবে আমাদের অন্তর্জগতের এবং বহির্জগতের অধিকাংশই সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়—তাহারই শাসনে, তাহারই বিধানে,

তাহারই কথায়, তাহারই অনুচরপরিচয়ে নিখিল সংসার আকীর্ণ হইয়া থাকে।" অন্যত্র তিনি লিখেছেন : "গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে।" সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্য তথা লোকবৃত্ত অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন, আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হতে লোকবৃত্ত চর্চার সামিল হতে ডাক দিতে পেরেছিলেন। অধ্যাপক প্রশান্তকুমার মহলানবীশকে একটি পত্রে তিনি লিখেছেন : "আমাদের সুপ্তির তলায় একটা চিত্র আছে, আমরা বর্বর নই, জাগ্রত জগতের সঙ্গে অন্তরের যোগ হলেই আমাদের শক্তির উদবোধন হবে। তখন আমরা কেবল গ্রহণ করবো না, দানও করবো…মানুষ মানুষের সঙ্গে যে ক্ষেত্রে মিলতে পারে আমি সেই ক্ষেত্রকেই সবচেয়ে বড় বলে গণ্য করি। সেই ক্ষেত্রেই আমরা সর্বমানবের যোগে বৃহৎ প্রাণে প্রাণবান্ হয়ে উঠতে পারি—বিদ্বেষের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে কদাচ নয়।·· শিক্ষা বলতে কি বোঝায়? প্রাণকে সম্পূর্ণ জাগানো। প্রাণ বলতেই বোঝায় সত্য আগ্রহের লক্ষ্য ধরে নিরন্তর এগোনো। আমাদের দেশের মানুষ আগ্রহহীন—মানুষের প্রতি তাদের আগ্রহ নেই, জ্ঞানের প্রতিও।…আমাদের শিক্ষকদের নিজেরই মনে চারিদিকের প্রতি, ছাত্রদের প্রতি আগ্রহ নেই বলে তারা কেমন মরামন হয়। সে মন অকর্মক ভাবে বস্তু ধারণ করতে পারে, কিন্তু রূপ সৃষ্টি করতে পারে না। তারা বীজের বস্তার মতো, বীজকে ফলানো তাদের কর্ম নয়।…যে শিক্ষক যে বিষয়টি সর্বদাই নিজে পড়ে না, অন্যকে পড়ায়, তার শিক্ষকতার অধিকার নেই…হায়রে, ভারতবর্ষের তেত্রিশকোটি দেবতার মতোই তারা নামে আছে, বাস্তবে নেই" (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৬)। তার ফলেই লোকবৃত্ত শাস্ত্র হয়ে উঠতে পারছে না। ছাত্র ও গবেষকদের বিভ্রান্ত করার জন্য লোকবৃত্ত-ধ্বংস-হয়ে-চলেছে, লোকবৃত্ত-ধ্বংস-হয়ে-চলেছে বলে চীৎকার করছেন। কিন্তু লোকবৃত্ত যে ধ্বংস হবার জিনিস নয়, তা যে ধ্বংস হবে না, সে কথা বোঝাতে পারছেন না। বোঝাতে পারছেন না কীভাবে শিক্ষা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার বিজয় অভিযানে, হরেকরকম বৃত্তির উপস্থিতিতে লোকসমাজের পুরাতন গোষ্ঠীচেতনা, ভাব-ভাবনা ও জীবনধারণের রীতি ও কৌশল বদলে গেলেও নতুন জীবন-অভ্যাস ও বোধে বিশ্বাস ও সংস্কারের শিকড় প্রাচীন চিন্তা ও পরম্পরাগত ঐতিহ্যের মূল থেকে প্রবাহিত হয়। এবং এই অবস্থায়ও লোকবৃত্ত গড়ে ওঠে। গড়ে-ওঠা

লোকবৃত্ত ঐতিহ্য ও প্রাচীন চিন্তাচেতনাকে সঙ্গে করেই এগোয়। আধুনিকতা, যান্ত্রিকতা, বিজ্ঞানের প্রসারেও লোকবৃত্তের ধ্বংস অনিবার্য নয়: "**folklore is a phoenix, which can rise full grown from its own ashes.**" অর্থাৎ আধুনিকতার অগ্রগতি, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, প্রচারমাধ্যমসমূহের সম্প্রসারণ ও ফরমাল শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ও হত্যার সন্ত্রাসে পুরাতন লোকগোষ্ঠীসমূহের সংকোচন হয়ে চলেছে, নতুন গোষ্ঠী নতুন চেতনা নিয়ে এগিয়ে আসছে। লোকবৃত্তের শর্ত অনুসারেই নতুন লোকসমাজ ও নতুন লোকবৃত্ত সৃষ্ট হচ্ছে। কোন অ্যাটম বোমা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিশ্বকে আর পুরাতন যুগে নিয়ে যেতে পারবে না, ধ্বংস করতে পারবে। সেই ধ্বংসের স্তূপের মধ্য থেকেও যে লোকবৃত্ত গড়ে উঠবে তা আসবে, টি. এস. এলিয়টের ভাষায়, "out of the dead land"। এমতাবস্থায় অকৃত্রিম লোকবৃত্ত ঠাহর করা সহজসাধ্য নয়। বিশেষত অকৃত্রিম লোকবৃত্তের চেয়ে কৃত্রিম লোকবৃত্ত সহজেই নাগরিক সমাজকে আকৃষ্ট করে, আবার অনেক সময় জনপ্রিয়, সস্তা, চটুল সাহিত্য, সুগম সংগীত ইত্যাদি থেকেও লোকসমাজ প্রাণবায়ু গ্রহণ করতে পারে। যেমন, 'ইচ্ছা করে পরাণডারে' বা 'আর কত দূর…' প্রভৃতি লোকসমাজে ঢুকে গেছে। এই ধরনের গান লোকসমাজে গিয়ে নতুন লোকসংগীতেও পরিণত হতে পারে।

লোকবৃত্তের চরিত্র

সাংস্কৃতিক উপাদান নানাভাবে ও ঐতিহাসিক কারণে দেয়া-নেয়া করে নতুন রূপ পায়। সে কারণে বিচারবোধ ঠিক না হলে বিদ্যাজগতের গবেষক ও পণ্ডিতদের পক্ষেও প্রকৃত এবং অপ্রকৃত বস্তু চেনা সহজ হয় না। তার জন্য আঞ্চলিক চেতনা, আঞ্চলিক জীবনধারা ও ইতিহাস এবং ভাষাজ্ঞান দরকার হয়। ভারতবর্ষের ন্যায় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে লোকবৃত্তের জাতীয় চরিত্র তুলে ধরা সহজ নয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে যেমন ভারতবর্ষ, তেমনি বাঙলা সমন্বত্বতা লাভ করেছে ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক চেতনা ও কাজকর্মের মারফত। ক্রমে জাতি গঠিত হলে জাতীয়তা-বাদের উন্মেষ ঘটে। তার দ্বারা আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা কিছু পরিমাণ খর্বিত হয়। লোকগোষ্ঠী শিক্ষা, যোগাযোগ ও যাতায়াতের দ্বারা নিজেদের প্রসারিত করতে থাকে; জাতীয়তার আওতায় আসে। সুতরাং প্রকৃত লোকবৃত্ত সেসব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের

মধ্যেই পাওয়া যায় যারা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে জাতীয়তার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়নি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সুফল লাভ করেনি। এই শ্রেণীর জনগণের সংখ্যা এখনও আমাদের দেশে যথেষ্ট। তাই আমাদের দেশকে অনেকে লোকবৃত্তের আকর বলে মনে করেন।

লোকবৃত্ত এমন একটি অধ্যয়নের বিষয় যার নিজস্ব মাত্রায় চরিত্র, শব্দ ও পরিভাষা বিদ্যমান। মৌখিক সাহিত্য এক মুখ থেকে আরেক মুখে যাবার পথে কিছু হারায়, কিছু বদল হয়, সংযোজন হয়। তবু এর মধ্যে emotional core বজায় থাকে। লোকসাহিত্যের পরিবর্তনশীল ও মৌখিক চারিত্রই একে প্রামাণিক হিসাবে গ্রহণের দাবী বলে অনেকে মনে করেন। কারণ, লোকবৃত্ত গোড়ায় কোন একটা তথ্য বিবৃত করলেও ধীরে ধীরে সেই ঘটনা বা তথ্য যখন emotional core হিসাবে গৃহীত হয়, তখন অনেক বস্তু হারিয়ে যায়। স্থানীয় সাক্ষ্যাদির সঙ্গে, আঞ্চলিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের যা প্রয়োজনে আসে তা তার সঙ্গে যুক্ত হয়, অন্যরা বর্জিত হয়। তার ফলে এই উপকরণে একজন ঐতিহাসিক যে সব তথ্য অবগত হতে চান, তা অনেক সময় পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকের তথ্যের কার্যকরিতা নির্ভর করবে তিনি কোন্ ধরনের তথ্য পেতে চান তার উপর, কোন্ ধরনের লোকবৃত্ত হাতে পেয়েছেন, অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টি না পরবর্তীকালের গ্রহণ-বর্জনের পরের সৃষ্টি, তার উপর। কীভাবে লোকবৃত্তের গ্রহণ-বর্জন, কথান্তর-রূপান্তর অনুমিত হয়, লোকবৃত্তবিদেরা তা বুঝিয়ে দেন। লোক-ঐতিহাসিক কী-ঘটেছিল তা নতুন করে লেখেন। তিনি যেমন-যেভাবে উপাদানকে বোঝেন সেভাবে উপাদানকে ব্যবহার করেন। অনেক সময়েই বিচার করেন না এর উৎপত্তিকালের মানে, অথবা লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত মানে। নিজের বোধকে অবলম্বন করে লোকবৃত্তকে ফরমূলার মধ্যে আনেন। তাঁর নিজস্ব বোধ ও সংস্কৃতির দর্পণে ব্যাপারটা বোঝেন। তা করতে গিয়ে শ্রদ্ধাভরে তথ্যাদি ব্যবহার করতে পারেন অথবা অশ্রদ্ধার সঙ্গেও কোন কোন তথ্য কাজে লাগাতে পারেন। এই অধ্যায়ে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের দরুন অথবা পরিবেশ সৃষ্টির কায়দা থেকে মৌখিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়ে লোকবৃত্ত হিসাবে বিদিত হয়। এই লোকবৃত্তকে বেঁচে থাকতে এক মুখ থেকে আরেক মুখে ঘুরে বেড়াতে হবে। এক শ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীতে, এক সংস্কৃতি থেকে আরেক সংস্কৃতিতে চলে যেতে হবে। চলে যেতে হবে এক যুগ থেকে আরেক যুগে। এর ফলে অনেক সময়ে উদ্ধারিত উপকরণ

চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। তা সময়চালিত ফরমূলায় পরিণত হয়। তখন তা জনে-জনে, দলে-দলে, যুগে-যুগে একভাবে টিকে যায়। কোন কথার, কোন গানের, কোন প্রবাদের বা কোন শব্দের ঐ ভাবে সৃষ্ট সমান্তরাল যদি পাওয়া না যায়, তবে বুঝতে হবে তা স্থানীয় লোকদের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম বলেই টেকেনি। এর সত্য ব্যক্তি-নির্ভরও হতে পারে। মৌখিক ঐতিহ্য একে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

লোকসমাজের আলোচনায় যে সমাজের কথা বলা হয় তারা খুব প্রাচীন নয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু যে উপাদান-উপকরণ তা প্রাচীন ও পরম্পরাগত শেক্সপীয়ারের ভাষায় এই পদ্ধতিকে এইভাবে ব্যক্ত করা যায়—

O, how this spring of love resembleth
The uncertain glory of an April day
Which now shows all the beauty of the sun
And by and by a cloud takes all away.

লোকবৃত্তের এই চরিত্রের কথাও লোকবৃত্তবিদদের মনে রাখতে হয়। এবং মনে রাখতে হয়, লোকবৃত্তের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা করার কোন কারণ নেই। সে ছিল, সে আছে, সে থাকবে, তার বিনাশ নেই।